বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ

বিদ্যাসাগর

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশ

রথযাত্রা, ১৩৬৫

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস ১৭ হায়াত খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

বিদ্যাসাগরের সার্ধ-শততম জন্মবার্ষিকী এবার বাঙালীরা দুভাবে উদ্‌যাপন করলো। একদল বিদ্যাসাগরের প্রস্তর মূর্তি বিচূর্ণ করে; অন্যদল আরো নির্দয়ভাবে—পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। অথচ বাঙালী ও বাঙালীর নবজাগৃতির জন্যে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা বেশি দিনের কথা নয়। ইতিমধ্যে তাঁর নাম অবলুপ্ত হয়েছে, এমন কি মূল্যহীন অর্থহীন প্রাণহীন প্রস্তর মূর্তিগুলোও অপসৃত হলো।

কিন্তু স্বকালের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মপন্থা অন্যান্যের তুলনায় এত প্রাগ্রসর ও স্বতন্ত্র যে, তাকে উনবিংশ শতকের মাপে কিছুতেই বাঁধা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বনস্পতির মতো আপনার চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতাকে ছাড়িয়ে উঠেছিলেন উর্ধ্বাকাশের দিকে, চলার পথে তাঁর সোদর অথবা সহযাত্রী কিছুই ছিলো না, কালের বিচারে তিনি ছিলেন আত্যন্তিকভাবে আধুনিক,—বিদ্যাসাগরচরিত্রের তা যথাযথ মূল্যায়ন। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের যে-পরিচয় তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলোতে বিধৃত; অথবা তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মযোগের যে-ব্যাখ্যা স্বনামধন্য সমালোচকগণ প্রদান করেছেন তাতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ঔদার্য সবটুকু ধরা পড়েনি। না পড়ারই কথা; কেননা সমাজসচেতনতাই যাঁর অস্তিত্বের প্রধান অংশ, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সমাজ-সম্পর্কে অর্ধ-চেতন লেখকগণ স্বভাবতই করতে পারেননি। তাঁর অনন্যতা এবং দেশ, কাল ও সমাজের তুলনায় অপরিসীম প্রগতিশীলতার ব্যাখ্যাই এই পণ্ডিতগণ করতে সমর্থ হননি। যে ইতিহাস ও সমাজচেতনার অধিকারী হলে চিন্তার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থস্বরূপে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—কিন্তু দেশ ও কালের পটভূমিকায় স্বাভাবিক—এই লেখকদের তা আংশিকমাত্র ছিলো। ফলে, প্রবঞ্চিত পাঠকগণ প্রাচীন প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিতদের দলভুক্ত করে ঈশ্বরচন্দ্রকে কালের আদালতে

আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা এমনই রুষ্ট হয়েছেন যে, জীবিত ব্যক্তির অভাবে মৃত মূর্তির মস্তক ছেদন করেছেন। আত্মা যদি অমর হতো, তাহলে বিদ্যাসাগর সম্ভবত পাঠকদের পরিবর্তে অভিসম্পাত দিতেন তাঁর দরদি সমালোচকদের।

বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াস আছে। কিন্তু, একথা অবশ্যস্বীকার্য, সবগুলো প্রবন্ধে একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়নি; এমন-কি, একটি প্রবন্ধের বক্তব্যকে হয়তো অন্য একটি প্রবন্ধে খণ্ডনও করা হয়েছে। নানাজনের লেখা এরূপ একটি সংকলনগ্রন্থে এ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, তবু, বিদ্যাসাগরকে নতুন আলোকে দেখার একটি প্রযত্ন কোনো কোনো প্রবন্ধে নিশ্চয় আছে—এবং তা কেবল নতুন কথা বলার প্রলোভন থেকে নয়, নবযুগের চিন্তা পুরাতনকে নবদৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে যাচাই না করে পারে না বলেই।

কৈফিয়ৎ

বিদ্যাসাগরের সমকালীনসমাজ, সমাজচিন্তা, সমাজসংস্কার, শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষাসম্প্রসারণ, নৈতিক মূল্যবোধ, অনুবাদকর্ম, গদ্যরীতি, হাস্যকৌতুক ও ঔদার্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। নানা কারণে, প্রধানত পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে তাড়াহুড়োর জন্যেই—নির্ধারিত কয়েকজন লেখক শেষ পর্যন্ত লিখতে পারেননি। এই কারণে বিদ্যাসাগরের কয়েকটি প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রবন্ধে সব বিষয় নিয়েই প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আছে বলে মনে করি।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছোটোদের উপযোগী একটি এবং রঙ্গব্যঙ্গের 'পর একটি প্রবন্ধ জোগাড় করা গেলো না বলেই সনৎকুমার সাহা ও সম্পাদকের দুটি করে রচনা প্রকাশিত হলো। আত্মপ্রচারণার কোনো অসদুদ্দেশ্য এর পেছনে ছিলো না।

প্রধানত গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই সংকলন গ্রন্থের শেষে বিজ্ঞাপন

থাকাতে, নিশ্চিত জানি, অনেকেই ক্ষুণ্ণ হবেন, স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু বিজ্ঞাপন ব্যতীত এ বই আদৌ বোধহয় প্রকাশিত হতে পারতো না। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা অ্যাকাডেমি (এঁদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির তদারক করার কথা) এবং একাধিক ধনিক প্রকাশকের কাছে এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলুম; কিন্তু কেউ ই অনুকূল-প্রতিকূল কোনোরূপ জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। অগত্যা বিজ্ঞাপনের গ্লানি মেনে নিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশ করতে হলো।

অবশ্য বিজ্ঞাপন থাকার জন্যেই বইয়ের দাম যথেষ্ট কম রাখা গেলো। বিজ্ঞাপনের টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকলে এ জাতীয় অন্য একটি সংকলন আমরা অচিরেই প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখি।

মাত্র এক মাসের মধ্যে পাদটীকা-কণ্টকিত এ বই ছাপা হয়েছে। এমনিতেই ছাপাখানা ভুতুড়ে জায়গা তদুপরি তাড়াহুড়োর জন্যে, প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, দু-চারটে ভুল নিশ্চয় থেকে গেলো।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

যে লেখকগণ অতিরিক্ত শ্রম করে ফরমায়েসি সময়ের মধ্যে লেখা প্রস্তুত করে দিয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতা না পেলে ১৯৭০ সালের মধ্যে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। বিজ্ঞাপনদাতাদের তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ আতিকুল্লাহ এবং গাজীউল হক, তাঁদের ঔদার্যবশত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যে ক্লেশস্বীকার করেছেন, এ জন্যে সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে সম্পাদক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সংসদের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মোশারফ হোসেন এ বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে যে ত্যাগস্বীকার করেছেন তা না পেলে একাজ অবশ্যই মধ্য-পথে থেমে যেতো। সংসদ তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখে সনৎকুমার সাহা এ গ্রন্থের পরিকল্পনা

করেন। ত্রুটিগুলো অবশ্য সম্পাদকের নিজের। সাহা এবং ডক্টর সুব্রত মজুমদারের অর্থানুকূল্যে এ বইয়ের মুদ্রণকার্য শুরু হতে পেরেছিলো।

এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন আলী মনোয়ার, তাঁকে সংসদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কসের ম্যানেজার আমজাদ হোসেন ও কম্পোজিটারদের ধন্যবাদ জানাই। প্রুফ দেখার ব্যাপারে স্নেহভাজন আমানুল হক আমাকে সাহায্য করেছেন।

গোলাম মুরশিদ

প্রথম ভারতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বিদ্যাসাগর সার্ধ-শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ' ভারতে প্রকাশিত হলো দেখে সাহিত্য সংসদ অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে বিদ্যাসাগরকে পূর্ব বাংলার জনগণ যে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের পরিচয় হতে পারবে। এবং এই পথে হয়তো পূর্ব ও পশ্চিমের নিকটতর যোগসূত্র রচিত হবে।

গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধটি সনৎকুমার সাহা লিখে দিয়েছেন উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসে। একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্যে যে মানসিক স্থৈর্য ও পরিবেশের আনুকূল্য আবশ্যক, সাহার, বলা বাহুল্য, তা ছিলো না। তবু তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। পূর্ববাংলার সংস্করণে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিলো 'বিদ্যাসাগর—ছোটোদের জন্যে'—সেটি সত্যসত্যই ছোটোদের পাঠ্য ছিলো। বর্তমান সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশ করতে বিপুল উৎসাহ দেখিয়েছেন, এজন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গোলাম মুরশিদ

সূচীপত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

বি দ্যা সা গ র

আহমদ শরীফ

বিদ্যাসাগরকে দেখিনি। শুনে শুনেই তাঁকে জেনেছি। ভালই হয়েছে। দেখলে তাঁকে খণ্ড খণ্ড ভাবেই পেতাম। শুনে শুনে তাঁকে অখণ্ডভাবে সমগ্ররূপে পেয়েছি। কেননা, চোখের দেখা হারিয়ে যায়। অনুধ্যানে পাওয়াই চিরপ্রাপ্তি, সেই পাওয়া যেমন অনন্য, তার স্থিতি যেমন মর্মমূলে, তেমনি তার রূপও সামগ্রিক।

উনিশ শতকী বাঙলায় অনেক কৃতীপুরুষ জন্মে ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সব কিছুর মূলে ছিলেন দুই অসামান্য পুরুষ। প্রথমে রামমোহন, পরে ঈশ্বরচন্দ্র। একজন রাজা, অপরজন সাগর। উভয়েই ছিলেন বিদ্রোহী। পিতৃ-ধর্ম ও পিতৃ-সমাজ অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়েছে উভয়ের কাছেই। তাঁদের দ্রোহ ছিল পিতৃকুলের ধর্ম ও সমাজের, জাতি ও নীতির, আচার ও আচরণের বিরুদ্ধে।

উভয়েই ছিলেন পাশ্চাত্য প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ। জগৎ ও জীবনকে তাঁরা সাদা চোখে দেখবার, জানবার ও বুঝবার প্রয়াসী ছিলেন। বিষয়ীর বুদ্ধি ছিল তাঁদের পুঁজি। সমকালীন জনারণ্যে তাঁরা ছিলেন individual, ব্যক্তিত্বই তাঁদের চারিত্র। তাই তাঁরা ছিলেন চির-একা। তাঁদের কেউ সহযাত্রী ছিল না—বন্ধু ছিল না, সহযোগী ছিল না। তাই তাঁরা কেউ সেনাপতি নন, সংগ্রামী সৈনিক। অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর দুঃসাহসই তাঁদের সম্বল।—নতুন করে গড়ব স্বদেশ—এ ছিল আকাঙ্ক্ষা, আর একাই কাজে নেমে পড়ার দুঃসাহস। ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেয়ার পরিণাম জেনেও হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্পই হচ্ছে তাঁদের

ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় ও মানব-প্রীতির সন্তান। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই আমাদের দেশে আধুনিক মানববাদের নকীব ও প্রবর্তক।

জরা ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের সংগ্রাম। তাঁরা ছিলেন কর্মীপুরুষ—নির্মাতা। মানুষের মনোভূমি শূন্য থাকে না। তাই গড়ার আগে ভাঙ্তে হয়। তাই তাঁরা আঘাত হানলেন ধর্মের দুর্গে, ভাঙ্তে চাইলেন সমাজ ও সংস্কারের বেড়া। কেননা বিশ্বাসী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্ত্রীয় শাসনে ও আচারিক আনুগত্যে। যে সব প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা মানুষকে বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ করে রেখেছে, যে সব বিশ্বাস ও সংস্কারের লালনে, যে সব আচার-আচরণের বন্ধনে তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে জড়তা, সে সব লক্ষ্যেই তাঁরা কামান দাগালেন। গড়ার সংকল্প ও উল্লাস তাঁদেরকে দিয়েছিল মনোবল ও বৈনাশিক শক্তি।

উভয়েই ছিলেন বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন নির্ভীক কর্মীপুরুষ। রামমোহনের ছিল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আবাল্য জিজ্ঞাসা। পশ্চিমের বাতায়নিক হাওয়ার ছোঁয়ায় সে-জিজ্ঞাসা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠে এবং কালোপযোগী জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা তাঁকে দ্রোহী ও আপোশহীন বিরামহীন নির্ভীক সংগ্রামী করে তুলেছিল। কেননা, তিনি স্বদেশী-স্বধর্মীর জন্যেও এই জাগ্রত জীবনের প্রসাদ কামনা করেছিলেন।

রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর—প্রচলিত অর্থে—কেউই ধার্মিক ছিলেন না। রামমোহনের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। আর শ্রেয়োবোধই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম। দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ। তাই বিবেকই ছিল তাঁদের Boss. তাই তাঁরা ছিলেন ভেতরে বাইরে নিঃসঙ্গ। ভূতে-ভগবানে কারো বিশ্বাস ছিল না বলেই, তাঁরা জীবন-স্বপ্নের বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে পেরেছিলেন এবং একারণেই যুক্তিই ছিল তাঁদের যুদ্ধের অস্ত্র। যুক্তির অস্ত্রে শাস্ত্রকে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

রামমোহন আচারিক ধর্মকে বোধের জগতে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্মের বৈদান্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তিনি তাঁর প্রয়াসে সিদ্ধি কামনা করেছিলেন। এতে অবশ্য স্বকালে তাঁর প্রত্যক্ষ সাফল্য সামান্য। সেজন্যে তাঁর অসামর্থ্য দায়ী নয়—জন-সমাজে প্রতীচ্য শিক্ষার অভাবই ব্যর্থতার কারণ। তবু এদেশে প্রতীচ্য-চেতনা-সূর্যের উদয় ঘটে রামমোহনের মাধ্যমেই। এবং সে সূর্য মধ্যযুগীয় নিশীথের তমসা অপসারিত করে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন মেকলের উদ্দিষ্ট এ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান—মন মেজাজ ও প্রজ্ঞা ছিল যাঁদের প্রগতিশীল বিদ্বান প্রতীচ্য নাগরিকের আর জীবনবোধ ছিল নাস্তিক দার্শনিকের, জীবনরসিক বিজ্ঞানীর। উভয়েই ছিলেন মানববাদী—তাই হিতবাদী কর্মী না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। রামমোহনের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর। রামমোহনের আরব্ধ কর্মে সাফল্য দানই ছিল বিদ্যাসাগরের ব্রত। রামমোহন সংশয়বাদী, বিদ্যাসাগর নাস্তিক। রামমোহন আন্তর্জাতিক, বিদ্যাসাগর জাতীয়তাবাদী।

বিদ্যাসাগর ছিলেন গরীব ঘরের সন্তান। সে ঘরে দুই পুরুষ ধরে আর্থিক স্বস্তি কিংবা আত্মিক প্রশান্তি ছিল না। ঘরোয়া কোঁদল, অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং আর্থিক দৈন্য সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ছিল। এমনকি পিতৃশাসনও ছিল প্রতিকূল।

জন্মমুহূর্তে বিদ্যাসাগরের পিতামহের মুখে এক অমোঘ সত্য উচ্চারিত হয়েছিল—এঁড়ে বাছুর জন্মেছে।

গোঁ বা জেদই ছিল বিদ্যাসাগরের সব আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে। বলা চলে, ঈশ্বরচন্দ্রের অন্য নামই 'জেদ'। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই ঈশ্বর। ঈশ্বরের মতোই ছিল তাঁর অনপেক্ষ শক্তি। সে শক্তির উৎস জেদ ছাড়া কিছুই নয়। এরই শালীন নাম দৃঢ় সংকল্প। একারণেই বিদ্যাসাগর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কর্মের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

বিস্ময়ের বিষয়, টুলো বামুন পরিবারে যাঁর জন্ম, দারিদ্র্য যাঁর আজন্ম সহচর, বাল্যে যাঁর ইংরেজি শিক্ষা হয়নি, রক্ষণশীল পিতা যাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য-প্রীতিবশে হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ উপেক্ষা করে সন্তানকে শাস্ত্র শিক্ষাদানে সচেষ্ট, সেই বিদ্যাসাগর আবাল্য দেব-দ্বিজে আস্থাহীন। অনুজ শম্ভুচন্দ্র বলেছেন—জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের ভগবানে ভক্তি ছিল না, তবে মাতাপিতাকে তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। বিদ্যাসাগর নির্বিচারে কিছুই মানেননি। বাল্যেও তিনি সব ব্যাপারে মাতাপিতার অনুগত ছিলেন না, জেদ চাপলে তাঁকে শায়েস্তা করা সহজ ছিল না। তাঁর বিচারশীলতার ভিত্তি ও মান ছিল কল্যাণ। যা কল্যাণকর তা-ই বরণীয়; আর সব বর্জনীয়। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বলতে পেরেছেন—বেদান্তদর্শন ভ্রান্ত, দেশীয় ন্যায়শাস্ত্র অকেজো—তা পড়িয়ে কাজ নেই। মায়াবাদের কবল মুক্ত করে পাশ্চাত্য জীবনবাদী দর্শনের রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে স্বজাতিকে। যেদিন তিনি আরশুলা গলাধঃকরণ করেছিলেন, সে দিনই বোঝা গেল—কত বড়ো মানববাদী তিনি—কত গভীর তাঁর মানবতা।

কিন্তু সেদিন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরকে বুঝবার লোক কোলকাতায় বেশি ছিল না। থাকার কথাও নয়। অগ্রসর চিন্তা-চেতনা কেবল কোটিতে গুটিক সম্ভব। এজন্যে অপরিচিত চিন্তার দীপ্তি সহ্য করবার মতো লোক 'লাখে না মিলএ এক।'

তাই বিদ্যাসাগরও ছিলেন স্বকালে অস্বীকৃত। কিন্তু মেঘ-ভাঙা রোদের মত তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, তাঁর চিন্তার দ্যুতি, তাঁর সংকল্পের বহ্নি বাঙালীকে বিরক্ত, বিচলিত ও ব্যস্ত করে তুলেছিল। প্রতিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে হলেও তাদের গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয়েছে—জড়তা জড়িয়ে ঝিমিয়ে থাকা আর সম্ভব হয়নি। তারা আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাগেনি, ঘা খেয়ে আর্তচিৎকারে জাগল।

বিদ্যাসাগরের জেদ যেমন তাঁর চরিত্রে দিয়েছে কাঠিন্য, সংকল্পে দিয়েছে দৃঢ়তা, তেমনি প্রজ্ঞা জানিয়েছে প্রগতির পথ।

বর্জন করবার শক্তিই বিদ্যাসাগরকে অনন্য করেছিল। এমনি গুণ রামমোহনেরও ছিল। স্বধর্মের ও স্বদেশের আজন্মলব্ধ বিশ্বাস সংস্কার তিনি গায়ে-লাগা ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন। হিতবাদী-দর্শনেই ছিল তাঁর আস্থা। তাই বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কিংবা বহুবিবাহ ব্যাপারে তিনি শাস্ত্রের পরোয়া করেননি। কেবল গণমন প্রভাবিত করার জন্যেই শাস্ত্র আওড়িয়েছেন। তাঁর আত্মচরিত-সূত্রে প্রকাশ, এক অনাত্মীয়া নারীর মমতামুগ্ধ বিদ্যাসাগর বাল্যেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেন। শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন বিদ্যাসাগরেরই মানস-সন্তান। প্রতীচ্য শিক্ষা ব্যতীত তাঁর উদ্দেশ্য যে সফল হবার নয়, তা বিদ্যাসাগর গোড়াতেই বুঝেছিলেন, কেননা তাঁর মানববাদেরও উৎস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জীবন-চেতনা। কিন্তু জেদী বিদ্যাসাগর অপেক্ষা করবার লোক ছিলেন না। তিনি কাঁচা কলা পাকাতে চেয়েছেন, তাই ব্যর্থতাই বরণ করতে হল। বঙ্কিমচন্দ্রও বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেই কেবল বহুবিবাহ নিবারণ সম্ভব। কুন্দ ও হরলাল, নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল চরিত্র মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা সম্পর্কে সংস্কার-লালিত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতও বিধবাবিবাহের অনুকূল ছিল না। তবু কুন্দ-নগেনের বিয়ে তো বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী ছাড়া সব উপন্যাসেই বহুবিবাহ-বিরোধী মনোভাব সুপ্রকট।

শিক্ষাই যে মোহমুক্তির ও অন্ধতা বিনাশের একমাত্র ঋজু উপায়, তা সেকালে বিদ্যাসাগরের চাইতে বেশি কেউ উপলব্ধি করেনি। তাই শিক্ষাবিস্তারে তিনি দেহ-মন আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এবং নারী-পুরুষ

সবারই জন্যে সমভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। সামাজিক নির্যাতন ও সংস্কারের বন্ধন কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই ঘুচতে পারে—এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না। গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক রচন ও প্রকাশনই ছিল তাঁর ব্রত। বর্ণপরিচয়—বোধোদয়—আখ্যান-মঞ্জরী—ইতিহাস, উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ, বেতাল পঞ্চবিংশতি—শকুন্তলা—সীতার বনবাস প্রভৃতি তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত যাবতীয় গ্রন্থই পাঠ্যপুস্তক। প্রভাবতীসম্ভাষণ ও অসমাপ্ত আত্মচরিত ব্যতীত তাঁর সব রচনাই শিক্ষাবিস্তারের ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত। এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদগ্ধ্য, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার উৎকর্ষ আজকাল আর অস্বীকৃত নয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে আঠারো শ' পঁয়ষট্টি সালের পরে বিদ্যাসাগরের ভাষিক প্রত্যক্ষ প্রভাব অপগত। মোটামুটিভাবে আঠারো শ' সত্তর সালের দিকে পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও তিনি একক নন, তাছাড়া বিধবাবিবাহ কিংবা বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রয়াস তখন ব্যর্থ ও অতীতের দুঃস্বপ্নমাত্র। বাস্তবজীবনে এমনি করে তাঁর ভূমিকা ম্লান ও গৌণ হয়ে গেল আঠারো শ' পঁচাত্তরের দিকে। তিনি ছিন্নমুণ্ড তালতরুর মতো বেঁচে রইলেন আঠারো শ' একানব্বই সাল অবধি, তা হলে বিদ্যাসাগরের রইল কি ? তাঁর কোন কৃতি কীর্তি হিসেবে গৌরব-মিনার হয়ে রইল ?

সেই যে বাঙ্‌লা গদ্যরীতির 'জনক' বলে তাঁর এক খ্যাতি আছে, সেই জনকত্বেই তাঁর স্থিতি। তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুক্তির জনক, জীবন-জিজ্ঞাসার জনক, বিদ্রোহের জনক, শিক্ষা ও সংস্কারের জনক, সংগ্রামীর জনক, ত্যাগ-তিতিক্ষার জনক। জনকত্বই তাঁর কৃতি ও কীর্তি। সমকালীন বাঙ্‌লার সব নতুনেরই জনক ছিলেন তিনি। তিনিই ছিলেন ঈশ্বর। বিভিন্নক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী কর্মীরা ছিলেন প্রবর্তনাদাতা সে ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়-চালিত নিমিত্তমাত্র।

বিধাতা সেকালের কোলকাতায় 'মানুষ' একজনই গড়েছিলেন, যিনি ধুতি চাদর-চটির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যিনি জীবন ও জীবিকাকে আদর্শের পদানত করেছিলেন, যাঁর হিমাদ্রি-দৃঢ় সংকল্পের কাছে মাথানত করেছে ইংরেজ ভারতীয় সবাই। যাঁর মানস-ঐশ্বর্যের কাছে হার মেনেছিল রাজ-সম্পদ। যাঁর আত্মসম্মানবোধের কাছে রাজকীয় দাপট ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মানববাদী বিদ্যাসাগর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও প্রবক্তা। ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অসুবিধার গুরুত্ব-চেতনা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের চেয়ে কম ছিল না তাঁর কাছে। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' মানুষ বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকের পরিচয়বাহী। হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের পরিচয় 'দয়ার সাগর' খ্যাতিও বহন করছে।

আসলে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এজুরা বা ইয়ং বেঙ্গলেরাই অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিত আলোচনা মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে তা ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতিসংপৃক্ত সমস্যা-জাতীয় লজ্জাবিশেষ। এই সৌখিন দ্রোহীরা হিন্দুর ও হিন্দুয়ানীর সব কিছুরই নিন্দা করতেন—এইগুলোও ছিল তার অন্তর্গত। এই এজুরা চল্লিশোত্তর জীবনে গোঁড়া হিন্দু বা নিষ্ঠ ব্রাহ্ম হয়েই তুষ্ট ছিলেন,—হয়তো বা প্রথম যৌবনের ঔদ্ধত্যের জন্যে লজ্জিত কিংবা অনুতপ্তও হয়েছিলেন। কাজেই বিদ্যাসাগরে যা ছিল তাঁর অস্তিত্বের মতোই সত্য, ডিরোজিও দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের পক্ষে তা ছিল বয়োধর্মপ্রসূত সৌখিন সংস্কৃতিবানতা। তাঁরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন ; কেউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্মী এবং লেখকও ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী থাকেন নি। হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর মানব-কল্যাণে "আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ" ছিলেন না। তাই বিদ্যাসাগর মহৎ ও অনন্য। কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, জগৎচেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপারেও সংস্কৃতিবান বিদ্যাসাগর বাঙালী হিন্দুকে গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হতে উদ্ধার করে

প্রতীচ্য সংজ্ঞায় আধুনিক সভ্য মানুষ করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই তিনি স্বচক্ষে তাঁর এ সাফল্য দেখে গেছেন। স্বকালে বিদ্যাসাগরকে যথার্থ ভাবে বুঝেছিলেন কেবল মধুসূদনই। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

"The man to whom I have applied has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother"—এর চাইতে বিদ্যাসাগরের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আর কিছুই হতে পারে না।

রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্র হিন্দুসমাজেই নিবদ্ধ ছিল। এমন কি শিক্ষাবিস্তার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মুসলিম জনশিক্ষার দায়িত্ব নেন নি। কিন্তু এ জন্যে বিদ্যাসাগরকে দায়ী করা চলবে না। প্রথমত, এঁদের শিক্ষা সমস্যা কিংবা সমাজ-সমস্যা নিবদ্ধ ছিল কোলকাতা ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাগুলোর উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সমাজে। ইংরেজি শিক্ষা-বিমুখ স্বসমাজের মানুষের সমস্যাও তাঁদের বিচলিত করেনি। দ্বিতীয়ত, সে যুগে বৈষয়িক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্যক্ষেত্রে মুসলমান-সমাজের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ও বিত্তের হিন্দুসমাজের মধ্যযুগীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনীতিক যোগসূত্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তৃতীয়ত, বিদ্যাসাগরের সমকালে নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম-শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনো অস্থির বিচার বিবেচনা চলছে। আবদুল লতিফ স্বয়ং ছিলেন উর্দুভাষী এবং বিদেশাগত উচ্চবিত্তের উর্দুভাষী মুসলিম পরিবারগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। তাঁর বাঙলা বিরোধী সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। তিনি ছিলেন মুসলমানের মাতৃভাষারূপে উর্দু প্রবর্তনের দাবীদার এবং দেশজ নিম্নবিত্তের মুসলমানদের জন্যেও তিনি বিশুদ্ধ বাঙলা কামনা করেননি—চেয়েছিলেন নিদেনপক্ষে সন্ধিকালের জন্যে সাময়িকভাবে আরবি-ফারসিমিশ্রিত

দোভাষী রীতির বাঙ্‌লার প্রচলন যাতে উত্তরকালে মাতৃভাষারূপে উর্দু গ্রহণ সহজ হয়। এমন অবস্থায় বিদ্যাসাগরের পক্ষে মুসলমানের জন্যেও বাঙ্‌লা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস সম্ভব ছিল না, তাঁর সে অধিকারই ছিল না।

বহুবিবাহ সম্পর্কে আলোচনাকালে বিদ্যাসাগর বলেছেন : "বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্য অন্য অংশে তত নহে, এবং বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না।" বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই জানতেন, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলামে অবৈধ। এবং ভোগবাঞ্ছাবশেই তারা বিয়ে করে—কন্যাদায়গ্রস্তদের উদ্ধার করবার জন্যে পেশা হিসাবে বর সাজে না। তাছাড়া মুসলমান সমাজে তালাক ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই হিন্দু নারীর দাম্পত্য বিড়ম্বনা কিংবা বৈধব্য-যন্ত্রণা মুসলিম নারীতে অনুপস্থিত। কাজেই বিদ্যাসাগর মুসলমান কিংবা অন্য প্রদেশের হিন্দুর বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে আন্দোলন করেন নি। বাঙ্‌লার হিন্দুসমাজেও পেশা হিসেবে বহুবিবাহ প্রথাটা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত ছিল। সুতরাং এটি ছিল একান্তই ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্যা। ইংরেজি শিক্ষাটা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিশেষ করে প্রসার লাভ করে, তাই স্ব-স্বার্থেই প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের এ বিচলন ও আন্দোলন।

বাঙালী মুসলমানসমাজে রামমোহনের মতো সংশয়বাদী আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন কর্মীপুরুষ কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো মানব-হিতবাদী নাস্তিক সংগ্রামীপুরুষ একজনও জন্মান নি। হয়তো যে কালিক প্রয়োজনে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, প্রতীচ্য-চেতনা-বিমুখ মুসলিমসমাজে তেমন কাল অনুভূত হয়নি। অথবা রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজের জন্যে যা করেছেন, তা জাগরণ মুহূর্তে প্রতীচ্য

বিদ্যাপ্রাপ্ত মুসলিম সমাজকেও দিশা দিয়েছিল। পথিকৃতের চাইতে অনুগামীর স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেক বেশী তা কে অস্বীকার করবে? বাঙালী মুসলমান প্রতিবেশীর পশ্চাদ্‌গামী ছিল বলেই অনায়াসেই অনেক সমস্যার অনুকৃত সমাধান পেয়েছিল। তবু বোধ হয় প্রশ্ন থেকে যায়—রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো প্রত্যাশিত মুক্তচিত্ত দ্রোহী ও নাস্তিক মানববাদীর অনুপস্থিতি মুসলমান সমাজের সৌভাগ্যের না দুর্ভাগ্যের কারণ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বদরুদ্দীন উমর

এক

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের রেনেসাঁস নামে পরিচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলো নগরকেন্দ্রিক এবং চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-উদ্ভূত-ভূস্বামী শ্রেণী ছিলো তার মেরুদণ্ড। বাঙলাদেশের এই আন্দোলনের সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এখানেই হলো মৌলিক তফাৎ। কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নেতা ছিলো ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার লক্ষ্য ছিলো সামন্ত প্রথা ও সামন্ত ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ। পনেরো থেকে আঠারো শতকের মধ্যে এই ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণী ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও সমাজকাঠামোর ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তার ফলে সামন্ত ভূমি-ব্যবস্থার উৎপীড়ন থেকে বৃহত্তর কৃষকসমাজ মুক্তিলাভ করে এবং ইউরোপে প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রগত প্রভেদই উপরোক্ত দুই সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে দায়ী। ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী পনেরো শতকের প্রথমদিকেই একটি নতুন ও স্বাধীন শ্রেণীরূপে জন্মলাভ করে। এর পর তিন-চার শতক ধরে নব নব রূপে বিকাশ লাভ করে নিজের এই যাত্রাপথে সমগ্র সমাজকাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বুর্জোয়াশ্রেণী ইউরোপীয় সমাজের পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটায়। কিন্তু বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল ভিত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা শিল্পকার্য ছিলো না। তার মূলভিত্তি ছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূমি-ব্যবস্থা। এ জন্যেই উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত বাঙালীর নবজাগরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। অনেকে সেই বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা করলেও তার উচ্ছেদের প্রশ্নে তাঁরা মোটামুটিভাবে নীরব থেকেছেন। প্রচলিত সামন্ত ব্যবস্থার প্রতি এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই বাঙলার নবজাগরণ সমগ্র বাঙালী-সমাজে, এমনকি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজসৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে সারা উনিশ শতক ধরে সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলো বন্দী দশাপ্রাপ্ত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে স্থাপিত হওয়ার জন্যে তা গ্রামাঞ্চল এবং কৃষক সমাজকেও বিপুলভাবে নাড়া দেয়। সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন তাদের জীবনের মধ্যেও আনে বিপুল উদ্দীপনা। কিন্তু বাঙলাদেশের উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বাঙলার কৃষক সমাজকে স্পর্শই করেনি, প্রায় সর্বতোভাবে তা কলকাতা এবং আরো কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। রামমোহনের সতীদাহ-প্রথা নিবারণ আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন এদিক দিয়ে সামান্য ব্যতিক্রম হলেও তা গ্রাম-বাঙলার জীবনে রেনেসাঁসের মতো কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেনি

দুই

উনিশ শতকের বাঙলায় যে সাংস্কৃতিক ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হয়েছিলো সেটা অবশ্য কোন সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। তৎকালীন বাঙালী-সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাতের ফলে রেনেসাঁস নামে কথিত এই সাংস্কৃতিক ও সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ এই বিরোধ শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরোধ নয়। এই বিরোধ ছিলো উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই অংশের

বিরোধ। এর এক অংশ ছিলো পুরোপুরিভাবে সামন্ততন্ত্রের এবং সামন্ত-তান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক এবং অন্য অংশ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদকামী না হলেও ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার প্রভাবে বাঙালী মধ্য-বিত্তশ্রেণীর চিন্তাকে অনেকাংশে সামন্তপ্রভাবমুক্ত করতে উদ্যোগী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম অংশের নেতা। ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় অংশের নেতা।

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ অন্য অংশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপুষ্ট হলেও ইউরোপীয় শিক্ষা এবং উদার-নৈতিক চিন্তাধারা তাঁদেরকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অনেক-খানি সচেতন ও সক্রিয় করে তোলে। সমাজের নানা কুসংস্কার এবং রক্ষণশীল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা শুরু করেন তাঁদের সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তা এবং বিধবাবিবাহ-প্রচলনের আন্দোলন হলো তারই সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সমগ্র বাঙালী হিন্দুসমাজে যখন ধর্মের জোয়ার বইছে, ধর্মচিন্তাকে নানাভাবে সংস্কার করে বেদ-বেদান্ত নতুন ভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার প্রচেষ্টা চলছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন বেদান্তের অসারত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে বার্কলের মতো ভাববাদীদের প্রভাব থেকে বাঙালী শিক্ষিত যুবসমাজকে রক্ষা করতেও তিনি রীতিমতো ব্যগ্র। ব্যানারাস হিন্দু কলেজের তৎকালীন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর বিতর্কই তাঁর এই ব্যগ্রতার পরিচয় দান করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় উদারনীতি-বাদকে বাঙালীসমাজের চিন্তাগত পশ্চাদবাদত্ব এবং অন্তহীন কুসংস্কার দূরীকরণের একটা নিশ্চিত ও উপযুক্ত প্রতিষেধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সে জন্যেই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা ত' করেনই

নি, উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘজীবনই কামনা করেছিলেন। কোন প্রত্যক্ষ ভূমিস্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও এ জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতো তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎখাত কামনা করেন নি।

তবে এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রদের সাথে তাঁর একটা বড়ো পার্থক্যকেও উপেক্ষা করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ ও সংস্কারের রক্ষক ছিলেন, তাই নয়, তিনি ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়ার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। সেজন্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতির বিভিন্ন সংস্কার তৎকালীন বাঙালী সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো, সমাজের মৌলিক কাঠামোকে না হলেও তার উপরিভাগে যেভাবে আঘাত হেনেছিলো তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন রীতিমতো সোচ্চার। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রচেষ্টা একদিকে যেমন নিযুক্ত ছিলো কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সঙ্গেই নিযুক্ত ছিলো ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র চিন্তা ও সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এ জন্যেই একদিকে তিনি যেমন লিখেছিলেন "বঙ্গদেশের কৃষক" তেমনি অন্যদিকে লিখেছিলেন "কৃষ্ণকান্তের উইল" এবং "বিষবৃক্ষ"।

তিন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ছিলো সর্বতোভাবে সংস্কারমুখী, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নেতাদের মতো তাঁর চিন্তাধারা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও ভূমি-ব্যবস্থার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিলো না। এজন্যেই তাঁর চিন্তার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও থাকেনি। দীনবন্ধু মিত্র এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশচন্দ্র যেভাবে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কোনদিন চিন্তাও করেননি।

হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় বিগলিত হলেও দরিদ্র কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্যাতন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাজারো অত্যাচার তাঁর মনকে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করেনি। তাই বিধবাবিবাহের সংস্কার আন্দোলনে তিনি প্রচুর অর্থ ও শক্তি ব্যয় করলেও নিজের কথা, লেখা ও কর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর কৃষক সমাজের সুখ-দুঃখের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু এদিক দিয়ে আবার ঈশ্বরচন্দ্র কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বার্থ সাধারণভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরই ছিলো প্রতিষ্ঠিত এবং তার প্রভাবে সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই কৃষক স্বার্থের প্রতি শুধু উদাসীনই ছিলো না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো শত্রুভাবাপন্ন। অর্থাৎ তারা ছিলো দরিদ্র কৃষকদের শ্রেণীশত্রু। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঈশ্বরচন্দ্র কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন বক্তব্য উপস্থিত না করলেও তার প্রতি ঔদাসীন্যই তাঁর চিন্তার একটা বিশেষ পরিধি নির্দিষ্ট করে। এবং এই পরিধিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে সঠিকভাবে বিচার ও বিবেচনা করা প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা

আলী আনোয়ার

বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখে আমাদের চেতনায় উনবিংশ শতকের বাঙালীসমাজের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিপুরুষ ও তাঁর প্রতিভার কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর একক অস্তিত্বের প্রবলতা দিয়ে সমস্ত সমাজকে নাড়া দিয়েছিলেন এবং শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতকের বাঙালী হিন্দু-সমাজ যেন তার চরিত্রের প্রতিপক্ষ হিসেবেই বিরোধে, সংক্ষোভে ও আশ্লেষে বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নেতৃবৃন্দের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যাসাগর শুধু উজ্জ্বলতমই নন আর কারো ব্যক্তিত্বই সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে এত ব্যতিক্রম বলে মনে হয় নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবলতায় তিনি এত অভ্রংলিহ সুদূর, তাঁর সমাজের জন্য সহমর্মিতায়, আত্মীয়তাবোধে তিনি এত নিকট ও আপন। এক সময়ে মনে হয়েছে বিদ্যাসাগর যেন বাংলাদেশের জন্য নিয়তি নির্ধারিত পুরুষ। অথচ আজ একশ বছর পরের বাঙালী হিন্দুসমাজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না বিদ্যাসাগর কখনো এই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যে সমাজ তাঁর কাছে এতভাবে ঋণী সে সমাজে তিনি কেবল একটা বিগ্রহ হয়ে রইলেন, জাগ্রত ধর্ম হিসেবে তাঁর সামাজিক আদর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল না। প্রতিভায় ভাস্বর, অপাপবিদ্ধ প্রবল চরিত্রের অধিকারী সমাজের অধিনায়ক বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত তাই আমাদেরকে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা ও নেতৃত্বের তাৎপর্য সম্বন্ধে ভাবতে প্রলুব্ধ করে।

খ

উনবিংশ শতকের বাঙালী সংস্কারান্দোলনের কতকগুলি সাধারণ

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং বিদ্যাসাগরের কীর্তি ও তাৎপর্যের মূল্যায়নের সময় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন।

উনবিংশ শতকের বাঙালী সংস্কারান্দোলনসমূহ কিছু প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীদের মনঃসংন্যাসপ্রাপ্ত আকস্মিক ফলাফল নয়। আসলে উনবিংশ শতকের বাঙালীসমাজের সর্বব্যাপী ভাঙাগড়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পেছনে পেছনে এসেছে সংস্কারচিন্তা। এই সংস্কারচিন্তায় অংশ গ্রহণ করেননি, অত্যন্ত প্রভাবিত হননি এমন লোক কম ছিল। যেহেতু প্রথানির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোটাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন, পুঁজিতন্ত্রের উন্মেষ ও নগর সভ্যতার উদ্বোধন প্রভৃতি কারণে প্রবল আঘাত এসেছিল—একদল এই ভাঙনোন্মুখ পরিবর্তনশীল সমাজকে রক্ষার জন্যে সংস্কারচিন্তার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাদ্‌মুখী, সমাজ, ধর্ম ও ঐতিহ্যের বিপন্নতার ধুয়া তুলে এঁরা সামাজিক ভাঙন রোধ করতে চেয়েছিলেন ও কাঠামোর পুনর্বাসন বা স্থিতাবস্থা কামনা করেছিলেন। এঁরাও সংস্কার একেবারে চাননি তা নয় তবে তা কাঠামোর সংরক্ষণের তাগিদে। অন্যদল এই ঘুণেধরা সমাজের ভাঙনকেই কাম্য মনে করে সংস্কারান্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে নানামত ও পথের লোক ছিলেন। ডিরোজীও-পন্থী ও অন্যান্য উগ্রপন্থীরা ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় এই বিদ্রোহ ও ঐতিহ্য বর্জনের সুরটিকে উঁচু গ্রামে বেঁধে ছিলেন। তাঁদের জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে বিলিতিয়ানার অনুশীলন তাঁদেরকে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সহজ বিদ্রূপের পাত্র করেছিল। নবোদ্ভূত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে এঁদের ভবিষ্যদ্‌মুখিতা ও আশাবাদ ব্যক্তিপ্রধান উন্মার্গগামিতাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার-চিন্তার দিক থেকে ডিরোজীও-পন্থীদের বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। ডিরোজীও নিজে ফরাসি বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ইউরোপের বামপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অনুসারীদের যোগাযোগ ছিল।

বিলাতের দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক কালে এঁরাও এদেশে দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৮৪৩ সনে এঁরা দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের পুরোহিত জর্জ টমসনকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন বক্তৃতা করবার জন্য। ডিরোজীয়ানরাই প্রথম ভারত থেকে আফ্রিকার ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুলি রপ্তানির প্রতিবাদ করেছিলেন। ডিরোজীয়ানদের একজন কাথিওয়াড়ের রাজন্যবর্গের অত্যাচার থেকে নিপীড়িত প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সাধুবেশে সেখানে চলে যান। ডিরোজীয়ানদের রাজনৈতিক মতামত এতই উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছিল যে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডি. এল রিচার্ডসন ১৮৪৩ সনেই এঁদের চিন্তাধারা রাজদ্রোহমূলক এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

এই আশঙ্কা রিচার্ডসনের একার নয়। বিদেশাগত শাসকশ্রেণীর মতই সমাজের অতিরক্ষণশীল স্থিতস্বার্থভোগী শ্রেণীর মধ্যেও সামাজিক দ্রুত পট পরিবর্তন সবসময়েই অনিশ্চয়তাজনিত সংশয় ও ভীতির জন্ম দিয়েছে। নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি অনিশ্চয়তার সংশয়কে বিপ্লবের আতঙ্কে রূপান্তরিত করেছে এবং এঁরা সংস্কারান্দোলনেরই রাশ টেনে ধরেছেন। কাজেই বাঙালী সংস্কারচিন্তার পেছনে যেমন পরিবর্তনের প্রেরণা ছিল, বিপ্লব সম্ভাবনাজনিত রক্ষণশীলতাও ছিল ততটুকুই।

সংস্কারচিন্তার বিভিন্ন পর্যায় যেমন সামাজিক শ্রেণী বা অংশ বিশেষের আকাঙ্ক্ষার আদলে গড়ে উঠেছে, গ্রহীতা হিসেবেও সমগ্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপরে এই সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টার একমাত্রিক প্রতিক্রিয়া হয়নি। অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে জনসাধারণ খোলাখুলি বিদ্রোহ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে—যেমন, নীলবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ। অনেক সময় আপাতভাবে নিরীহ ধর্মসংস্কারান্দোলনের মধ্যে নিম্নবিত্ত-কৃষক বিপ্লবের আহ্বান শুনতে পেয়েছে যেমন ওয়াহাবী বিদ্রোহ। অথচ

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এসমস্ত বিপ্লব বা বিদ্রোহ যেন পাশ কাটিয়ে গেছে। মধ্যবিত্তপ্রধান পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্রাহ্মরা যখন বিধবাবিবাহ বা তিন আইনে বিবাহ নিয়ে উত্তেজিত সামগ্রিক হিন্দুসমাজ তখন এজাতীয় সংস্কারমুক্ত মনে গ্রহণ করতে তো পারেই নি বরং সমাজ একেবারে ভেঙে পড়বে বা পাপাচার হবে বলে ভয়ই পেয়েছে।

সংস্কার আন্দোলন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই তিনটি আপাত বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে একই সংস্কারকর্মী বা নেতা একই সঙ্গে তিনটি ক্ষেত্রে সমান মনোযোগ দেন নি। দেবেন্দ্রনাথ যেমন ধর্ম সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা নন। বিদ্যাসাগর যেমন যুগন্ধর সমাজ সংস্কারক হয়েও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নীরব। এর দ্বারা এই সমস্ত সংস্কারকর্মীরা এই তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের বিচ্ছিন্নতাই শুধু নয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বোঝাতে চেয়েছেন কিনা বলা কঠিন। তবে এঁদের ক্রিয়া-কলাপেও, এই বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি এবং এঁদের পরস্পর নির্ভরতা ও সম্পৃক্ততাই ফুটে উঠেছে। এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময়কার প্রধান চরিত্রদের অনুপস্থিতি আমাদের সন্দিহান করে তোলে যে এঁদের বহু আপাত-নিরীহ সামাজিক আন্দোলনের মৌল প্রেরণা রাজনৈতিক বুদ্ধিসঞ্জাত। রামমোহন, ভারতীয় ডেমাসথিনীস বলে কথিত রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কেশব সেন প্রমুখের রাজনীতিতে উৎসাহ এর একটা উদাহরণ মাত্র। তবে সংস্কার আন্দোলনের এই ক্ষেত্রভাগ অন্যতর এবং গুরুতর অভিযোগের জন্ম দেয় যে এঁদের সামনে ভবিষ্যতের কোন সামগ্রিক ব্লু প্রিন্ট ছিল না। কোন সমাজ নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ ইউটোপীয়ান স্বপ্ন এঁদের চেতনায় আকার পায় নি। প্লেটোর রিপাবলিক, ক্যাম্পানেলার সিভিটাস সোলি বা বেকনের নিউ এ্যাটলান্টিসের মতো ইউটোপীয়ান কোন স্বপ্ন সমসাময়িক সাহিত্যপ্রচেষ্টাতে বিধৃত হয় নি। এই খণ্ডতাও কি বিবর্তমান

ও নির্মীয়মান শ্রেণী সংক্ষোভের্ অনিশ্চয়তার ও আত্মপরিচয় কুণ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবেই বিচার্য ? যাই হোক এই খণ্ডতা বা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমিতকরণ এই সমস্ত আন্দোলনের একটা দুর্বলতাও বটে।

উনবিংশ শতকের সংস্কারপন্থীদের এটাও একটা উল্লেখযোগ্য দিক যে তাঁরা সমধর্মী চিন্তানায়ক বা কর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে চিন্তার আদান-প্রদানে উৎসাহী হয়েছেন এবং বিভিন্ন বিদ্বৎসমিতি স্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মসূচী জনসাধারণে পরিচিত করানোর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশও একই কারণে সমকালীন ঘটনা। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নিজস্ব বিদ্বদ্মণ্ডলী ও প্রচার-মাধ্যম ছিল। রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা ও ব্রাহ্ম সভার প্রতিপক্ষে রাধাকান্ত দেবদের ধর্ম সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডিরোজীয়পন্থীদের ছিল Society for the Acquisition of General Knowledge। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত সভা ছিল Society for the Promotion of Learning। এছাড়া জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতি আরো নাম করা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত স্থাপন করেছিলেন Society for the Promotion of Bengali Language and Literature।

এই কর্মপদ্ধতির পেছনে একটা বিশ্বাস যেন সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে যুক্তি ও নিয়মতান্ত্রিক আলোচনা শুধুমাত্র সত্যলাভেরই পথ নয় ঐ আলোচনা ও তার প্রচারই সামাজিক শিক্ষা তথা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। জ্ঞানের এই সামাজিক ও সাংগঠনিক রূপদানের মধ্যে মানুষের শুভবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রাণতায় এদের বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে। এই জাতীয় চিন্তায় জ্ঞানের মুক্তিই সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়ে বা অন্যভাবে একই যুক্তির উল্টো পিঠে সামাজিক নানা অসংগতি, অন্যায় বা অবিচারকে নিছকই জ্ঞানের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা বলে মনে হয়। এই জাতীয় যুক্তির অনুসরণ উনবিংশ শতকীয় বাঙালীসমাজেরই বৈশিষ্ট্য

নয়—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে সামাজিক চিন্তানায়কেরা এইভাবে চিন্তা করেছেন যেমন অষ্টাদশ শতকীয় ইংল্যাণ্ডে যুক্তি ও বুদ্ধির সার্বভৌমত্বে এই জাতীয় আস্থা পোষণ করা হয়েছিল। কাজেই এটা নিছক আপতিক নয় যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা চালু করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কারকর্মের দীর্ঘ পর্যায় শিক্ষাসংস্কারে নিয়োজিত করেছিলেন।

এই সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বের তাৎপর্য বিচার করলে আমরা দেখতে পাই বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল বিপ্লবাতঙ্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন নি। যদিচ তাঁর সংস্কার মূলত সামাজিক—ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নয়। প্রচলিত অর্থে ধর্ম সংস্কারক তিনি নন—রামমোহনের ও অন্যান্য ধর্ম সংস্কারকদের সঙ্গে এইখানে তাঁর তফাৎ। ডিরোজীও-অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী রাজনৈতিক চিন্তায় বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন যদিচ চারিত্রিক শুদ্ধি ও দার্ঢ্যে ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় বিদ্যাসাগরের আত্মশ্লাঘা বোধ করার সঙ্গত কারণ ছিল। আসলে চরিত্রশক্তির জন্য বিদ্যাসাগর একটি প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছেন বাঙালীদের চেতনায়। বিদ্যাসাগরের তাৎপর্য বা সাফল্য সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যাসাগর জ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যাকে শুধু মাত্র সভা সমিতি ও পত্রিকার পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক পরিবর্তনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং জ্ঞানকে সমাজ-বিপ্লবের কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহযোগী ও সহকর্মী অন্যান্য সংস্কারপন্থীদের মধ্যে এবং বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের প্রাধান্যের এটা একটা বড় কারণ। বিদ্যাসাগর অতএব শুধু শিক্ষার মাধ্যমে শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের অপেক্ষায় না থেকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে আইন প্রণয়নকে সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গ

বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বের তাৎপর্য কি তবে এই? ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও জ্ঞানের অকুতোভয় সামাজিক প্রয়োগে? অথবা প্রতিভার মৌলিকত্বে? অনেক বেশি দেখার, বোঝার ও ভাবার ক্ষমতা? মৌলিকত্বই কি নেতৃত্বের প্রতিভা—সমাজে ব্যক্তির নেতৃত্ব কি তবে মৌলিকত্বনির্ভর? অথচ বিদ্যাসাগর মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন না। তাঁর সংস্কার-চিন্তা ও সংস্কৃতি-চিন্তা সবই সাম্প্রতিক পরিবেশ থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন।

সমকালীন সমাজের সংস্কারচিন্তা ও সংস্কার-প্রচেষ্টার একটা খতিয়ান নিলেই এটা ধরা পড়ে। নারী-মুক্তি ও নারী-শিক্ষার প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে যে কলকাতায় নারী-শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৯ সনেই। ১৮২২ সনের মধ্যেই কলকাতায় আটটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল—তার মধ্যে শ্যামবাজারে একটি স্কুল মুসলিম মেয়েদের জন্য। পরের বছর এই মহিলা স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল বাইশে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চূড়ান্ত রক্ষণশীল সতীদাহ-সমর্থক রাধাকান্ত দেব নারী-শিক্ষা প্রসারের স্বপক্ষে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। মুসলিম পুনর্জাগরণ ও শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমদ যদিও নারী শিক্ষা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।

এ্যাডমস্ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত।' কলকাতায় মেকানিক্যাল ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই হিন্দু কলেজের শিক্ষাসূচীতে ভল্টেয়ার ও ইউক্লিড পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব দেন। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা ১৮৪৮ সনেই বাঙলা ভাষার চর্চা ও সংস্কারের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটর

১৮৪৩ সনেই বাংলা ভাষার চর্চার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সতীদাহ নিবারণী আইন পাশ হয়েছিল ১৮৩০ সনে। বিদ্যাসাগরের তখন শৈশবকাল। ১৮৪২ সনে অক্ষয় দত্ত তাঁর বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন এবং কুলীনদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, "হে কুলীন ভ্রাতাগণ যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়ে সন্ধিপূর্বক আপনাদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে" এবং পরিশেষে "ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি"র প্রতি আবেদন জানিয়ে এই "পাপনৃত্য" হতে নিরস্ত হতে পাঠকবৃন্দকে আহ্বান করেছেন। এরপর ১৮৫৪ সনের ডিসেম্বরে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৮৫৫ সনের গোড়ার দিকে তা পাঠানো হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ পুস্তক রচনা করেছিলেন এরও ষোল বছর পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের সাফল্যকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ-কীর্তি বলে মনে করতেন। এমনকি বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত চিন্তায়ও তাঁর মৌলিকত্ব নেই। রামমোহন রায় প্রবর্তিত "আত্মীয়-সভার" বৈঠকেই বিধবাবিবাহ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়েছে এমন বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮১৯ সনের Calcutta Journal লিখছেন: "At the meeting in question the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering widows to turn with the corpse of their husbands were condemned." ডিরোজীওপন্থীরা যদিও রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাকে প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদমুখিন বলে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। বিধবা-

বিবাহের ক্ষেত্রে রামমোহন অনুসারীদের চিন্তার সমর্থনেও তাঁরা তেমনি অকুণ্ঠ ছিলেন। গ্রাণ্টের নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় ল কমিশন ১৮৩৭ সনেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করার প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং ১৮৪২ সনের এপ্রিলে বেঙ্গল স্পেকটেটর খোলাখুলি লেখেন যে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধকতা নেই। বিদ্যাসাগরের "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" নামক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৪ সনে। পরের সংখ্যাতেই অক্ষয়-কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে আরেকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া এরও বছর দশেক আগে বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস প্রমুখ ব্যক্তিবিশেষ বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান।

নেতৃত্বের গুপ্ত সূত্র কি তবে গভীর ভাবে বোঝার, ভাবার ও দেখার ক্ষমতায় নিহিত? বিদ্যাসাগরকে কতটা এই বর্ণনা দিয়ে চিহ্নিত করা চলে?

বিদ্যাসাগরের গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ধর্ম-সংস্কারসংক্রান্ত চিন্তা ও কর্মসূচীতে মেলে। বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। প্রভূত কৌতূহল ও আবেগ নিয়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদি পাঠ করেছিলেন। তাঁর সমাজসংস্কারমূলক লেখায় এই শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় আছে। প্রতি-পক্ষ ইসলাম ধর্ম ও খৃষ্টানধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে তাঁর পঠিত কোরান শরীফ এখনো রক্ষিত আছে। সম্ভবত বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তার সামাজিক প্রয়োগের হেরফের তাঁর মনে নানা সংশয়ের জন্ম দিয়ে থাকবে এবং তিনি ব্যক্তিগত চিন্তায় নাস্তিকতা-বাদে উপনীত হয়ে থাকবেন অন্তত তাঁর একজন জীবনীকারের তাই মত। এই নাস্তিকতায় তিনি কী প্রক্রিয়ায় উপনীত তা ভবিষ্যৎ গবেষকদের

অনুসন্ধিৎসার বিষয়। তবে ধর্মাশ্রয়ী আন্দোলন কতটা সামাজিক মুক্তি এনে দেবে সে সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল। ধর্মীয় সংস্কারান্দোলনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস থেকেই সম্যক উপলব্ধি করে থাকবেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্তভিত্তিক করে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের সমন্বয়ধর্মী উদার বুদ্ধি বেদান্তের অভ্রান্ততামূলক বিতর্কের ঘোলা জলে তলিয়ে গেল। সেই বিতর্কে ইয়ং বেঙ্গল দলই শুধু বাইরে থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের রক্ষণশীল প্রবণতাকে আক্রমণ করেন নি, অক্ষয়কুমার দত্তের মত প্রয়োগবাদীরাও দুর্মর সংস্কারের নবরূপে আবির্ভাবে অস্বস্তিবোধ করেছিলেন এবং তাঁরা ভেতরের লোক হয়েও দেবেন্দ্রনাথের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পরের পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কেশব সেনের বিদ্রোহ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার নাটকীয়তায় সাময়িক নতুনত্ব থাকলেও কিছুকালের মধ্যেই বিলাতি শিক্ষিত যুক্তিবাদী কেশব সেন অবতারবাদে উপনীত হ'লেন এবং ভক্তিবাদে কেশব সেনের পরিসমাপ্তি ঘটল। সমাজসংস্কার মহৎ কর্মপ্রেরণা, বিদ্যাসাগর দেখে থাকবেন, ধর্মীয় সাংগঠনিক কোলাহল ও বিতণ্ডায় অপচায়িত হ'ল। কেশব সেন কুচবিহারের যুবরাজের সঙ্গে মেয়ের হিন্দুমতে বিয়ে দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। সনাতন হিন্দুত্বের জয়জয়াকার ঘোষিত হ'ল।

বিদ্যাসাগর শুধু যে ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলন করেন নি তাই নয় তিনি শিক্ষাকেও যুক্তি-আশ্রয়ী, বিজ্ঞানমুখিন ও ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৫২ সনে তিনি হিন্দু কলেজের পাঠপরিক্রমের সংস্কার মানসে ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠের সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্ন তুলে লিখেছিলেন ঃ "হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না।" এবং ১৮৫৩ সনে আরো বলিষ্ঠভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করেছিলেন যে "সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত-

দর্শন এ বিষয়ে আর বিশেষ মতভেদ নেই। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে কোন লাভ হবে না।" লক্ষণীয় যে ঈশ্বরচন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ-স্তাবকের মত এই সমালোচনা লেখেন নি। বার্কলের দর্শন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের তীব্রতা তাঁর স্বীয় মতে স্থির অবিচল বিশ্বাস ও বিচার শক্তিরই পরিচায়ক। সামাজিক মুক্তি তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য।

উচ্চশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের অন্য প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম ও সমাজচিন্তার সঙ্গে তুলনা করলে বিদ্যাসাগরের বস্তুনিষ্ঠতা ও মোহমুক্ত আত্মজিজ্ঞাসার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু পুনর্জাগ-রণের নেতা ছিলেন। তাঁর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যদিও "উন্নতি-কর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সারভাগ গঠিত তবু হিন্দু ধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দু ধর্মে যেরূপ আছে তেমন আর কোন ধর্মেই নাই" এজাতীয় সিদ্ধান্তে বঙ্কিম অনায়াসে পৌঁছতে পারেন। ভারতীয় মুসলমানদেরকে কতকগুলো বন্যজাতি ও অনার্যজাতির সমবায় বলে বর্ণনা করে লিখতে পারেন যে "ভারতীয় আর্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে"। ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখামাত্র বর্ণনা করে ব্রাহ্ম ধর্মের সামাজিক সাফল্যের প্রশ্ন তুলে তাকে নাকচ করেছেন। যদিচ এর পরে তিনিও হিন্দুসমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত "অপবিত্র কলুষিত দেশাচার লোকাচার" থেকে ধর্মকে পরিশ্রুত করে "হিন্দু ধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে" সেটুকুমাত্র রাখার কথা বলেছেন। আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও জন্মান্তরবাদের স্বপক্ষে প্রভূত বিশ্বাস ও অনুমানলব্ধ যুক্তির অবতারণা করে তিনিও হিন্দু ধর্মের অভ্রান্ততা প্রমাণে তৎপর হন এবং তাঁর স্বাজাত্যভিমান "হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" এজাতীয় যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবিরোধী আত্মপ্রতারণাময় সিদ্ধান্তে তাঁকে টেনে নিয়ে যায়। বঙ্কিমের চিন্তাধারা

রক্ষণশীল চিন্তারই নবজীবন দান করেছিল এবং রক্ষণশীলরা তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমও তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় রক্ষণশীল হিসাবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বঙ্কিম যেটুকু দেখতে চাননি সে হল ধর্মেরও একটা সমাজতত্ত্ব আছে—এবং কোন ধর্মকেই তার সামাজিক প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। যে কোন সমাজের ও কালের প্রচলিত ধর্ম ঐ সমাজের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধেরই বিমূর্ত ফর্ম মাত্র।

অবশ্য উনবিংশ শতকীয় ভারতের সংস্কার আন্দোলন সমূহের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারমূলক চিন্তার একটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বহিরাগত সভ্যতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে খৃষ্টধর্ম প্রচারেচ্ছু মিশনারীদের অভিঘাতও এদেশীয় ধর্মব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাজনায়কদের সচেতন করেছে। আমাদের ফিউড্যাল ঐতিহ্যাশ্রিত সমাজে নানা অনাচার ও অব্যবস্থার পরিপোষক হিসেবে ধর্মকে সনাক্ত করে তাঁরা খুব ভাল করেন নি। কিন্তু ধর্ম ঐ সমস্ত অব্যবস্থার পরিপোষক, নিয়ামক সূত্র নয়। কাজেই সামাজিক রূপবদলই ধর্ম সংস্কারকেও অনিবার্য করে তুলেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মসংস্কার দ্বারা ঐ রূপবদলকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। তা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। উনবিংশ শতক থেকে শুরু করে ভারতীয় মুসলিম ধর্মচিন্তার পুনর্নির্মাণমূলক আন্দোলন সমূহেরও প্রেরণা ও পরিণতি একই সত্য নির্দেশ করে। ধর্মকে সামাজিক কাঠামোর একটা প্রতিকল্প হিসেবে দেখতে পারা বিদ্যাসাগরের সামাজিক প্রয়োগের প্রতি ঝোঁকের একটা ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই কারণেই সম্ভবত তিনি ধর্মসংস্কারের চাইতে শিক্ষাসংস্কারকে অনেক বেশি ফলপ্রদ বিবেচনা করেছেন। সমাজসংস্কার এসেছে শিক্ষাসংস্কারের পরিপূরক রূপে।

অবশ্য বিদ্যাসাগরের সামনেও কোন ব্লুপ্রিণ্ট ছিল না—কাজেই

সামগ্রিক জীবন পরিবর্তনের কোন চেতনা বা কর্মসূচী তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় ছিল এমন বলা কঠিন। এটা দুঃখজনক যে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে সমস্ত জীবনশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর সমাজচিন্তা বা শিক্ষাদর্শন বিস্তারিতভাবে তিনি আলোচনা করে যান নি। তাঁর নিভৃত চিন্তা সামগ্রিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবার অবকাশ পায় নি। তবে তাঁর কর্মপদ্ধতি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত দার্শনিক সংস্কারকের মতই তিনিও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিচরিত্রের নির্মাণের দ্বারা আগা-গোড়াই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয় পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তাঁর চিন্তাকে কার্যকরী রূপ দিচ্ছিলেন কিন্তু সাধারণ শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এইখানে যে তিনি এতেই সন্তুষ্ট হয়ে থেমে থাকেন নি, শিক্ষাব্যবস্থার একই সঙ্গে সামাজিক সংস্কার দ্বারা তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাকে ফলপ্রদ হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে আগ্রহী ছিলেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধির কর্ষণে যে তাঁর উৎসাহ ছিল না সাংখ্য বেদান্ত ও বার্কলের সমালোচনায় তা আমরা আগেই দেখেছি। ভারতীয় সভ্যতার স্থবিরত্ব ও অবক্ষয়ের পেছনে তিনি নবন্যায়ের জীবনবিমুখ আকাশচারী নিরালম্ব বুদ্ধি কর্ষণের মূঢ় অহমিকার ভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। তাঁর নিজের সমস্ত সংস্কারপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাই বুদ্ধির ব্যবহারিক প্রয়োগের আদর্শকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক সংস্কার দ্বারা যেমন তিনি সমাজকে মুক্ত শোধিত ও সচল করতে চেয়েছিলেন শিক্ষাব্যবস্থাকেও তেমনি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন—পরিবর্তনকে ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই আবাহন করেছেন : তিনি একই সঙ্গে যোগী ও কমিসার।

বিদ্যাসাগরের এই বাস্তববোধের প্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক উদাসীনতা আলোচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও বিপ্লব সমসাময়িক সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো—নীলবিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি তার মধ্যে প্রধান। বাঙালী

বুদ্ধিজীবীসমাজ নীলকর বিরোধী আন্দোলনে বেশ সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদেরকে ততটা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করেনি। সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ছিলো না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে নগরবাসী চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তপ্রধান বাঙালীসমাজের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। এ ব্যাপারে তাদের ইংরেজদের বর্ণনা ও বিবৃতির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। তা ছাড়া বাংলা দেশের বাইরের সামন্ত নেতৃত্বাধীন, অথর্ব মোগল সম্রাটের নামে পরিচালিত এই বিদ্রোহকে উন্নততর বিজ্ঞানভিত্তিক পুঁজিবাদী প্রাগ্রসর নগর সভ্যতার প্রতিপক্ষে পশ্চাদ্‌মুখিন ও মধ্যযুগীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এবং শেষ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহের করুণ ব্যর্থতা বহিরাগত ইংরেজদের উন্নততর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সবাইকে নিঃসংশয় করেছিল। নীল ও অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতাও বহিরাগত রাজশক্তিকে আরো অনড় অবিচল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা করে উন্মূল করার প্রচেষ্টাকে নিছকই অবাস্তব স্বপ্নবিলাস বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নেরই গাঁট ছড়া এই একটি মূলপ্রশ্নের সঙ্গে গ্রথিত ছিল। পরাধীন দেশের বুদ্ধিজীবী হিসেবে রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়মিত করেছে।

-অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণ-চঞ্চলতা ভবিষ্যদ্‌মুখিন ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ সমাজের বহিঃশোভা, বিজ্ঞানের ব্যবহারের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্তহীন উন্নয়নের সম্ভাবনা, সর্বোপরি ইংরেজ শাসনাধীনে সহস্র অবিচার অনাচার সত্ত্বেও দেশ, কাল, ব্যক্তি নিরপেক্ষ আইনের সার্বভৌমত্বের আদর্শ প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অনেকের মত বিদ্যাসাগরেরও মুক্তবুদ্ধির প্রশংসা অর্জন

করেছিল। ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীসমাজের নানা উদারনৈতিক যুক্তিপ্রধান সংস্কার-আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিসরে নানা উদারপন্থী প্রবাসী ইংরেজ সমাজকর্মীর কর্মপ্রচেষ্টার উদাহরণও যুক্তি, বিবেক ও শুভবুদ্ধির শেষ ও চূড়ান্ত জয়ে বিশ্বাস বিদ্যাসাগর প্রমুখকে ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকেও আনুপাতিক মুক্তির স্বপ্নে উদ্বেল রেখেছে। অন্তত এই আংশিক মুক্তির সম্ভাবনাকেই অনেক বেশি আয়াসসাধ্য বলে মনে হয়েছে।

স্যার সৈয়দ আহমদের মতই তিনিও উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সমাজের শক্তির উৎস সন্ধান করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পোষিত চিন্তা-ধারার মুক্তিতে। নতুন সমাজব্যবস্থার জন্মলগ্নে তাঁর সংস্কারমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের যে সহযোগিতা তিনি পাচ্ছিলেন প্রচণ্ড ও দুর্মর রাজশক্তির বিরোধিতা দ্বারা যে পৃষ্ঠপোষণা তথা সামাজিক মুক্তি ও উন্নততর জীবনযাত্রার সম্ভাবনা তিনি হারাতে রাজি ছিলেন না। ব্যক্তিপ্রধান চিন্তাধারায় এমনটি ভাবাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ ও নানা কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার উদাহরণই শুধু নয় উগ্র রাজনীতিপন্থীদের স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতার নানা দৃষ্টান্তও তাঁর চোখের সামনে ছিল। রামমোহন রায়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। রামমোহন রায় ইউরোপীয় গণমুক্তিকামী বিপ্লবী চিন্তা ও আন্দোলন দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন। নেপল্‌স্‌ এর ১৮২১ এর বিপ্লবের ব্যর্থতায় তিনি মর্মাহত হন। আবার স্প্যানিশ আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৮৩০ সনের জুলাই মাসে যখন ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হ'ল সেই বিপ্লবের সাফল্যে কলকাতায় একটি ভোজ সভারই আয়োজন করে ফেললেন। কিন্তু এহেন বামপন্থী চিন্তার শরীক হয়েও তিনি বিলেতে গণতন্ত্রের বিকাশে প্রভূত প্রত্যাশা করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের মোহ তাঁকে গণবিক্ষোভকে সন্দেহের চোখে দেখতে প্ররোচিত করেছিল এবং

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়েও—সেই স্বাধীনতাকে কামনা করেছিলেন ধূমায়িত গণবিক্ষোভের প্রতিষেধকরূপে। রামমোহনের নীল চাষ সংক্রান্ত ধারণাও এজাতীয় স্ববিরোধিতার অন্য দৃষ্টান্ত। ডিরোজীওপন্থীরা রামমোহনকে মূলত তাঁর ধর্মচিন্তার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল রূপে চিহ্নিত করেও নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ব্যক্তিগত জীবনপদ্ধতিতে নানা উন্মার্গগামিতা ও স্ববিরোধের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। সমাজে এঁদেরও রাজনৈতিক কর্মসূচী খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। বিদ্যাসাগর এসবই অবহিত ছিলেন।

রাজনৈতিক বিক্ষোভ যেটুকু নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—তার ফলাফল হিসেবে কোম্পানির হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে শাসনভার হস্তান্তরিত হয়েছিল। আইন, শিক্ষা ও পুলিশ সংগঠন সম্বন্ধে কমিশন বসান হয়েছিল। এর ফলে সমাজে একজাতীয় আশাবাদ সঞ্চারিত হয়েছিল। এরও পরে প্রায় পৌনে একশতাব্দী ধরে ভারতীয় সাংগঠনিক রাজনীতি আবেদন নিবেদনের পথ ধরে চলেছে। ঊনবিংশ শতকের এই সামাজিক রূপবদলের আশানিরাশার দোদুল্যমান মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের কাছে তাই বিপ্লবী গণমুখিন নেতৃত্ব আশা করা অবাস্তব। এবং বিদ্যাসাগরের রাজনৈতিক অনুপস্থিতির অন্যান্য দিকগুলিও মনোযোগের দাবি করে।

ঘ

বাংলাদেশ তথাকথিত সমগ্র ভারতবর্ষ যে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছিলো সেখানে আপামর জনসাধারণ ত দূরের কথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই রাজানুগ্রহ ছাড়া অস্তিত্ব বিপন্ন ছিল। ব্যক্তির স্বাধিষ্ঠান ও প্রতিভার আত্মবিকাশ তাই এই সময়কার বুদ্ধিজীবীদের বহুকাঙ্ক্ষিত বিষয়। সমাজের মুক্তি যে এই ব্যক্তিমুক্তির পথেই আসবে

রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ বর্ণ-গোত্রকুল নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বের সাফল্যের দ্বারা যেন এ সত্যই প্রমাণিত হয়ে চলেছিল। সমষ্টির সর্বোদয়ের কামনা করা সে জন্যে ইতিহাসের পর্যায়কেই যেন টপকে যাওয়া।

অবশ্য একথাও সত্য যে সামগ্রিকভাবে সমাজ প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে বুঝবার ইচ্ছা বা অবকাশ বিদ্যাসাগরের ছিল না, সন্দেহ হয় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বও তার প্রতিবন্ধক ছিল। তাঁর আত্মনির্ভরতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতায় আস্থা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপকরণ মাত্র। এবং এরও সামাজিক নিয়ামক ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা ও প্রশ্নাতীত সততার জন্য তিনি সমাজে যে নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন যার জন্য তিনি শাসক শ্রেণীর উচ্চতম মহলে পরিচিতই হননি স্বদেশ ও জাতির প্রতিনিধি হিসেবে উচ্চতম মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন—এই সফলতাকে সামাজিক-নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে কখনো প্রশ্ন সঙ্কুল হওয়ার সুযোগ দেয়নি, বরং তাঁর নিজের নেতৃত্বের উপযোগিতায় বিশ্বাসকেই লালিত করেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের এই ঈর্ষনীয় উত্তুঙ্গ অধিষ্ঠান থেকে সামাজিক প্রক্রিয়ায় অনতিগোচর সমগ্রের দিকপ্লাবী প্রবাহ ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা হয়তো সহজ নয়।

অন্যথায় আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি, বিবেক, চিন্তার ক্ষমতা বা সাহস কোনটারই অভাব বিদ্যাসাগরে ছিল না। সাহসের অভাব তো নয়ই। এই রাজনৈতিক আত্ম-অপসারণ তথা সমষ্টির রাজনৈতিক ভূমিকার উপলব্ধির অভাবই কি তবে সাফল্যনির্ভর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের তথা নেতৃত্বের সীমানা? একাধিকবার শিক্ষা-সংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সরকারী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির বিপক্ষে অকুতোভয় মতামত প্রকাশ করেছেন ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য সাংসারিক উন্নতি বা এমন কি জীবনের নিরাপত্তার কথা না ভেবে রাজরোষকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু

ততোধিক অবহেলা ভরে উপেক্ষা করেছেন স্থিতস্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সমাজপ্রধানদের উষ্মা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে। তাঁর সংস্কারচিন্তা প্রয়োগের তাগিদে তিনি বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ক্ষুদ্র পরিসর ও পত্রিকার আলোচনা স্তম্ভের নিরাপদ আড়াল থেকে বাইরে এসে হিন্দু-সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংস্কার-আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতারই পরিচায়ক শুধু নয় তাঁর অসম-সাহসিকতারও পরিচায়ক। নিজের ছেলেকে বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এই সাহসিকতারই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু তবু তাঁর বিবাহ সংস্কার-আন্দোলন সমাজ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নি। সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতাকে নিজের একক চরিত্রবল ও বিশ্বাস দিয়ে প্রতিহত করতে পারার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় যেমন তিনি বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকীয় ব্যক্তি নেতৃত্বের চূড়ান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন তেমনি তাঁর বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ব্যক্তিরও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হল—সে ব্যক্তি যতই বিপ্লবপ্রভ যুগান্তকারী ও সততায় উজ্জ্বল হোক না কেন।

ঊনবিংশ শতকের সমাজ কালান্তরের সমাজঃ দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা এর প্রধান ব্যক্তিপুরুষদের ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করেছে। এই অস্থিরতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার হাতছানি সামাজিক বিরোধ, প্রতিবন্ধ সম্বন্ধে একদিকে যেমন এই সমস্ত ব্যক্তিপুরুষদেরকে সচেতন করেছে তেমনি তাদেরকে বিদ্রোহীও করেছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকে বিদ্রোহীদের যুগও বলা যায়। রামমোহন ও ডিরোজীও, বিদ্যাসাগর ও মাইকেল এর উদাহরণ। রামকৃষ্ণও এক ধরনের নন-কনফর্মিষ্ট বিদ্রোহী—তবে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বাইরে তাই এই প্রসঙ্গে চট্ করে তাঁর নাম আমাদের মনে পড়ে না। এই সমস্ত ব্যক্তিপুরুষরা সকলেই বিভিন্নক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যদিও সমাজে তার আবেদন ও নেতৃত্বের সাফল্য সমাজের সকল শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর লোকদের জন্য একরকম হয়নি। বাংলাদেশের এক বিশেষ ঐতিহাসিক

পর্যায়ে এই সমস্ত ব্যক্তি বিদ্রোহীদের প্রায় সমকালীন আবির্ভাব যেমন শুধুমাত্র আকস্মিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না তেমনি এঁদের নেতৃত্বের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাও শুধুমাত্র এঁদের চারিত্রিক গুণাবলীর ফলাফল বলে ভাবলে অসম্পূর্ণ বোঝা হবে। আসলে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই এঁদের উত্তর এবং এঁদের সাফল্য বা ব্যর্থতাতেও একই সামাজিক সূত্রাবলীর ভূমিকা আছে। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাও এই একটি প্রেক্ষিত থেকে বীক্ষণ করলেই আমরা একদিকে চারিত্রিক নিয়তিবাদ ও অন্যদিকে বস্তুতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাই।

উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চাহিদাকেই মূর্ত করেছিলেন, তাঁদের নেতৃত্বের উৎসও এইখানে। সামাজিক সম্পর্কের দোলাচলেই এই সমস্ত চাহিদার উদ্ভব। যখন সামাজিক সম্পর্ক দ্রুত বদলাতে থাকে তখন বিকাশোন্মুখ নতুন সামাজিক সম্পর্ক নতুন নতুন চাহিদার জন্ম দিতে থাকে—এই পরিবর্তনের নাটকীয়তাই আকাঙ্ক্ষার নাটকীয়তায় রূপান্তরিত হয়, বিদ্রোহী পুরুষের জন্ম হয়। উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙলা দেশের যেহেতু সামগ্রিক রূপবদল হচ্ছিল, নানা বিভিন্নমুখী বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার ও প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন এমনকি আপাতবিরোধী আন্দোলন চলছিল। নেতৃত্বের ভূমিকা এই সমস্ত চাহিদার দিকে দৃষ্টি নির্দেশ করা ও তার পূরণের ব্যবস্থা করা। এই পথিকৃত্বেই তার গৌরব বা ক্ষমতা। এইটুকুই তাঁর সৃষ্টিশীল ভূমিকা, বস্তুতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের ওপরে ব্যক্তিত্বের জয়। এবং তিনি এই অর্থে বীর। কিন্তু তাঁরও ক্ষমতা অসীম নয়—স্বাভাবিক দূরপ্রসারী ঘটনা-প্রবাহে তিনি বেগের সঞ্চার করতে পারেন, তাকে সচেতনভাবে আত্মস্থ করে নেতৃত্ব দিতে পারেন কিন্তু তাকে রোধ করতে পারেন না বা স্বাভাবিক প্রয়োজন উদ্বেলিত প্রবাহের মোড় ঘোরাতে পারেন না। এখানেই ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা ও তার পরাজয়।

বিদ্যাসাগর যে তাঁর একক নেতৃত্বের প্রবলতায় সমগ্র সমাজকে এতটা নাড়া দিতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর মৌলিকত্বে নয় বা চারিত্রিক দৃঢ়তা বা সততামাত্র নয় তার কারণ তিনি কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তনের প্রবণতাকে প্রত্যক্ষ সহজগ্রাহ্য রূপ দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কারান্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় যতটা পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রশ্রয়ে বিকাশোন্মুখ বাঙালীসমাজের প্রধান সামগ্রিক প্রবণতাগুলিকে রূপ দিচ্ছিল ততটুকুই তিনি সাফল্যে ভাস্বর, যতটুকু তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ফলাফল সামাজিক সম্পর্কের দোলাচলে যার সমর্থন ছিল না ততটুকু তিনি ব্যর্থ—ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা।

বাঙালীসমাজ পরিবর্তিত হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু সে পরিবর্তনের সীমারেখা চিহ্নিত করা কঠিন নয়। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত নগর সভ্যতা ও নতুন অর্থনৈতিক রূপবদল অংশভাক্ কিন্তু মূল সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক, সামন্তপ্রধান ও বর্ণাশ্রম প্রথা পোষিত। এই কারণেই তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলন সাময়িক আবর্ত সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেছে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আঞ্চলিক ও সীমিত সাফল্য একই কারণে নিয়ন্ত্রিত। ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রভাব নগরসীমার বাইরে যায় নি তাঁদের রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ভূমিকা সত্ত্বেও। ব্রাহ্ম আন্দোলন হিন্দু পুনরুত্থানের জোয়ারে গেছে তলিয়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বতঃস্ফুর্ত ভক্তিবাদ নতুন পরিবেশে সহজ স্বীকৃতি পেয়েছে—আচার নিপীড়িত সমাজে তার আচার দ্রোহিতার সঙ্গে আপোস করে নেয়া কঠিন হয় নি। কারণ ধর্মসংস্কার ধর্মবিপ্লবের নৈরাজ্যের অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে নি। বঙ্কিমের বুদ্ধিচর্চা ও বিবেকানন্দের সাংগঠনিকপ্রতিভা হিন্দু ধর্মের পুনঃসংস্থানে বাকি কাজটুকু সম্পন্ন করেছেন।

সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেই সমাজ মানসিকতার জন্ম হয়। ব্যক্তির নেতৃত্বের ক্ষমতা বা প্রতিভা এই মানসিকতার বিরোধিতায়

নয়—এই মানসিকতা কোন্ দিকে বদলাচ্ছে সেটা বুঝতে পারায় এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করায়। এই অর্থে ব্যক্তি সৃষ্টিশীল—ইতিহাসের স্রষ্টা। বিসমার্ক যে বলেছিলেন ইতিহাস যতক্ষণ তৈরি হচ্ছে আমার অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—তা আর সত্য নয়। ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলী তার আবেগপ্রবণতা বা মনঃসংন্যাস, তার নিজস্ব আত্যন্তিক পরিবেশ সামগ্রিক আন্দোলনে নিজস্ব বৈচিত্র্য দেয় কিন্তু মূল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে না। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সামন্ত-প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রভাবিত করে থাকতে পারে অথবা ইয়ং বেঙ্গলদের সম্বন্ধে সংশয় সিভিল ম্যারেজ আন্দোলনে তাঁকে নিরুৎসাহিত করে থাকবে কিন্তু তাঁর সামগ্রিক সংস্কারপ্রচেষ্টার সাফল্য বা ব্যর্থতা এজাতীয় আপতিক ঘটনাবলী দ্বারা ততটা সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর আন্দোলনের সাফল্য যেমন শুধুমাত্র ব্যক্তি নেতৃত্বের ফলাফল নয় তাঁর ব্যর্থতাও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা দিয়ে বিচার্য নয় এটাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তাৎপর্য আজকের সমাজে।

বিদ্যাসাগর : সংস্কারক এবং শিল্পী

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বহু বরণীয় মানুষ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ধন্য হয়েছিল। তাঁদের অনেকে আজ বিস্মৃত ; অনেকের স্মৃতি আজও হয়তো প্রদীপের ন্যায় মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে ; যুগঝঞ্ঝার ফুৎকারে কখন বা তা নিভে যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু যুগঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণের মুখেও নিষ্কম্পদীপ শিখার ন্যায় আজও নিজ মহিমা প্রকাশ করে চলেছে, এমন একটি ব্যক্তিত্বের কথা আমরা কোন ক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না। সে ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য যুগান্তরেও ক্ষীণ হয়নি, বরং নতুন সমিধ পেয়ে তা আরও যেন বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে অপরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি হলেন 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগর। বরণীয় অনেক মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, কিন্তু প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন 'একতম'। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য ও তজ্জনিত অভিনবত্বের ইঙ্গিত করতে গিয়ে জনৈক সুধী বলেছেন :

"আমাদের এই মানুষের সমাজে দেবতার চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ মানুষ। তপস্যা করে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সহজে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন

অলৌকিক শক্তির জোরে নয় সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।" ১

বস্তুত আমাদের সমাজে 'মানুষের চেতনার আকাশ' যেখানে শত শতাব্দীর জের টেনে 'অতি-প্রাকৃত লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল' 'সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব' হয়েছিল 'কি করে', তা ভাবলে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তাঁর পূর্ব-পথিক রামমোহন আমাদের চেতনার আকাশের ঐ কুয়াশাচ্ছন্নতাকে বিদীর্ণ করে সমাজের মানস-পটে একান্ত মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন। শাস্ত্রাচারের চক্র-ব্যূহে প্রবিষ্ট হয়ে অভিমন্যুর ন্যায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে অনেক কণ্টকই তিনি উৎপাটন করেছিলেন সন্দেহ নেই। তবে ঐ ক্ষেত্রেই 'pinned down' হয়ে পড়েছিলেন বলে বৃহত্তর সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মবিস্তারের সুযোগ পান নি। তাই তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বও পরিপূর্ণ প্রভায় জ্বলে উঠতে পারে নি। বিদ্যাসাগর ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের দুর্গে প্রবেশ করে, কেবল মানুষকেই সকল কর্ম-চিন্তা ও ভাবনার কেন্দ্র করে, অতিলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের বশ্যতা অস্বীকার করে, সামাজিক জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলেছিলেন। ধর্ম ও শাস্ত্রাচারের দুর্গ থেকে তাঁর প্রতি তীর বর্ষিত হয়েছে, হুমকি প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় এক হাতে সে আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, তার প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন যুক্তি ও তর্কের লক্ষ্যভেদী বাণ নিক্ষেপ করে আর এক হাতে রচনা করে চলেছিলেন মানব কল্যাণের নানা ক্ষেত্র শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে। অপরাজেয়, পৌরুষ, অদম্য মনোবল, অপরিসীম চরিত্রবল ও অতুলনীয় কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ

১. বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড। [প্রথম সংস্করণ] পৃ ১

শক্তির আক্রমণকে প্রায় নিঃসঙ্গভাবে মোকাবেলা করে তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাহ্নলগ্নে শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের শ্বাসরুদ্ধকারী অশুভ প্রভাবে আবিষ্ট বাঙালীসমাজে সুস্থ মানববুদ্ধির জয় ঘোষণা করে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তাই যুগান্তরে আমাদের মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অনেকটাই সম্ভব করে তুলেছে।

বিদ্যাসাগর-জীবনীকারের মত আমাদের মনেও এক বিস্ময়ান্বিত প্রশ্ন জাগে ঃ "যে সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতি-প্রাকৃত লোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানস-পটে বিদ্যাসাগরের মত এক মানব-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে?"[২] উনিশ শতকের বাংলা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন-গড়নের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন বলে মনে হবে না। তাঁরা বলবেন, 'যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।' উনিশ শতকে না জন্মে দু' এক শতাব্দী আগে জন্মালে পরিবেশের সার্বিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীয় মুক্তিসাধনার আত্মিক জগতে। চরিত্রগুণে তিনি হয়তো দেবতার মর্যাদা লাভ করতেন, কিন্তু তিনি মানব-সর্বস্ব কর্ম-চিন্তার বৈভব দেখিয়ে একালের বহু মানুষের মধ্যে 'একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না'। আসল কথা, উনিশ শতকে ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা দেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, সেই নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ ছিল মানব-কেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণার ব্যাপকস্ফূর্তি। সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় মানব-চিন্তার এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম্। অপার্থিব, অমর্ত্য, অদৃশ্য ও অলৌকিক *জগৎ থেকে পার্থিব, মর্ত্য, পরিদৃশ্যমান লৌকিক জগতের প্রতি মানুষের* সকল চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াসই হিউম্যানিস্ট

২. পূর্বোক্ত—পৃ ৪

আদর্শ। এর ফলশ্রুতি হল মানবতন্ময়তা ও মানবমুখিতা। বিদ্যাসাগর এই আদর্শেরই ব্যাপক প্রেরণায় 'দুঃসাহসিক সমাজ-কল্যাণ ব্রতে' উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহনে এ প্রেরণা বেশ কিছুটা কার্যকরী লক্ষ্য করি, তার পরেও অনেক কৃতিমান্ বাঙালীর কর্ম ও চিন্তাধারায় তার তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু উনিশ শতক তো বটেই, এই বিংশ শতাব্দীতেও হিউম্যানিস্ট কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের তুল্য মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব একটিও চোখে পড়ে না। বিদ্যাসাগরের সমকালে এবং তাঁর পরেও এদেশে প্রতিভাবান্, বিদ্বান্, দানশীল মানুষের অভাব ঘটেনি। কিন্তু বিদ্যাসাগর-চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে অখণ্ড, সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। প্রথমাবধি বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা—শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণপ্রচেষ্টা, পরিচালিত হয়েছে ঐ সুউচ্চ মনুষ্যত্ববোধ-প্রসূত সার্বিক কল্যাণকামনা দ্বারা। কোন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা, ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসেব, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বল কামনা বা অমরত্বলাভের বাসনা থেকে তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে নি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা না চাইতেই এসেছে; অবশ্য তার জন্যে তাঁর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। হীন, স্বার্থান্ধ প্রতিপক্ষের হিংস্রতার উগ্রতা কখনই পারে নি এ দৃঢ়চেতা লোকটিকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলতে। সকল রকম হীনতাকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন। শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সবার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছিল তাঁর কর্মযজ্ঞের অজস্র সুফল। অনন্যতন্ত্র প্রতিভার বলে নয়, অনন্যতন্ত্র মনুষ্যত্বের অখণ্ড মহিমার গুণেই তাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা লাভ করেছিল। তাঁকে অতিক্রম করার সাধ্য আজ পর্যন্ত কারও হয়নি। মধুসূদন যে তাঁকে greatest Bengali বলেছিলেন সেটা কৃতজ্ঞ কবিচিত্তের সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র ছিল না। সেটা ছিল মহাকবির সুগভীর অন্তরানুভূতি ও মানবচরিত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য।

ঐ একই বোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর প্রশস্তি।[৩]

বিদ্যাসাগরচরিত্রের এই অপার মহিমাকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে হলে তাঁর জীবনের সেই 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শকেই ভালভাবে বুঝতে হবে, যে আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে, তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষা-সংস্কারমূলক কাজে ও 'সমাজ-কল্যাণের গণতান্ত্রিক' কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যার ফলে উনিশ শতকের বাংলা দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি চরিত্রবিশ্লেষণে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন। মধুসূদন বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত চিঠিপত্রে, রবীন্দ্রনাথ অনুপম চারটি প্রবন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর একটিতে অতি সার্থকভাবে সে চরিত্র-মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি ইতিমধ্যেই সে চরিত্র মহিমার ইঙ্গিত দিয়েছি। এখন দেখাতে চেষ্টা করব শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ মানব-কল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে তাঁর হিউম্যানিস্ট অর্থাৎ মানবমুখিন জীবনাদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে।

একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা, এমন কি তাঁর সাহিত্যকর্মও, মূলত সংস্কারমূলক। দৈন্য-দুর্দশাগ্রস্ত বিকলাঙ্গ হিন্দুসমাজকে তিনি ব্যাপক শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সুস্থ ও সবল করে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঐ একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি বাঙালী শিক্ষার্থীর জন্যে 'an enlightened Bengali Literature' সৃষ্টির চেষ্টা পেয়েছিলেন। বাংলা গদ্য ভাষায় একটি সুষ্ঠু প্রকাশক্ষম রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, হিন্দি, সংস্কৃত ও

৩. রবীন্দ্রনাথ—চারিত্রপূজা গ্রন্থের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধচতুষ্টয় দ্রষ্টব্য।

ইংরেজির ভাণ্ডার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে নতুন সাহিত্যের ভিত নির্মাণের অক্লান্ত সাধনা ঐ একই সংস্কারপ্রয়াসেরই বিচিত্র ভঙ্গিমা। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তিনি পান নি; তার অবকাশ হয়নি বলেই বোধ হয়। মানব-কল্যাণ কামনায় অধীর অসহিষ্ণু এই মানুষটি এদেশের আপামর জনসাধারণের মূকমুখে ভাষা জোগানোর কাজকে, নিজের স্বাধীন শিল্প-সাধনার চেয়েও, বড় কাজ মনে করেছিলেন। তাই স্বাধীন কল্পনাপুঞ্জ 'মৌলিক' সাহিত্য বচনার পথে না গিয়ে তিনি বাংলার শিশুদের জন্যে, কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্যে, বাংলা ভাষায় প্রাঞ্জল, সহজ-বোধ্য জ্ঞানগর্ভ পাঠ্যগ্রন্থ রচনায়ই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশি করে। সবচেয়ে বড় কাজ যেটি তিনি করেছিলেন সেটি হল নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ভদ্র-সমাজের উপযোগী করে মার্জিত ও পরিশীলিত রূপ দান করলেন। আর এই গদ্য ভাষারই প্রকাশক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে লিখেছিলেন 'বেতালপঞ্চ-বিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' ও 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মত গ্রন্থ। এ সব গ্রন্থে তাঁর গদ্যরচনাশৈলী চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য 'বিধবাবিবাহের' মত বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থে এবং বিশেষত বেনামীতে রচিত কয়েকটি ব্যঙ্গরচনায় সে ভাষা যে আরও ঋজুতা লাভ করেছে, তা বলাই বাহুল্য। ভাষার প্রাণশক্তি আবিষ্কারের এই অতন্দ্র সাধনা তাঁর শিল্পীমনের অর্গল যে খুলে দিয়েছিল, সে কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাঁর অনুবাদমূলক আখ্যায়িকা গ্রন্থেই নয়, বিতর্কমূলক রচনায়, এমনকি তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য অনেক পুস্তকেও, এই শিল্পীমনের স্বাক্ষর মিলবে। তাই সংস্কারক বিদ্যাসাগর শিল্পীও বটেন সন্দেহ নেই।

কনিষ্ঠ সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগরের ভাষার অপরূপ

মাধুর্যের প্রশংসা করে, তাঁকে মৌলিক স্রষ্টার কৃতিত্ব দানে অস্বীকৃতির অজুহাতস্বরূপ বলেন যে তাঁর সৃষ্টি মূলত অনুবাদমূলক, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজির ভাণ্ডার থেকে গৃহীত ; তখন তাতে পূর্বসূরীর কৃতিত্বকে অহেতুক খাটো করে দেখবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আসলে অমন সুমধুর ভাষাসৃষ্টির ক্ষমতাকে শিল্পকর্ম বহির্ভূত ব্যাপার মনে করাটাই একটা অরসিকের কাজ, একথা বঙ্কিম ভালভাবেই জানতেন। তাই ভাষার মাধুর্যের প্রশ্নটিকে উল্লেখমাত্র করে তিনি রচনার বিষয়বস্তুর মৌলিকতার অভাবের ধুয়া তুলে বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তাকে কটাক্ষ করেছেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমের personal prejudice-ই যে বঙ্কিমের এই বিভ্রান্তির জন্যে দায়ী তা না বললেও চলে। সে যাই হোক, একথা স্বীকার্য যে হিউম্যানিস্ট আদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার কর্মে হাত দিয়েছিলেন, সে একই প্রেরণায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে সংস্কারকের মনোভঙ্গী ও উদ্দেশ্য প্রকট লক্ষ্য করলে, বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাঁর সকল কর্মই পরিপূরক, তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্ববোধের পরিপোষক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের এই কর্মধারার পিছনে তৎকালীন বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের কয়েকটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষার পোষকতা লক্ষ্য করা যায়। সে দুটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "সে-কালে বাঙালী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় চেয়েছিল স্থায়িত্ব, সমাজ-ব্যবস্থায় চেয়েছিল হিন্দুয়ানি ও খ্রীষ্টানির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা।"[৪] বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকধর্মী গদ্যরচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য অর্জনের ঐ মৌলিক আকাঙ্ক্ষা দুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর তাঁর সত্তর বছরের জীবনে যে বিপুল কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান

৪. প্রমথনাথ বিশী—বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, ১ম সংস্করণ, পৃ ৬৮

করেছেন, তার তাৎপর্য একালের বাঙালীর পক্ষে তাই অপরিসীম। মানব-হিতকর বিচিত্র কর্মযজ্ঞে গোটা জীবনটাকেই যেন আহুতি দিয়েছিলেন তিনি। তার জন্যে জীবনের সকল আরাম আয়েশকে তুচ্ছ করেছিলেন, সমাজের নিন্দা-গঞ্জনাকে করেছিলেন অঙ্গভূষণ, সাংসারিক জীবনের সুখশান্তি থেকেও বঞ্চিত করেছিলেন নিজেকে। আচারের নীরস মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল যে জীবনপ্রবাহ, যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল নানা জীর্ণ সংস্কারের শৈবালদাম, তাকে জীর্ণতামুক্ত করে নবজীবনের খাতে পরিচালিত করার এক সুকঠিন দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গ্রীক-পুরাণের রাজা Augeas-এর আস্তাবলে যুগযুগ-সঞ্চিত অশ্ব-পুরীষের পর্বতস্তূপ অপসারণ করতে যেমন দরকার হয়েছিল Hercules-এর মত মহাবলশালী মানুষের হস্তক্ষেপ, তেমনি শাস্ত্রাচারের দুর্গে বন্দী ভ্রষ্ট-চরিত্র, নষ্ট-বিবেক, সংস্কারের ক্রীতদাস এ দেশের সহস্র সহস্র মানুষকে দুঃসহ নারকীয় পরিবেশ থেকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসার জন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুঃসাহসী, অক্লান্তকর্মী সর্বত্যাগী সংগ্রামী মানুষ বিদ্যাসাগরের। মহাবল হারকিউলিসের ন্যায়ই বিদ্যাসাগর সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের বেগবান প্রবাহ রচনা করে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন এদেশের সামাজিক মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক নানা কদাচারের যুগযুগান্ত সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ। একদিকে সর্বরকম জীর্ণতার অবসান কামনা, অপর দিকে নব-জীবনের বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় মানবিক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা —এই দ্বৈত তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাতে সাফল্য কতটা এসেছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু তার প্রচেষ্টার ফল যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, বাংলা দেশের বিতর্কমান ইতিহাস তার সাক্ষ্য। যদি বলি, একালের বাঙালীর মেরুমজ্জায় যে কিছুটা শক্তি লক্ষ্য করা যায়, সুস্থ জীবনের স্বাদ পাওয়ার যে তীব্র তাগিদ তার দৈনন্দিন আচরণে পরিস্ফুট, ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস-

সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেদীপ্যমান, তার মূলে বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মের অবদান অনেকখানি, তা বোধ হয় কোন যুক্তিতেই অস্বীকার করা চল্‌বে না। দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দুর্গে বন্দী, বহুকাল ধরে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে জড়ত্ব-প্রাপ্ত বাঙালীর ভাব-চিন্তার রুদ্ধ জগতে বিপ্লবী সংস্কার-কার্যের জোরালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাই যে ঊনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু-সমাজকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছিল, তা এক তর্কাতীত সত্য। মোটকথা, মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডূকতা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে বাঙালীকে আধুনিক জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে রামমোহনের পরেই একতম কৃতিত্বের দাবিদার বিদ্যাসাগর। রামমোহন আধুনিকতার আগমনী গেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সমাজজীবনের চৌহদ্দিতে।

আগেই বলেছি, রামমোহনের মত ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, বিদ্যাসাগর বৃহত্তর সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত হতে দেন নি। পারলৌকিক বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে সবল কাণ্ডজ্ঞানের প্রশস্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র সামাজিক জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের দূরদর্শিতার। তিনি বুঝেছিলেন তর্ক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় মূঢ়তাকে আঘাত হানা যায় বটে ; কিন্তু তাতে শীঘ্র সুফল লাভের আশা দুরাশাই বটে। তার চেয়ে যে দেশাচার শাস্ত্র ও ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করে মানুষকে চূড়ান্ত হীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যা মানুষের সুস্থ বিবেকবুদ্ধির উপর একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিশেষ ; যা মিথ্যা সংস্কারের কূপে নিক্ষেপ করে যুগযুগ ধরে সামাজিক নরনারীর দুর্দশার একশেষ ঘটাচ্ছে ; যার প্রশ্রয়ে মূর্খতা ও অজ্ঞানতা দম্ভভরে পাণ্ডিত্যের মুখোশ এঁটে স্বাধীন চিন্তাকে টুঁটি চেপে মারার মত আস্ফালন করে, সেই সর্বনাশা দেশাচারের দুর্গে আঘাত হেনে তাতে ফাটল ধরিয়ে বন্দী মানুষগুলোর মুক্তির পথ করতে পারলে পরিণামে বেশি সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, একথা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই দেখি

নানা কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন সামাজিক অচলায়তনের দিকেই তিনি প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। একদিকে শিক্ষার সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে তিনি সেই অবরুদ্ধ অচলায়তন থেকে বহির্গমনের পথনির্দেশ করে সবাইকে মুক্তির নবালোকে আহ্বান করেছিলেন। অপরদিকে সংস্কারকের সম্মার্জনী প্রয়োগে সমাজ-জীবনের জরা-জীর্ণতার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন প্রাত্যহিক এ বর্ত্মেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির, সুযোগ পাওয়া যাবে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের। ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই। তাই দেখি বিদ্যাসাগর ধর্মীয় বিতণ্ডায় না জড়িয়ে পড়ে অযথা শাস্ত্র-বিচারে কাল হরণ না করে সমাজ-সংস্কারের বাস্তব পথ ধরেছিলেন প্রথম থেকে। সমাজ-সংস্কারের তাগিদেই বাস্তব বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তিনি শিক্ষা-সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। আবার শিক্ষা-সংস্কারে সার্থকতা অর্জনের বাস্তব উপায় হিসেবেই তিনি বাংলা ভাষায় জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বাস্তববুদ্ধিই তাঁকে শিখিয়েছিল যে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য যত মূল্যবানই হোক না কেন দেশীয় ভাষায় তার রস সম্পদ আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে, তার দ্বারা কোন কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারে নানা সুপারিশ করতে গিয়ে একটি কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত "এক সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলা।"[৫] মোট কথা, তাঁর সকল সংস্কার প্রচেষ্টা ছিল একটি সুশৃঙ্খল চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি এক সুদক্ষ সেনানীর ন্যায় সুপরিকল্পিত চিন্তা-প্রণালী অনুযায়ী একটির পর একটি আক্রমণ রচনা করে সামাজিক অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে

৫. বিনয় ঘোষপ্রণীত বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ. ৩য় খণ্ড। পরিশিষ্ট 'Notes on Sanscrit College' দ্রষ্টব্য।

মুক্তির নবালোকে বাঙালীকে টেনে এনেছিলেন। এ সংগ্রাম বড় সহজ ছিল না—এ ছিল তাঁর জন্যে এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষা।

এ কার্যে সহযোগিতা তিনি যতটা পেয়েছিলেন, বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার চেয়ে শত গুণে বেশি। রামমোহন ও ইয়ংবেঙ্গলের ভাবধারায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের ক্রিয়াশীলতা কোনদিনই তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে দেশাচার অমান্য করার, পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানার সৎসাহস তাঁদের অনেকেই দেখিয়েছেন, কিন্তু কোন সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা সমাজের জন্যে তেমন ফলপ্রদ হয়ে উঠেনি। বিদ্যাসাগরই প্রথম সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ, পণ্ডিতসমাজের একাংশের এবং কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর প্রায়শ মৌখিক ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া বিশেষ কোন সাহায্যই তিনি পাননি। একাই তিনি সহস্র রথীর ন্যায় অমিত বিক্রমে সংগ্রাম করে গিয়েছেন সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। একবার কাজে নেমে পড়লে, কিছুতেই পিছ-পা হননি তিনি। আপন কল্যাণব্রতের মহিমায় নিঃসংশয় বিশ্বাসের অধিকারী এই মানুষটি যে অদ্ভুত কর্মোদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা দেশের ইতিহাসে প্রায় নজির-বিহীন। নানা সংস্কারমূলক কাজ উপলক্ষ করেই প্রকাশ পেয়েছিল এই কর্মোন্মাদনা। একদিকে দেশে সাধারণ-শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্যে যেমন তিনি অক্লান্ত কর্মীর ন্যায় কাজ করেছেন, অপর দিকে শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্যে দিনরাত চিন্তা করেছেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সুপারিশ করে তিনি যে একাধিক রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও নৈয়ায়িক মন অপূর্ব ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষার সঙ্গতিবিধান করে সংস্কৃত কলেজকে তিনি 'মানবতার নার্সারি'-রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভাবাবেগ নয়, সুস্থ যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা

চালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি বেদান্তের মত দেশীয় দর্শনকে পাঠ্য-তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের জীবনবাদী-দর্শন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্যে সংস্কৃত শিক্ষার সাথে ইংরেজি বিদ্যার সামঞ্জস্য বিধানের গুরুত্ব তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। এ কার্য সাধনে বাস্তব-পন্থা নির্দেশেও তিনি পিছ-পা হননি। শুধু তাই নয়, সামাজিক কূপমণ্ডূকদের তীব্র বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেও তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্ব-শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়ে শিক্ষাকে বৃহত্তর সমাজপরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার সৎসাহস দেখিয়েছিলেন।

শিক্ষাসংস্কার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি অবদান সরকারী সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে বহু প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন। তাছাড়া গোঁড়া-সমাজের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ছাড়াও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের মত উচ্চ-শিক্ষার প্রথম শ্রেণীর বাঙালী প্রতিষ্ঠানও তিনিই গড়েছিলেন। বাঙালীর শিক্ষার জন্যে তাঁর স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের তুলনা হয় না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষা সকল পর্যায়েই সেকালে ভাল পাঠ্যপুস্তকের দারুণ অসদ্ভাব ছিল। মদনমোহনের 'শিশুপাঠ' প্রাথমিক শিক্ষাব্রতীর সমস্যার একটু সুরাহা করেছিল বটে ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' মত শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী' ইত্যাদি বই লিখে নবীন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনেকটাই দূর করেছিলেন। অবশ্য বন্ধু অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ'ও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত হবে। বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষার্থীদের জন্যে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে, বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য-নাট্য গ্রন্থাদির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের দুর্গতি অনেকটাই ঘুচিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের

বাইরেও শিক্ষিত মানুষের রস-চেতনা উদ্বোধনের জন্যে তিনি সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উপকরণ নিয়ে অপূর্ব গদ্য-আখ্যায়িকা-সমূহ রচনা করেছিলেন, সে সব কথা প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এইভাবে দেশব্যাপী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তিনি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সবাইকে জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার প্রসঙ্গে গোঁড়াসমাজে কিছুটা প্রতিবাদ দেখা দিলেও তাঁদের ধর্মীয় সংস্কারে, দেশাচারে খুব বড় কোন একটা আঘাত রূপে দেখা দেয়নি এ শিক্ষা-সংস্কার কার্য। তাই বড় রকমের কোন বিরোধিতাও জাগেনি। কিন্তু এ কার্য যে একটা বৃহত্তর সমাজবিপ্লব সৃষ্টিরই মৌন আয়োজন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি শিক্ষা-সংস্কার ও প্রসারের কার্যধারা অব্যাহত রেখেও তিনি সামাজিক মানুষের বিশেষত হিন্দু নারীসমাজের দুর্গতি মোচনের জন্য দুঃসাহসিক সমাজ-সংস্কার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কোন ধর্মবোধের তাগিদ থেকে নয় নিছক মানবীয় কারুণ্যবোধ থেকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল এদেশের নারীসমাজের চূড়ান্ত দুর্গতির দিকে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, চিরাচরিত জীর্ণ-সংস্কারের প্রাচীর-আড়ালে নির্বাসিতা নারী-সমাজ শিক্ষাদীক্ষা সামাজিক ন্যায় বিচারের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে পশুর চেয়েও হীনদশা প্রাপ্ত হয়েছে। কৌলীন্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বহ ও অমানবিক। তাকে দুর্গতির মুখে ঠেলে দিয়ে সমাজেরও মঙ্গল হয়নি। বহুবিবাহ বাল্যবিবাহজনিত অকাল বৈধব্যের অভিশাপ সমাজে বয়ে এনেছিল ব্যভিচারের স্রোত। সমাজপতিরা শাস্ত্র ও দেশাচারের দোহাই পেড়ে চিরাচরিত নিয়মে নারীর সতীত্ব রক্ষার আবশ্যকতার কথা আউড়িয়ে অপরিসীম ঔদাসীন্য নিয়ে এর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে-

ছিলেন। সমাজদেহ বিনির্গত ক্লেদ জমে জমে যে পল্বলের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ডুবে যেতে বসেছিল, সমাজের যে নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল একথা. তাঁরা ভেবে দেখবার গরজ বোধ করেন নি। সামাজিক এ দুর্দিনে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসেছিলেন সমাজ-সংস্কারের কতকগুলো কল্যাণকর বাস্তব প্রস্তাব নিয়ে। কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ ক্লিষ্ট নারীসমাজের দুর্গতি নিরসনের তথা সামাজিক ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ করার সাহসিক প্রচেষ্টাস্বরূপ তিনি 'বিধবাবিবাহ' প্রচলনের যৌক্তিকতা নির্দেশ করলেন। এ দেশে শাস্ত্রের প্রতি মানুষের মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য লক্ষ্য করে, তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন। যদিও সমস্যার মানবিক দিকটিই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বেশি, তবু গোঁড়াসমাজের মানস-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই তিনি শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্ম-সমাজ ও কতিপয় সংস্কৃত পণ্ডিত এবং অনুরাগী সমর্থক ছাড়া কেউ তাঁকে সমর্থন করলেন না। গোঁড়াসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে; কিন্তু অনমনীয় মনোবলের অধিকারী বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ' প্রবর্তনকার্যকে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন; আরও জানালেন যে, তিনি নিতান্ত দেশাচারের দাস নন, প্রয়োজনবোধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি আছেন তিনি, তাঁর এই পবিত্র ব্রতকে সফল করে তুলতে। দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তিনি দেশব্যাপী; ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থনও পেলেন। কিন্তু দেশাচারের দুর্গে প্রতিষ্ঠিত থেকে যুগযুগান্তরে মানুষের ভয় ও ভক্তির মুদ্রা ভাঙিয়ে যাবতীয় সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এসেছেন যেই লুব্ধ শকুনীতুল্য কপট ধর্মধ্বজীরা, তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগরের প্রতি। যুক্তির পথে বিদ্যাসাগরকে পরাস্ত করতে অপারগ হয়ে তাঁরা অশ্লীল গালাগালি ও নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে শাণিত যুক্তির অস্ত্রে

বার বার তাঁদের ঘায়েল করেছেন। তাঁদের নিন্দাবাদের জবাবে শালীন ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছেন। সে এক মহাকাণ্ড। গোটা দেশই যেন দুই অংশে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। দেশের কবি-সাহিত্যিকরাও তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ সংগ্রামে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথীরা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন, কবিয়াল দাশরথির মত অনেকে আবার বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন। তবু প্রতিপক্ষ কখনই যুক্তি-তর্কে পেরে ওঠেনি। সম্মুখসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তারা চোরা গোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছিল নানাদিক থেকে। প্রকৃত পক্ষে, এতে তাদের দুর্বলতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল। আসলে, বিধবাবিবাহের প্রতিবাদীরা দেশাচার ও শাস্ত্রাচারের দোহাই পেড়ে প্রাণপণে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। দেশের বিবেক আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ তো বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'বিধবাবিবাহ' আইন পাশ করে তৎকালীন ভারত সরকার বিদ্যাসাগরের সংস্কার-আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে এ বিষয়ে তিনি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় সমাজসংস্কার-বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তথাপি তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলা সমীচীন হবে না। একথা ঠিক 'বিধবাবিবাহ' আইন পাশ করেও সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নি। কিন্তু এও ঠিক 'বিধবাবিবাহ' আন্দোলন নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও

মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি জানিয়ে এদেশে নারীমুক্তি-আন্দোলনকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছিল। তাছাড়া, অনেক কাল পরে তাঁর জীবন-সায়াহ্নে 'সহবাস-সম্মতি' আইন প্রণয়ন করে সরকার তাঁর বাল্যবিবাহ-রোধ-আন্দোলনকে যে মূল্য দিয়েছিলেন তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্করণ আন্দোলন মুখ্যত ছিল নারীমুক্তি-আন্দোলন। মানবের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী-সমাজকে ন্যায্য অধিকার দিয়ে, বিদ্যাসাগর প্রকৃত পক্ষে নতুন দেশ গঠনের পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন। নারীর উন্নতি ব্যতীত সমাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয় ও জাতীয় জাগরণও সুদূর পরাহত হতে বাধ্য এ সত্য বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন। তাই স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারের প্রাথমিক চেষ্টার পথ ধরেই তিনি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীসমাজের মধ্যে তিনি একদিকে আত্মচেতনা-সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন, অপরদিকে তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য সমাজসংস্কার-আন্দোলন সৃষ্টি করে যুগযুগান্তের প্রথাবদ্ধতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন মানুষ হিসেবে তাদের বাঁচবার পথ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা বাস্তব কারণেই তখন সম্পূর্ণ সফল হয়নি—কিন্তু শতাব্দীর প্রান্তে আজ নারীমুক্তির স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, তখন কেউ যদি বলে এ যেন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টারই বিলম্বিত সার্থকতা, তা হলে তাকে অস্বীকার করা খুব সহজ হয় না। বস্তুত বিদ্যাসাগরকে একালে বাঙলা দেশের নারী-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বললেই যথার্থ বলা হয়ঃ তাঁর আন্দোলন মুখ্যত এদেশের আধুনিক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছে, গৌণত হিন্দু-সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কে কিছুটা ভারসাম্য আনয়ন করে উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু-সমাজের বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে একথা বোধ হয় দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

যে হিউম্যানিস্ট কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার-মূলক নানা জনহিতকর কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, সে একই আদর্শের প্রেরণায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, ইতিপূর্বে একাধিক বার তা উল্লেখ করেছি। বস্তুত সামাজিক মানুষের যে কল্যাণচিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এদেশের হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হতে, বাংলার নিজস্ব আধুনিক সাহিত্যের জন্যে উপযুক্ত বনেদ রচনা করতে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্য-ভাষাকে সংহত ও সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন; তাকে সব রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ মাধ্যমরূপে গড়ে তুলেছিলেন। বাঙালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে নতুন সাহিত্য গড়ে তোলা যে একান্ত অপরিহার্য ছিল একথা তিনি যেমনটি বুঝেছিলেন, এমনটি সেকালে আর কেউ বোঝেন নি। তিনি শুধু তার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, কিভাবে তা গড়ে তোলা সম্ভব সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে কতকগুলি মৌল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার বাস্তবায়নের জন্যেও বিলক্ষণ সাধনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সাধনারই ফলশ্রুতি হল আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

আধুনিক সাহিত্যিক গদ্য ভাষার জাতকর্ম থেকে শুরু করে এতে যৌবনের শক্তি, লাবণ্য ও মাধুর্য সঞ্চারের যাবতীয় কাজই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। নিছক সংস্কারের zeal থাকলেই যে এরূপ দুরূহ কার্য সমাধা করা সম্ভব নয়, একথা অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বোধ হয় বুঝতে পারবেন। সংস্কারক রামমোহনের ব্যর্থতা এ সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে লেখনী চালনা করতে গিয়ে রামমোহন বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রূপটি খুঁজে বের করবার কম চেষ্টা করেন নি। তিনি বড়জোর কাজ চালানোর উপযোগী একটা ভঙ্গী দাঁড় করিয়েছিলেন; কিন্তু খুব বেশি দূর এগোতে পারেন নি। তাঁর পূর্বে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার স্বাভাবিক শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে বাংলা ভাষার মুক্তির যথার্থ পথটির সন্ধান পেয়েছিলেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ভাষাভঙ্গী নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিন্তু আদর্শ রূপটি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে না পেরে দ্বিধান্বিতভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে পদচারণা করেছেন, কখনও তা দুরূহ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে, কখনও বা তৎসম শব্দের সুপ্রয়োগে কিছুটা শ্রী, সৌন্দর্য-গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে, কখনও বা তা গল্পের ভাষার মত লঘু হয়ে উঠেছে। তবু উপযুক্ত যুগচেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠাণ্ডা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিশীলিত না হওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা সাফল্যের তোরণে এসেই থেমে গিয়েছিল। রামমোহন স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের পথে চলার গরজ বোধ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের পূর্বে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জিত হয়নি সাহিত্যিক গদ্য ভাষার বিকাশ ক্ষেত্রে। অতএব বিদ্যাসাগর প্রকৃত পক্ষে বাংলা গদ্যের আদি শিল্পীর কাজ করেছেন। সকল সমালোচকই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করেছেন, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যভাষা সৃষ্টির কৃতিত্ব ন্যায়-সঙ্গত ভাবে বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য।[৬]

একব্রতীর সাধনায় অর্জিত তাঁর এই কৃতিত্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক যুদ্ধকলাকৌশলনিপুণ সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন যে সেনাবাহিনীকে সুসংহত, সুবিন্যস্ত করে সুপরিচালিত করতে পারলেই যেমন যুদ্ধজয় সম্ভব, বিদ্যাসাগর ঠিক তেমনি একজন সেনাপতির ন্যায় বাংলা গদ্যের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে তাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করে, মানবীয় ভাব প্রকাশের সকল বাধা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭]

৬. Dr. S. K. De—Bengali Literature in the Nineteenth century, pp. 627-628 [2nd Edition]

৭. রবীন্দ্রনাথ—চারিত্র পূজা, বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে আজ আর কোন দ্বিমত নেই। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি ১৮৫১-৫২ সালের দিকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা কালে আমাদের শিক্ষার সঙ্কট মোচনের জন্যে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে একটি অবশ্য পূরণীয় সর্ত হিসেবে ধরে নিয়ে, তিনি সরকারের কাছে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের যে খসড়া রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা শুধু তাঁর শিক্ষাদর্শের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে না, বাংলার জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যথার্থ পন্থাটি নির্দেশে তাঁর নির্ভুল শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জ্বল করে তোলে। বলা বাহুল্য এই শিল্পদৃষ্টি ছিল বলেই তিনি ভাষা-সাহিত্যের সারস্বত সাধনায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমরা এখানে পূর্বোক্ত রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি ঃ

১. বাংলা দেশে শিক্ষাকার্য তদারকের দায়িত্ব যাদের উপর বর্তেছে তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিপূর্ণ আধুনিক জ্ঞানালোক-সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২ যারা ইউরোপীয় উৎস থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তাকে চমৎকার প্রকাশক্ষম বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ তাদের পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

৩. সংস্কৃতে ভাল জ্ঞান না থাক্‌লে কখনই চমৎকার প্রকাশক্ষম বাক্‌-রীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না। আর ঐ কারণেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

৪ অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে যে কেবল ইংরেজি বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিরা সুন্দর ইডিয়ম-সমৃদ্ধ বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশে নিতান্তই অক্ষম। তারা ইংরেজিয়ানার প্রভাবে এতই আবিষ্ট যে বর্তমান অবস্থায় তাদের পক্ষে, সংস্কৃত বিদ্যার গৌণ-চর্চাজনিত প্রলেপ সত্ত্বেও, সমস্ত ভাবনাকে ইডিয়মসমৃদ্ধ, সুন্দর বাংলায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

৫. তাই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়, তা হলে তারাই সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সার্থক অবদান জোগাতে সমর্থ হবে।[৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসধারার সংযোগ ঘটিয়ে নব্য বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাতে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবনের ক্ষমতাই শুধু স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি নবনির্মাণক্ষম তাঁর শিল্পীমনের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত ইংরেজি ও সংস্কৃতবিদ্যার যৌথ পরিশীলনের মাধ্যমেই তিনি বাংলা ভাষার মুক্তিপথের সন্ধান করেছিলেন, এবং কার্যত সেই পথে অগ্রসর হয়ে নব্য বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতেরও সূচনা করেছিলেন। এসব কথা মনে রাখলে, পাঠ্য পুস্তক-রচয়িতা, অনুবাদক ও সামাজিক সংস্কার-কর্মব্যপদেশে মসিযুদ্ধে লিপ্ত বিদ্যাসাগরের শিল্পীসত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকার কথা নয়। যখন দেখি ভাষাকে অবলীলা-ক্রমে বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিচালিত করেও তিনি শিশুমনের 'জল পড়া পাতা নড়া'র অপূর্ব হৃৎস্পন্দন আবিষ্কার করতে সমর্থ, যখন দেখি বিরোধীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত তাঁর লেখনীমুখে মানবিক আবেগ ও কারুণ্য নিঃসৃত হচ্ছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনুষ্যত্বহীনতায় ব্যথিত হয়ে ব্যঙ্গকৌতুকে ফেটে পড়ছেন—শুধু হৃদয়জ্বালা প্রশমন করতে, তখন বুঝি এ মন সাধারণ মন নয়, এ মন শিল্পীর মন। আবার যখন দেখি হিন্দির ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত উপকরণকে রসবুভুক্ষু মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে লাগাতে পারার আনন্দে তাঁর ভাষা প্রাথমিক জড়তাসত্ত্বেও নবমুক্তির আবেগে অধীর হয়ে উঠেছে, যখন দেখি 'শকুন্তলার' জীবননাট্যে সাংসারিক প্রেমের অনিত্যতার জ্বালার মধ্যেও

৮. বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, [প্রথম সংস্করণ], গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত Notes on the Sanskrit College দ্রষ্টব্য। পৃ ৪৩৪—৩৯

স্বর্গের হাতছানি লক্ষ্য করে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যান, ভাষার মধ্যে যখন আবেগাতিশয্যে দ্রবীভূত হৃদয়ের ওঠানামা অনুভব করা যায়, তখন তাকে কি আর নিছক অনুবাদকর্ম বলে মনে করা যায়? শিল্পী-হৃদয়-নিষিক্ত ভাষার গুণে তা মৌলিক সৃষ্টির অসামান্য মহিমা লাভ করেছে। 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাসে'ও এই ক্রীড়াশীল শিল্পীমনের স্পষ্ট সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখি, বিষয় প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখেই সীতার বনবাসের ভাষা যেন জলভারনম্র মেঘের মত গম্ভীর, বর্ষণোন্মত, তার বুকে স্ফুরিত হচ্ছে বিদ্যুতের জ্বালা ; আবার সেই ভাষাই বিষয়ের লঘুতাগুণে 'ভ্রান্তিবিলাসে' অনেকটাই কৌতুকরসে উচ্ছ্বসিত। 'ভ্রান্তি-বিলাসে'র ভাষায় বিষয়ানুসারে আরও কিছুটা লঘুতার প্রয়োজন হয়তো ছিল, কিন্তু তাই বলে বিদ্যাসাগরের শিল্পীমনের ক্রীড়াচঞ্চল রূপটি সেখানে অনুপস্থিত, এমন কথা অরসিক ছাড়া কেউ বলবেন না। মোটকথা স্রষ্টার ব্যক্তিচারিত্রের সঞ্চরণ ঘটিয়ে বিষয়ের নবনির্মাণই যদি শিল্প হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের এসব গ্রন্থই যে শিল্প-কর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের শিল্পসত্তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা গদ্য ভাষার নবনির্মাণে এবং 'ভাবের বাহনরূপে রস-সৃষ্টিতে তার সার্থক ব্যবহারে। ভাল গদ্যের যা কিছু গুণ অর্থব্যক্তি, প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, গাঢ়বদ্ধতা, কোমলতা, উদারতা, মাধুর্য, শ্লিষ্টতা, গতিশীলতা সৌষম্য ইত্যাদি অধিকাংশ গুণই বিদ্যাসাগরের রচনায় দৃষ্ট হয়। শুধু 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাসের' মত গ্রন্থে নয়, সামাজিক সমস্যা প্রতিপাদন-মূলক গদ্য রচনায়, বিশেষত 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক পুস্তকের ভাষায় তা সহজলভ্য। প্রায় সর্বত্রই তিনি রচনায় প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তার গতির মধ্যে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' রক্ষা করে এবং যথাসম্ভব 'সরল ও সুশ্লিষ্ট শব্দ নির্বাচন করে, ভাষাকে যতদূর সম্ভব গাঢ়বদ্ধ, গম্ভীর ও গতিশীল' করার

চেষ্টা পেয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়ই বলতে হয়, 'কোন পণ্ডিত বা বৈয়াকরণের পক্ষে এই রচনা কলা-নৈপুণ্য দেখানো সম্ভব নয়, যথার্থ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।'[৯] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অনুবাদকরূপে চিহ্নিত করে, 'মৌলিক রচনার স্রষ্টা নন' (যদিও তাঁর এ অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়) বলে বড় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে অসম্মত হয়েছিলেন অনেকটা বিভ্রান্তিবশে। কিন্তু ভাষার শিল্পকর্মও যে বিষয়ের শিল্পকর্মের মত একটা বিশিষ্ট জিনিস, সে কথা বঙ্কিমের চেয়ে আর বেশি কে জানতেন? ভাষার শিল্পগুণের কথা যাঁরাই বুঝেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, প্রত্যেক ভাষারই দুটি প্রকাশের দিক আছে—'একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে—আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রস-সৃষ্টিতে'। বিদ্যাসাগরের রচনায় এই দুটি দিকেরই শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আসলে তিনি বাংলা ভাষার 'প্রকৃতিগত অভিরুচিটিকে' বুঝতে পেরেছিলেন; তাই 'শিল্পী-জনোচিত বেদনাপথ' ধরেই তাঁর ভাষার শিল্পকর্ম অগ্রসর হয়েছিল। যথার্থ শিল্পীর ন্যায়ই বাংলা ভাষার নবমূর্তি নির্মাণের সময় এর নিজস্ব, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তিনি কোন বহিরাগত উপাদানকে মূল্য দেন নি। শব্দচয়নে শিল্পবোধের সুষ্ঠু সমর্থন ছিল বলেই দেখতে পাই 'তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলি বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি—তাঁর দান বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে। কিছুই ব্যর্থ হয় নি'।[১০] বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।

এত পরও কথা থেকে যায়। ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তিনি 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে

৯. বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, [প্রথম সংস্করণ] পৃ ৩২৮-২৯

১০. বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে প্রবেশ উৎসব। রবীন্দ্রনাথের বাণী। মেদিনীপুর, ১৩৪৬।

যে দুটি নারীপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন, তা কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতির ছায়ামাত্র নয়—একথা রসিক পাঠকগণ স্বীকার করবেন। শিল্পীচিত্তের আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন নারী-প্রতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে তাদের কোন ক্রমেই মূলের নিছক প্রতিরূপ বলে আখ্যায়িত করা চলে না। বস্তুত বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতা' তাঁর চোখের সামনের চিরদুঃখিনী, অবমানিতা বঙ্গনারীরই যেন ভাব-প্রতিমা। 'ভ্রান্তিবিলাসে' তিনি সেক্সপীয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচয়ের রসানুভূতি-জনিত আনন্দকেই তো ব্যক্ত করেছেন। এমনকি 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক পুস্তকেও দেখি, মানবতার একাংশের দুঃখ-বেদনা-দর্শনে উন্মথিত সংবেদনশীল শিল্পীচিত্তের আবেগ-অনুভূতি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। তারপর 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' নামক শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অপূর্ব গদ্যকাব্যে, স্বরচিত অসমাপ্ত জীবনীতে অকপট সত্যভাষণের ও আত্মদর্শনের দুর্লভ বোধির প্রকাশে ও বেনামীতে রচিত ব্যঙ্গরচনাতে পরিহাস-রসিকতার মধ্য দিয়ে হৃদয়দ্বার অবারিত করে দিয়েও তিনি রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি কখনই প্রায় এক ভাববৃত্তে অবস্থান করেন নি। জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষা যেমন ক্রমশ বেশি গতিশীল হয়ে উঠেছে; তাঁর বিষয় পরিক্রমার ক্ষেত্রও নিয়ত প্রসারিত হয়েছে। তবে এটা ঠিক, সামাজিক মানুষের বেদনার ক্ষতস্থল খুঁজে বের করে তার ব্যথা-বেদনা উপশমের বাস্তবপন্থা অন্বেষায়ই কেটে গিয়েছে যাঁর গোটা জীবন, তাঁর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ খুব বেশি ছিল না। তাঁর জীবনের ন্যায় তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের একটা বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসর্গিত হয়েছে। স্বভাবতই তাঁর শিল্পপ্রতিভা ব্যাপকতর স্ফূর্তির পথ ধরে মৌলিকসৃষ্টির নিরঙ্কুশ কল্পনার জগতে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু এও সত্য যে মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুচ্ছটা তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মের মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বড় কোন দাবি রেখে যান নি। তিনি 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রচেষ্টাকেই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে' ঘোষণা করে, আপন 'সমাজ-সংস্কারক' পরিচয়টিকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষা-সংস্কার ও অন্যবিধ সংস্কার-মূলক কাজের ব্যাপকতা তাঁর ঐ পরিচয়টিকে নিঃসন্দেহে সত্যতর করে তুলেছে নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে রচিত বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যঙ্গমূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে এই সংস্কারক মন। আবার ঐ সংস্কারক মনই জাতীয় মানসের যথাযথ বিকাশের প্রয়োজনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাংলা গদ্য ভাষার নবনির্মাণে ও নতুন বাংলা সাহিত্যের ভিত রচনায় ব্রতী হতে। কিন্তু গদ্যভাষা নির্মাণ ও ভাবের বাহনরূপে তার সাহায্যে রস-সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর সংস্কারক সত্তার অবচেতনে ক্রিয়াশীল শিল্পসত্তা জেগে উঠেছিল বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। সংস্কারের প্রয়োজনের গণ্ডী ছেড়ে স্বভাবের তাগিদেই তো বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও মুক্তি খুঁজে ফিরেছিল। আর তারই ফলশ্রুতিরূপে আমরা পেয়েছি হীরকোজ্জ্বল সাহিত্যিক গদ্য ভাষা ও তারই ছটায় প্রোজ্জ্বল ভাব ও রসের একটি ক্ষেত্র। সংস্কারক বিদ্যা-সাগরের কাছ থেকে এ আমাদের উপরি পাওনা। জরা-জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার শিকার এ দেশের ক্ষীণপ্রাণ মানুষগুলোকে তিনি সংস্কারতিক্ত বটিকা সেবন করিয়ে শুধু নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেই ক্ষান্ত হননি; ভাবলোক থেকে আহরিত অমৃতরস সিঞ্চন করে, তাদের বন্ধ্যা হৃদয়ভূমিতে ভাবের কুসুম ফুটিয়ে তিনি তাদের পক্ষে জীবনের বঞ্চনা বেদনার জ্বালাকে অনেকটাই সহনীয় করে তুলেছিলেন। হিউম্যানিস্ট জীবনাদর্শের পূজারীর কাছে এর থেকে কাঙ্ক্ষণীয় কর্ম আর কি হতে পারে।

ভ্রা ন্তি বি লা স

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

শেকসপীয়রের দি কমেডি অব এরার্স (The Comedy of Errors) একটি অপরিণত রচনা। পরবর্তীকালে তিনি কমেডির আংগিকে যে স্বকীয় রূপ আরোপ করেছিলেন, তার আভাসমাত্র এই নাটকে অনুপস্থিত। কাহিনীর জন্য কবি অনেকাংশে লাতিন নাট্যকার প্লটাস-এর কাছে ঋণী। প্লটাসের নাটকের এক জোড়া যমজ ভাইকে শেকসপীয়র যথেষ্ট মনে করেন নি। আরও এক জোড়া যমজ ভাই, গোলাম বা নফর হিসেবে জুড়ে দিয়ে, এবং দুজোড়া ভাইকেই আকারে প্রকারে সর্বাংশে সমতুল্য করে ভুলের পথ আরও সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন।

ফলে যা হবার তাই হয়েছে। জাহাজ ডুবির ফলে প্রায় জন্মাবধি বিচ্ছিন্ন দুজোড়া ভাই যখন আবার পঁচিশ বৎসর পর ঘটনাচক্রে একই শহরে একত্র হল—যে শহরে এদের মধ্যে দুজন আগে থেকেই বসবাস করে আসছে, আর অন্য দুজন একেবারেই আগন্তুক—তখন এই পরস্পর অপরিচয়ের এবং এদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নাগরিক সাধারণের অজ্ঞতার পথ ধরে, ভুলের পর ভুল, একটির পর একটি এত দ্রুত এবং অনবরত ঘটতে থাকল যে শেষ পর্যন্ত এই ভ্রান্তিবিলাসের উপর নাট্যকার বলতে গেলে জোর করেই পর্দা নামিয়ে দিয়ে নাটকটির শেষ ও সমস্ত রহস্যের সমাধান করলেন।

ঘটনাগুলিও এমন যে নাটকীয় কুশীলবের জন্য সেগুলি যতো বেশি বিভ্রান্তিকর, দর্শকের (বা পাঠকের) জন্য ততো বেশি উপভোগ্য, ততো বেশি কৌতুকসঞ্চারী। যিনি স্বভাবতই গম্ভীর তিনিও নাটকীয় ঘটনার

ধাক্কায় তাঁর গাম্ভীর্য ভুলবেন, মুখের যে পেশীগুলি কদাচিৎ শিথিল হয় তারাও আচমকা সচল হয়ে উঠবে, নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে। একজনকে অন্যজনের পাওনাদার চেপে ধরেছে, বা অন্যজনের বায়নার অলংকার গছিয়ে দিচ্ছে, বা অন্যজনের ভৃত্য এসে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্তঃপুরে, সেই ব্যক্তির স্ত্রীর মান-অভিমান শুনতে হচ্ছে তার কম্পিত ও অপরাধী স্বামী হিসাবে, একজনের কৃতকর্মের জন্য দিতে হচ্ছে আরেকজনকে কৈফিয়ৎ—এই জাতীয় ঘটনা যদি একটির পর একটি দ্রুত তালে ঘটে যেতে থাকে, তাহলে নাটক হিসেবে রচনাটির মূল্য যাই হোক আমোদের উৎস হিসেবে তার জনপ্রিয়তা অবধারিত।

বিদ্যাসাগর যে বিশেষ করে এই নাটকটিকেই বেছে নিয়েছিলেন বাংলা ভাষায় কাহিনী আকারে রূপান্তরিত করবার জন্য, সেও নাটকটির এই বিশেষ গুণের জন্যই। "কিছুদিন পূর্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়র প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।" এর চেয়ে সত্য, এর চেয়ে অকপট স্বীকারোক্তি আর হয় না। ইংরেজি নাটক পড়ে যেহেতু তিনি বিস্তর আমোদ লাভ করেছিলেন, তাই হাস্যবিমুখ বাঙালীকে তিনি হাসাতে চেয়েছেন গল্পটি বাংলায় তর্জমা করে। তিনি জানেন শেক্সপীয়র অতি মহৎ কবি, তিনি আরও জানেন এই কবির শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'কমেডি অব এরার্স' অন্যতম নয়, কিন্তু তিনি সাহিত্য-বিচারের সাত-পাঁচে না যেয়ে তাঁর আনন্দকেই চেয়েছেন পাঠক সাধারণে সঞ্চারিত করে দিতে। এটি তাঁর নিছক আনন্দের সৃষ্টি। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বা 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাস' রচনার পশ্চাতে যে প্রেরণা তার উৎস হয় নীতিবোধ বা সাহিত্যবোধ বা শেষ দুটি রচনার ক্ষেত্রে আরও একটি বিবেচনা স্বভাবতই মনে আসে। 'শকুন্তলায়' ও 'সীতার বনবাসে' পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, শিক্ষাবিৎ ও সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে যে পরিচয় উহ্য, সেই সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা

পাই, যিনি বাংলা গদ্যের কৈশোরে, সেই গদ্যের একজন প্রথম ও প্রধান শিল্পী হিসেবে, ভারতীয় সাহিত্যের দুটি উজ্জ্বল কীর্তির প্রতি তাঁর সাহিত্যিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। ভ্রান্তিবিলাসে এ জাতীয় সাহিত্য-বিবেচনা অনুপস্থিত না থাকলেও অপ্রধান নিশ্চয়ই। যদি মূল লক্ষ্য হ'তো শেক্সপীয়রকে বাঙালী পাঠকসমাজে পরিচিত করান বা, আরও সংকীর্ণভাবে, শেক্সপীয়রের কোন মহৎ সৃষ্টিকে বাংলায় রূপান্তরিত করান, তাহলে অভীষ্ট নাটকটি আর যাই হোক, কমেডি অব এরার্স হ'তো না। উপাখ্যানটির শুরুতে 'বিজ্ঞাপনে'ও তাই অনুবাদক শেক্সপীয়র-প্রসংগ অতি হালকা ভাবে ছুঁয়ে গেছেন, আর সাহিত্য-প্রসংগ একেবারেই এড়িয়ে গেছেন।

অনুবাদ শব্দাট ভ্রান্তিবিলাস সম্বন্ধে ব্যবহৃত আগেও হয়েছে, যদিও প্রচলিত অর্থে এটি অনুবাদ নয়; কাহিনীটি ইংরেজি নাটকের স্বাধীন বাংলা রূপান্তর। ভ্রান্তিবিলাসের কাহিনী মূলাশ্রয়ী, এর মধ্যে সংযোজন বলতে গেলে কিছুই নেই, যদিও বর্জনের ভাগ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একেবারে তুচ্ছ নয়। মূলে যে-কাহিনী নাটকের অংকে ও দৃশ্যে বিন্যস্ত, অনুবাদে তাই ধারাবাহিক কাহিনী হিসেবে বিবৃত। এজন্য মাঝে মাঝে কাহিনীর একটি ধারা ফেলে অন্য কোন ধারা ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যানের প্রয়োজন হয়েছে যে কাজটি নাট্যকার দৃশ্য-সংকেতের মধ্য দিয়েই করেন। এই দৃশ্য গ্রন্থনার কাজটি বিদ্যাসাগর করেছেন অল্প কথায় পরিচ্ছন্নভাবে। কেবল একটি ক্ষেত্রে তিনি মূল নাটকের বিবরণ যেন যথেষ্ট মনে করতে পারেননি, জাহাজডুবির ফলে চিরঞ্জীব নামীয় যমজ শিশুদের একটি ও কিঙ্কর নামীয় ক্রীত যমজ শিশুদের একটি শেষ পর্যন্ত জয়স্থল নগরে স্থিতি পেল। খবরটি চিরঞ্জীব যুগলের পিতা বৃদ্ধবণিক সোমদত্ত জানে না, বা দ্বিতীয় (হেমকুটবাসী) চিরঞ্জীব জানে না, অথচ দর্শক ও পাঠক জানে। নাটকটির ঘটনাকালে জয়স্থলের

চিরঞ্জীবের মনে তার নিজের অতীত সম্বন্ধে, বিশেষত জাহাজডুবি থেকে তার প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে, একটা ক্ষীণ স্মৃতির অতিরিক্ত কিছুই নেই। এবং ঘটমান বর্তমানে সে জয়স্থলের একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত নাগরিক, অধিরাজের একজন প্রিয়পাত্র ও ব্যক্তিগত জীবনে একজন গৃহী ও কিছুটা তাড়িত, শাসিত, শংকিত স্বামী এই তার পরিচয়। কিন্তু অতীত থেকে বর্তমানের এই উত্তরণ যেভাবে শেক্সপীয়র সাজিয়েছেন, তার মধ্যে বোধহয় কিছু প্রশ্নের অবকাশ ছিল। বিদ্যাসাগর তা রাখতে চাননি। তাই জয়স্থলের চিরঞ্জীব কি ভাবে কুবলয়পুরের রাজা বিজয়-বর্মার হাত হয়ে জয়স্থলের অধিরাজ (ডিউক) বিজয়বল্লভের প্রাসাদে আশ্রয় পেল ও তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হয়ে উঠল শুধু সেই বৃত্তান্তই নয়, মূলে যে সম্বন্ধে কিছুই নাই—চন্দ্রপ্রভাকে যে ঘটনা-পরম্পরায় চিরঞ্জীব স্ত্রী হিসেবে লাভ করল সেই বৃত্তান্তটাও আপন কল্পনা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র জুড়ে দিয়েছেন। অবশ্য এই যোজনার ফলে মূল কাহিনী কোন অংকেই বিকৃত বা বিপর্যস্ত হয়নি, মূল নাটকের সংকেতের সূত্র ধরেই তিনি চন্দ্রপ্রভা বিলাসিনীর একটি বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি রচনা করেছেন, এই মাত্র।

শেক্সপীয়র রচিত "প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত" হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে যে রূপ নিয়েছে, তার মধ্যে আমরা এক পূর্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করি। সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র এই অনুবাদ কর্মে তাঁর পণ্ডিতী সত্তাকে একেবারেই ভুলতে পেরেছিলেন। কারণ যথাযথ অনুবাদ করতে চাইলে তিনি অবশ্যই পারতেন, কিন্তু ভ্রান্তিবিলাস যেমন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার বৈদেশিক উৎস সম্বন্ধে পাঠককে ভুলিয়ে রেখে তাকে অনিবার্য বেগে কাহিনীর খরস্রোতে টেনে নিয়ে যায়, যথাযথ অনুবাদ হ'লে তা হ'তো না। বিদেশী গল্পের স্বদেশীকরণের ফলেই মূলত এটি সম্ভব হয়েছে। এবং এই স্বদেশীকরণের স্বপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের দেওয়া সরল যুক্তিটিই শেষ কথা নয়। "বাঙ্গালা পুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম

সুশ্রাব্য হয় না," তিনি মুখবন্ধে বলেছেন ঠিকই। যা বলেননি, সে হল ভাষান্তরকরণে অনেক বৈদেশিক ভাব ও পরিস্থিতি তিনি আলগোছে বাতিল করে দিয়েছেন।

বর্জনের পিছনে দুটি নীতি মনে হয় কাজ করেছিল। মূল নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে আমরা পাই দুটি চরিত্রের মধ্যে কৌতুকরসে ঠাসা দীর্ঘ চতুর সংলাপ। ইংরেজি ও লাতিন প্রাচীন কমেডির আদর্শে এই দৃশ্যগুলি গঠিত। ঈশ্বরচন্দ্র যদি প্রসংগের বিবেচনায় এই অংশগুলিকে অবান্তর বা বর্জনীয় ভেবে থাকেন, ভুল করেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্বিতীয় অংক দ্বিতীয় দৃশ্যে সাইরাকিউজের অ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিওর মধ্যে সংলাপটি ঈশ্বরচন্দ্র ছাঁটাই করেছেন। সদ্য প্রভুর হাতে উত্তম-মধ্যম খাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ভৃত্য তার কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছে, মশকরা করছে এবং এই কথা চালাচালির খেলায় প্রভুও সমান উৎসাহে যোগ দিয়েছে। শেকসপীয়র-সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকের কাছে এই অংশগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর লক্ষ্য সম্বন্ধে এতই পরিষ্কার ছিলেন যে এই অংশগুলি বর্জন করে তিনি গল্পের গতি অব্যাহত রেখেছেন। তৃতীয় অংক প্রথম দৃশ্যের শুরুতে ইফেসাসের অ্যান্টিফোলাস দুপুর বেলায় পাওনাদারকে সংগে করে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন সদর দরোজা ভিতর থেকে বন্ধ। অন্দরমহলে তাঁর স্ত্রী অনেক খোঁজা-খুঁজির পর তাঁর স্বামীর যমজ সহোদরকে ধরে এনে তাঁকে পতিজ্ঞানে যে সম্ভাষণ শুরু করেছেন, তাতে সে বেচারীর ত্রাহি অবস্থা। বাইরে থেকে যখন যুগপৎ আবেদন ও হুমকি চলছে দরোজা খোলার জন্য, ভিতর থেকে তখন ভৃত্যকুল প্রত্যুত্তরে পাঠাচ্ছে ঠাট্টা, টিটকারি ও অপমানজনক উক্তি। পরিস্থিতি যখন এহেন জটিল, তখন গৃহস্বামী ও তার পাওনাদার মেহমানদারি সম্বন্ধে একটি সরল-সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই অংশটি বাদ দিলেও এর পরবর্তী অংশটুকু—যেখানে বন্ধ দরোজার দুইদিক

থেকে সমানে বাক্যবর্ষণ চলেছে সেই অংশটুকু—উৎসাহের সংগে ব্যবহার করেছেন। শুধু ব্যবহার নয়, অনুবাদে তিনি তাঁর প্রবল বাঙালিত্ব আরোপ করতেও সংকোচ বোধ করেন নি।

> *Antipholus of Ephesus.* Are you there, wife? You might have come before.
>
> *Adriana.* Your wife, sir knave! go get you from the door.

চরণদুটি ভ্রান্তিবিলাসে দাঁড়িয়েছে ঃ

> "চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি গিন্নি! আজকার একি কাণ্ড? এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজায় গোল করিস্ না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা দেখনা, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে।"

শেকসপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও বোধ হয় অনুবাদে এই স্বাধীনতাটুকু নেওয়ার জন্য আমরা বিদ্যাসাগরকে সাধুবাদই দিতে চাইবো।

মূল থেকে সরে যাওয়া যেখানে একটুখানি রঙ চড়ানো বা রসের মেশান দেওয়ার জন্য সেখানে পাঠকের সমর্থন পেতে অসুবিধা নেই। তাছাড়া দুএক জায়গায় ছোটখাট বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃত হলেও হতে পারে, না হলেও তেমন ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে না। যেমন মূল নাটকে ইফেসাসের ডিউক সাইরাকিউজের বৃদ্ধ বণিককে বলছেন, অনধিকার প্রবেশের জন্য নির্ধারিত জরিমানা এক হাজার মার্ক—অথচ বণিকের সমস্ত সম্বল বিক্রী করলেও একশ' মার্ক হবে না। ভ্রান্তিবিলাসে সেই অংক দুটি পাঁচ হাজার মুদ্রা ও দুই শ' মুদ্রায় দেখান হয়েছে। দুটি সংখ্যার মধ্যে মূলের অনুপাত রক্ষা হয়নি। আবার, মূল কাহিনীর বৃদ্ধ বণিক, জাহাজডুবির সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে প্রাণরক্ষার জন্য একটি অতিরিক্ত মাস্তুলের

এক প্রান্তে নিজেকে এবং দুজোড়া যমজ শিশুর একটি একটি করে দুটিকে বেঁধে ফেলে। তার স্ত্রী বাকি দুজনকে নিয়ে মাস্তুলের অপর প্রান্তে নিজেদের শক্ত করে বাঁধে। এবং এইভাবে ছয়জন একসংগে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। পরে এক পাথর খণ্ডে ধাক্কা লেগে মাস্তুলটি মাঝখানে ভেঙে যায় এবং দুই খণ্ড পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভ্রান্তিবিলাসে কেন একটি মাস্তুলের জায়গায় দুটি হল, কেন দুটি মাস্তুলকে একসাথে বাঁধার ব্যবস্থা হল এবং পরে মাস্তুল দুটিকে ভাসমান শৈলের জায়গায় "আকস্মিক বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্তী" হয়ে পড়তে হল, বলা মুশকিল।

দ্বিতীয় যে-নীতির বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে মূলের ভাবটুকু নিয়ে সংক্ষেপে কাজ সেরেছেন সে হল নাটকীয়-তীব্রতাকে শমিত করে বর্ণনার গতির মধ্যে সমতা রক্ষা করা। অবশ্য এটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল, না ভাবানুবাদের মসৃণ পথ ধরায় তার পরিণতিস্বরূপ এটি ঘটেছে, জোর করে বলা যায় না।

ইফেসাসের অ্যান্টিফোলাসের প্রতি অ্যাড্রিয়ানা (২য় অংক ২য় দৃশ্য):

Come, I will fasten on this sleeve of thine :
Thou art an elm, my husband, I a vine ;
Whose weakness, married to thy stronger state
Makes me with thy strength to communicate :
If aught possess thee from me, it is dross,
Usurping ivy, brier, or idle moss :
Who, all for want of pruning with intrusion
Infect thy sap, and live on thy confusion.

ভ্রান্তিবিলাসে হেমকূটের চিরঞ্জীবকে জয়স্থলের চিরঞ্জীবের স্ত্রী যা বলছে তাতে মূলের আসল তুলনাটিই বাদ পড়েছে। সে যে স্ত্রীর অধিকারে স্বামীকে পেতে চায়, অন্য নারীর সেখানে অধিকার নেই, এই সহজ যুক্তির

সমস্ত প্রবলতা ও প্রগল্‌ভতা বাংলায় একটি মামুলি গীতিকবিতার অবলা হৃদয়ের বিহ্বলতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে :

> তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর, আমি সৌদামিনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়ছি না।

লক্ষ্য করা যায় যে শেকসপীয়রের নায়িকা যদিও উপমার ভাষায় কথা বলে তবু তার উপমার চিত্রগুলি একটি যুক্তিপূর্ণ চিন্তার সাথে অংগাঙ্গী জড়িত : weakness, stronger state, পুরো চতুর্থ চরণটি intrusion, infect, confusion—শব্দগুলি সমবেতভাবে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দাঁড় করায়। অন্যদিকে দিবাকর-কমলিনী, শশধর-কুমুদিনী এবং জলধর-সৌদামিনী একটি আদর্শ, সুদূর, কাব্যগন্ধী প্রেম-সম্পর্কের সোনালি কুয়াশা রচনা করে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, অ্যাড্রিয়ানা যদিও পদ্যের বাঁধা নিয়মের মধ্যে কথা বলছে, এবং চন্দ্রপ্রভা গদ্যে, তবু মূলের সম্পূর্ণ উক্তিটির মধ্যে যে একটা প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা আছে, তা বাংলায় এসে এক তরল মিষ্টতায় অবলুপ্ত।

সমগ্র ইংরেজি নাটকটির তুলনায় বাংলা ভ্রান্তিবিলাস সম্বন্ধেও এই কথাটাই অল্পবিস্তর খাটে। দি কমেডি অব এরার্স অমার্জিত, অপরিণত রচনা, সন্দেহ নেই, কিন্তু নাটকীয় ঘাত-সংঘাত একে শেষ পর্যন্ত উদ্বেল রেখেছে, ও প্রতি মুহূর্তে আমরা শক্ত কঠিন কর্কশ উক্তি, প্রত্যুক্তি ও ঘটনার সাথে ধাক্কা খাই, হোঁচট খাই। এবং এই জগতের কেন্দ্রে বিরাজ করছে অ্যাড্রিয়ানা। এই নির্বিশেষের জগতে সেই একমাত্র বিশিষ্ট চরিত্র। অন্যেরা সবাই নামধারী ব্যক্তি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন। এই নাটকে চরিত্র সৃষ্টি নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না। পুরো নাটকটাই ঘটনা নির্ভর, পরিস্থিতির নাটকীয়তায় প্রাণময়। অ্যাড্রিয়ানা থেকে চন্দ্রপ্রভা সৃষ্টির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিছুটা যেন

অজ্ঞাতসারেই, কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও পরিবর্তনটা অগ্রাহ্য করার নয়। অ্যাড্রিয়ানার পরই শেকসপীয়র 'দি টেইমিং অব দি শ্রু'র ক্যাথারিনাকে সৃষ্টি করেন। আন্দাজ করা শক্ত নয় যে এই সময় কবির চিন্তায়, 'টাইপ' হিসেবে, মুখরা প্রখরা নারী, বেশ ভালভাবে দানা বেঁধেছিল। অ্যাড্রিয়ানাও একজন 'শ্রু'—মুখরা নারী, যদিও বর্তমান নাটকে তার সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত। জগৎ-সংসার এ ব্যাপারে স্বামীদের সাক্ষ্যকেই মূল্য দিয়ে এসেছে। এ-নাটকে শুধু চাকরের সাক্ষ্যই অ্যাড্রিয়ানার মেজাজটি আঁচ করবার জন্য যথেষ্ট ছিল :

> The capon burns, the pig falls from the spit ;
> The clock hath strucken twelve upon the bell ;
> My mistress made it one upon my cheek :
>
> *Act I, Sc. 2.*

নাটকের শুরুতেই আমরা জানি এই ভদ্রমহিলার যা স্বভাব, তাতে রান্না যতো ঠাণ্ডা হয়, তাঁর মেজাজ ততোই গরম হতে থাকে। খানিক পরেই আমরা চূড়ান্ত সাক্ষ্য পাই, যখন বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে (৩য় অংক, ১ম দৃশ্য) স্বামী অ্যান্টিফোলাস আর উদ্বেগ চাপতে পারছে না :

> Good Signior Angelo, you must excuse us all ;
> My wife is shrewish when I keep not hours :

খাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে, অ্যাড্রিয়ানা অস্থির, বোন লুসিয়ানার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে, বেচারি অতি সংকোচে ও সংক্ষেপে সেটি প্রকাশ করতেই যে অগ্নিস্রাব শুরু হল, একজন জেদী, অভিমানী ও দখলকারী মেজাজের মেয়ে হিসেবে তখনই সে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে তার ধারণা এমনই টনটনে যে স্বামীর ঘরে ফেরায় বিলম্বের চেয়ে বড়ো দুর্ব্যবহার সে ভাবতেই পারে না। এই বিলম্বের একমাত্র সম্ভাব্য কারণও সে নিশ্চিত জানে—স্বামী

আর তার প্রতি অনুরক্ত নয়, নিশ্চয়ই অন্য কোন রমণী তাকে ফাঁদে ফেলেছে। এই অন্য রমণীটি কে সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, এবং তার প্রয়োজনও নেই, অন্ধ ঈর্ষায় সে জ্বলছে। তবে তার মনের সমস্ত আগুনই খড়ের আগুন, কারণ পরের দৃশ্যে (২, ২) স্বামীর জায়গায়, স্বামীর সহোদরকে জবর দখল করে ঘরে এনে তাকে যা বলছে তার মধ্যে আক্রমণের ঝাঁজ অনেকটা নিস্তেজ, অভিমানটাই উচ্চকিত।

ঈশ্বরচন্দ্র যেন এই অভিমানকেই সম্বল করে, অ্যাড্রিয়ানার চরিত্রের মধ্যে কাঠিন্য ও কৌণিকতাগুলি সযত্নে বাদ দিয়ে, প্রায় মিষ্টি মোলায়েম একটি বাঙালী কুলবধূ স্বষ্টি করেছেন তাঁর চন্দ্রপ্রভায়। শুধু অ্যাড্রিয়ানার চরিত্রে নয়, পুরো নাটকেই, যা কিছু রূঢ়, অমার্জিত, উত্তেজিত তাই ভ্রান্তিবিলাসে দেখা দিয়েছে কিছুটা মার্জিত, মসৃণ হয়ে। নাটকীয় ঘাত-সংঘাতের তীব্রতা কিছুটা মন্দীভূত হয়ে উপাখ্যানের বেগবান কিন্তু নাতিক্ষুব্ধ প্রবাহ রচনা করেছে।

মূল নাটকের সাথে এই বাংলা কাহিনীটির তুলনা কতোটা সংগত? বিদ্যাসাগর যদি নাট্যকার হতেন, ও অনুবাদটিকে নাট্যরূপ দিতেন তাহলে তুলনা-বিচার যতোখানি প্রাসংগিক হতো ততোখানি নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভ্রান্তিবিলাস অনেকাংশেই মূল ইংরেজির ঘনিষ্ঠ অনুবাদ এবং গল্পাংশে পুরোপুরি মূলানুসারী। সুতরাং অনুবাদের সমস্যাগুলি ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় কিভাবে সমাধান করেছেন, সেটা সাহিত্য-পাঠকের মনে নিশ্চয়ই কৌতূহল জাগাবে। যেমন ঃ

Dromio of Syracuse.

Some devils ask but the parings of one's nail,
A rush, a hair, a drop of blood, a pin,
A nut, a cherry-stone ; but she, more covetous,
Would have a chain.

পশ্চিম দেশীয় ডাইনিকে ঈশ্বরচন্দ্র অবলীলাক্রমে স্বদেশী ডাইনি বানিয়ে ছেড়েছেন ঃ

> এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাটা, কুলো, শিল, নোড়া বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ বিদ্যাঙ্গনা ডাইনিটির অধিক লোভ দেখিতেছি ; ইনি হয় হার, নয় আঙটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না।

অনুবাদ কর্মে ঈশ্বরচন্দ্র যে নমনীয় নীতি অনুসরণ করেছেন তার ফলেই তিনি কোথায়ও মূলানুগামিতা আবার কোথায়ও স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ, এই উভয় রীতির যথাযথ প্রয়োগ করতে পেরেছেন। ফলে মূলত অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রান্তিবিলাস পরাশ্রয়িতার আভাসমুক্ত, ও স্বতঃস্ফূর্ত।

এবং সে জন্যই ভ্রান্তিবিলাসের প্রকৃত স্থান বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য রচনার ধারায়। এখানে যে সাবলীলতা, ঋজুতা ও স্থান বিশেষে দেশজ কথ্যরীতির ব্যবহার দেখা যায়, তা তাঁর পূর্বতন রচনায় অতোটা স্পষ্ট নয়। সেদিক দিয়ে বাংলা গদ্যের অগ্রগতির ধারায় ভ্রান্তিবিলাস একটি পদক্ষেপ। শুধু সমাসবদ্ধ, বা অলংকৃত, বা প্রাঞ্জল বা পোশাকি বাংলা নয়, প্রয়োজন মতো যা সহজেই ঘরোয়া, আটপৌরে রূপ নিতে পারে, দেশজ শব্দ বা কথ্যরীতিকে আয়ত্ত করে নেয়, অথচ মৌল ভব্যতা ও পরিচ্ছন্নতা পুরোপুরি রক্ষা করে চলে, ভ্রান্তিবিলাসে সেই শালীন অথচ লৌকিক গদ্যের উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করি।

> এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই ; সকল অপরাধ আমার। ভৃত্যের সহিত প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া আমি যে তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্যভাবে কথা কই, এবং সময়ে অসময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভালবাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই। যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কিভাবে থাকি তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরম্ভ কর, নতুবা প্রহার দ্বারা তোমার পরিহাস রোগের শান্তি করিব।

> ...রাজপথে নির্গত হইলে সকল লোকেই আমার নাম গ্রহণ পূর্বক সম্বোধন ও সংবর্ধনা করে; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে...কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয়; কেহ কেহ আহারে নিমন্ত্রণ করে; কেহ কেহ পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব? পান্থনিবাসে আসিবার সময় এক দরজী পীড়াপীড়ি করিয়া দোকানে লইয়া গেল; এবং আপনকার চাপকানের জন্য এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল; আবার স্বর্ণকার আমার হস্তে বহু মূল্যের হার দিয়া মূল্য না লইয়াই চলিয়া গেল। কেহই আমাকে বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জয়স্থলের একজন গণনীয় ব্যক্তি।

যিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির লেখক তিনিই এই সহজ শালীন সাবলীল গদ্যের স্রষ্টা। ভ্রান্তিবিলাসই সম্ভবত প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ যেখানে এই নতুন গদ্যের সার্থক রূপায়ণ দেখা যায়। আর এখানেই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য।

পরাজিত নায়ক বিদ্যাসাগর

সনৎকুমার সাহা

বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় উক্তি :[১] "বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।" এই 'বহমান কালগঙ্গার' ব্যাখ্যায় আরো বিশদভাবে তিনি বলেন, "যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক!" রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, অতএব তাঁর মন্তব্য নির্ভুল—এমন কথা কোন সংশয়ী মন বিনা বিচারে মেনে নিতে রাজি নয়। যে পদগুলো (terms) তিনি ব্যবহার করেছেন, তাদের সামগ্রিক তাৎপর্য কি তিনি নিজেও সচেতনভাবে পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন? না কি অনেক কাব্যিক অতিশয়োক্তির মত এ মন্তব্যও কবির আরোপিত মূল্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে কোন এক ভাবের খেয়াতেই ভাসমান?

মানুষ পৃথক পৃথকভাবে কোন বিশেষ স্থানের সীমায় কালের খণ্ডাংশে বাঁচে। এই বাঁচা কি সব সময়েই প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করে? ক্ষণকালের বিচ্ছিন্নতায় যে বাঁচে, তার দৃষ্টি কতটা প্রসারিত? তার দিগন্ত কতদূর বিস্তৃত? জন্মসূত্রে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীর (inseparable accidents) মতো সে যা পায় এবং আচরিত জীবনের অভিজ্ঞতায় সে যা আহরণ করে, তাদের সব কিছু মিলিয়েও কি কালের প্রবহমানতার সমগ্র বিস্তারের সন্ধান মেলে? মূল স্রোতের পথরেখাই বা ঠিক ঠিক ধরা পড়ে কি? স্থাননির্ভর কোন বস্তুর সমস্তকে

নিয়ে কালের বুকে যে ক্রমাগত পথ চলা, তাই হলো তার ইতিহাস। ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই গোপনচারী। ঘটনাপ্রবাহের আপাতদৃশ্যমানতা অনেক সময়ে ছদ্মবেশী প্রতারক। অতীতের অথবা অহৈতুকীর মুখোশ এঁটে সে মানুষকে ঠকায়, তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কাল-গঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না। কখনো কখনো সমকালেই তার সলিলসমাধি ঘটে, কখনো বা অল্প সাঁতারেই তার দম ফুরিয়ে যায়। কালগঙ্গা পেছনের ঘাটে তাকে বেঁধে রেখে এগিয়ে চলে। কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে চাওয়া মানুষের জীবনে এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তার স্মৃতি, তার ভাবনা, তার ধারণা, সবই অতীতের ঘাটে নোঙর বাঁধা। সাম্প্রতিকতার রঙ্গমঞ্চ অতীতের পুনরাভিক্ষেপে হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর। ওদিকে ইতিহাসের ধারা নেপথ্যে নিঃশব্দে বয়ে চলে, যদি কখনো ধস নামে, আর কালগঙ্গার প্রবহমানতায় সাম্প্রতিকতা যদি ক্ষণিকের জন্যেও মিশে যায়, তবে অতীতের মাটি আঁকড়ে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ গভীর হতাশায় উপলব্ধি করে, তাদের বিপন্ন, বিব্রত অস্তিত্ব তামাদি হয়ে গেছে কত আগেই! কালের চাতুরি ধরতে হলে, বহমান কালগঙ্গায় আপন জীবনধারার মিলন ঘটাতে হলে, অতিক্রম করতে হবে নিজেকে (অর্থাৎ ব্যক্তির আপন অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত জীবনের খণ্ডাংশকে), পেতে হবে সমগ্রকে।

বিদ্যাসাগর কি তা পেরেছিলেন ?

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির নিয়মে যে কাল প্রত্যক্ষ, তার বুকে বিদ্যাসাগরের অবস্থান ১৮২০ থেকে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর জন্ম, কর্ম ও বিরামভূমি বাঙলাদেশ, তথাকথিত নব্যসভ্যতার তিনি অন্যতম স্থপতি। বর্তমানে এদেশের সমাজব্যবস্থা, শিক্ষানীতি ও সাহিত্য—এর সব ক'টিতেই বিদ্যাসাগরের নির্ভুল অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু 'আধুনিক' হবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট ?

অস্বীকার করবার উপায় নেই, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের এক সক্রিয় অংশ প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে অস্থির। এদেশে ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এই ঘূর্ণিঝড়ে বেগ এনে তার দিকনির্ণয়ে সহায়তা করে। ঝড়ের দাপটে একদিকে যেমন পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে, তেমনি অন্যদিকে নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে। দু'টোই ঘটেছে ঔপনিবেশিক শক্তির উপস্থিতিতে এবং প্রধানত সেই ঔপনিবেশিক শক্তিরই প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে। ফল সর্বক্ষেত্রে শুভ হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, সমাজের বুকে আপাতদৃশ্যমান এই ভাঙাগড়ার খেলা কি ইতিহাসের মূল ধারাতে কোন জলোচ্ছ্বাস ঘটায়? অথবা তার স্রোতকে কি তা তীব্রতর করে? বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে সমাজজীবনের চঞ্চলতার যোগাযোগের হিসেব মিলবে এই প্রশ্নের উত্তরে।

প্রাক-বৃটিশ পর্বে এদেশে সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও প্রধানত গ্রামভিত্তিক। প্রতিটি গ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে ছিল এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিট। যদিও এই সব গ্রামের সম্পত্তির ওপর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির মালিকানা স্বীকৃত ছিল, তবু কার্যত গ্রামের কৃষকগোষ্ঠীই ছিল এই সব জমি-জমার প্রকৃত মালিক। গ্রামের মাতব্বর বা গোষ্ঠী-প্রধানের তত্ত্বাবধানে কৃষককুল আপন আপন জমিজমা চাষ করে বংশানুক্রমে তার ফল ভোগ করতো। গ্রামভিত্তিক সমাজে 'লাঙ্গল যার, জমি তার' এই নীতিই হিন্দু ও মুসলমান, উভয় রাজশক্তির আমলেই মোটামুটিভাবে কার্যকর ছিল। কৃষককুল ও রাজশক্তির মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী কোন জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি, যাদের জমিদার বা জায়গিরদার বলা হতো, তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে মোঘল সম্রাটের কর আদায়ের কর্মচারী। তাদের বংশানুক্রমিক অবস্থান যে একেবারে দেখা যায়নি, তা নয়; তবে গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থার ভারসাম্যকে তা বিচলিত করেছে খুব কমই। এই ভারসাম্য যে উন্নত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফল, এমন কথা বলা চলে না, বহুল পরিমাণে

মুদ্রার ব্যবহার তখনও প্রচলিত না হওয়ায় বিনিময় ব্যবস্থা নৈর্ব্যক্তিক ও তার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত হয়ে পড়বার সুযোগ পায় না, বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামের স্বল্প চাহিদা তৃপ্ত হতে থাকে তার নিজস্ব উৎপাদনেই। বিপুল কর্মকাণ্ডের অস্থিরতা নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে তেমন কোন আঘাত হানে না, একটা 'লোয়ার লেভেল ইকুইলিব্রিয়াম' প্রতিটি গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে বর্তমান থাকে, যদিও গ্রামে গ্রামে পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক আদানপ্রদান কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় না।

অর্থনৈতিক জীবনের এই স্থিতিশীলতা অবশ্য স্থবিরত্বেরই লক্ষণ। গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা যদি কোন বৃহত্তর অভাববোধকে স্বীকার করে গড়ে উঠতো, তা'হলে গ্রামের কর্মজীবনের অনড়ত্ব হয়ত' অনেকাংশে এড়ানো যেতো। এই অভাববোধ মানুষের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল, যেহেতু গ্রামজীবন ছিল সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ, তাই বৃহত্তর পটভূমিতে মানুষে মানুষে যোগাযোগের ফলে গড়ে ওঠা অতৃপ্তি ও অভাববোধ তাকে বিচলিত করে না। বাইরে থেকে আঘাত দিয়ে গ্রামজীবনকে ভাঙতে পারলে অথবা ভেতর থেকে অন্তরের প্রেরণায় গণ্ডি ভেঙে বেরুতে পারলে তবেই এই জড়ত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এর কোনটিই সম্ভব হয় না। পূর্বনির্দিষ্ট সমাজ-কাঠামোতে একটি গ্রামজীবনে বাইরে থেকে আঘাত করার অর্থ অন্য কোন গ্রাম থেকে সেই গ্রামে আঘাত আসা। বাইরের গ্রাম আঘাত করতে পারে তখনই, যখন সে নিজেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পায়। কিন্তু যেহেতু সারাদেশের সমাজব্যবস্থা মোটামুটিভাবে একই রকম, তাই বিধিনিষেধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ার প্রেরণা কোন গ্রাম-মানুষই আপন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করতে পারে না। মানুষ এক নীচুস্তরের জীবনচর্চায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

মানুষ যে গ্রামজীবনের ভেতর থেকে আলোড়ন তুলতে নিস্পৃহ থাকে, তার কারণ প্রধানত দু'টি। এক, দেশে উৎপাদনপদ্ধতি প্রাচীন হওয়ায় শ্রমের কম উৎপাদিকা শক্তি, এবং, দুই, সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংস্কারের প্রতি জনগণের পরিপূর্ণ আনুগত্য। এই দু'টি বিষয় আবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের পথ ধরেই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে, অথবা সমাজব্যবস্থায় ভাঙন বা চাপ সৃষ্টির ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঐ দুটোর কোনটিই, প্রাক-বৃটিশযুগ পর্যন্ত, এদেশে সংঘটিত হয়নি, কারণ জটিল নয়, তবে দূর-বিস্তারী। হিন্দুকুশ পেরিয়ে আর্যগণ যখন এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে, তখন তারা ছিল অর্ধসভ্য ও যাযাবর। সিন্ধুনদের অববাহিকায় তাদের স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে ওঠে। ফল-কুড়ুনি ও পশুপালক থেকে তারা ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হয়ে উঠতে থাকে। সেখান থেকে যখন তারা গঙ্গা অববাহিকা ও তার পূর্ব ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এক কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সভ্যতা এদেশে মোটামুটি পরিপূর্ণ রূপ পায়, ঘোড়া ও গবাদিপশুর অর্থনৈতিক ব্যবহার ও বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা এই কৃষিভিত্তিক সমাজের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভূমির উর্বরাশক্তি প্রচুর থাকায় অতিরিক্ত উৎপাদন আর অসম্ভব থাকে না। এর ফলে সমাজে একদিকে পরশ্রমজীবী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতকুল এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে বহির্বাণিজ্যের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। বাণিজ্য ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর চাহিদা কৃষিভিত্তিক সমাজ পরস্পর-বিরোধী। কাজেই আমরা অবাক হইনে, যখন জানি, এদেশে বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতিবাদে, এবং বৌদ্ধধর্মের আবেদন সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠী, সওদাগর ও অন্যান্য বহির্মুখী জনসমষ্টির কাছেই। জনসংখ্যাবৃদ্ধি অতিরিক্ত কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

কমিয়ে আনে ; ফলে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত পুরোহিতকুলের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রায় বিনা রক্তপাতে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম কেমন করে বিতাড়িত হলো, তা ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সমস্যার সমাধান হয়ত অনায়ত্ত থাকে না।

উৎপাদন কর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় অনেক আগেই, তাই কোন সৃজনশীল কর্মে নয়, বিধিনিষেধের বেড়াজাল তুলেই ব্রাহ্মণরা সমাজে আপন আধিপত্য বজায় রাখতে যত্নবান হয়। যেহেতু প্রকৃতি রহস্যময়, জীবন অবলম্বনহীন ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাই দুর্বলচিত্ত মানুষ সব ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনেকটা স্বেচ্ছাতেই মেনে নেয়। অজানা সম্ভাবনায় অভিযানের চেয়ে নিশ্চিন্ত জীবনের শান্তি তাদের কাছে মনে হয় অনেক বেশি কাম্য, ফলে সমাজ তার গতিশীলতা হারিয়ে হয়ে পড়ে নির্বীর্য ও স্থবির। অন্তর্মুখী জীবনচর্চা পরিণতিতে প্রতিটি গ্রামকে বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত করে। মনের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে রাখা এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটানো এই অবস্থায় আর সম্ভব হয় না। সুদূর অতীতে শেখা প্রাচীন উৎপাদন-পদ্ধতি সমাজের বুকে ক্রমাগত চলে আসতে থাকে। শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি তাতে বিন্দু মাত্র বাড়ে না ; একই সঙ্গে বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে ভীরু ও অদৃষ্টবাদী করে তোলে। প্রাচীন উৎপাদনবিধি ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য এক পাপচক্র সৃষ্টি করে একে অন্যের পরিপুষ্টি ঘটায়।

মধ্যপর্বে মোসলেম শাসন অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আনে না। উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহারপ্রণালী যেমন ছিল, তেমনি থাকে, উৎপাদন-ভিত্তিক-সমাজ-সম্পর্ক (production relations) নীচুস্তরে আরো কিছু আঁটো-সাটো হয় মাত্র। এ কথাটা ভুলে যাওয়া অনুচিত হবে যে মোসলেম শক্তির সৃজন ক্ষমতা যখন ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ, তখনই

তারা এদেশে শাসক হিসেবে আগমন করে। নতুন কিছু দেবার ক্ষমতা, সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলবার প্রেরণা তখন তাদের প্রায় ছিল না বললেই চলে। প্রাণবন্যার মূল স্রোত মরুভূমিতে শুকিয়ে মরে, তার উপচে-পড়া জল শুধু এদেশে গড়িয়ে আসে, ক্লান্ত ও মুমূর্ষু দুই সমাজ-ব্যবস্থার যোগাযোগে কোন নতুন সৃষ্টির উৎসাহ জাগে না, বরং পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার ইচ্ছাই প্রবল হয়। বহিরাগত মুসলমানরা অতি দ্রুত এদেশী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্ত্যজ ও অচ্ছুৎ যারা ইসলামে মুক্তি খোঁজে, তাদের বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে ও কর্মধারায় কোনই পরিবর্তন আসে না ; উচ্চবর্ণের হিন্দু যারা মুসলমান হয়, তারা শুধু রাজদরবারে কিছু বাড়তি প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে উৎপাদন ও কর্ম-প্রবাহ যেমন ঢিমে লয়ে চলছিল, তেমনি চলে। ওপর ওপর পরিবর্তনের ভেতরে দেখা যায়, গ্রামজীবনে হিন্দু পুরোহিতের পাশাপাশি মুসলমান পীর-মৌলানাকেও একটি স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টি-কোণের বিচারে সমাজে হিন্দু 'ব্রাহ্মণ' ও মুসলমান 'ব্রাহ্মণ', উভয়ের স্বার্থই একাভিমুখী। উৎপাদনে উৎসাহদান তাদের কারো কাছেই নিরাপদ মনে হয় না ; বরং ধর্মীয় বিধিনিষেধের বন্ধনে শ্রমজীবীদের বেঁধে রাখাতেই তাদের স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষা পায়। সমাজজীবনে গুণগত পরিবর্তন প্রায় কিছুই ঘটে না ; শুধু জনগণ হিন্দু ও মুসলমান এই দুটোর কোন একটি নামে নিজেদের পরিচিত করে।

গণজীবন যখন এইভাবে এক শোচনীয় উদ্যমহীনতায় আক্রান্ত, সেই সময়ে এদেশে ইংরেজের আগমন ঘটে। বাণিজ্যপথে দেশের শাসনব্যবস্থা তাদের হাতে এসে পড়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি গোটা উপমহাদেশ তাদের দখলে আসে। বাঙলা দেশে অবশ্য ১৭৫৭'র পলাশির যুদ্ধের পরই ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকে এই প্রভুত্ব হয় নিশ্ছিদ্র ও ব্যাপক। ইংরেজের আগমন ঘটে সমাজের এক চরম অধঃপতনের যুগে। ভেতর থেকে নয়, এ হলো একেবারে বাইরে থেকে

আঘাত হানা। সামগ্রিকভাবে সমাজের সব রকমের সম্পর্ক প্রচণ্ড ভাবে নাড়া খায়। কোন মানুষের পক্ষেই আর আগের অবস্থায় স্থির থাকা সম্ভব হয় না। তবে এই পরিবর্তন যে সবই কল্যাণকর, এমন কথা মনে করবার কোন সংগত কারণ নেই। এদেশে ইংরেজের ভূমিকা শুধু ত্রাণ-কর্তা রূপে নয়, অনেক দুঃখদুর্দশার স্রষ্টা রূপেও। উনিশ শতকের বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণের বিচারে এই দুই ভূমিকার যোগসূত্র খুঁজে দেখা প্রয়োজন। ইতিহাস নগরসভ্যতার চাকচিক্যকে পৃথকভাবে কোন মূল্য দেয় না ; সমাজের জীবন ও কর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রতায় তার কার্যকর ভূমিকাটুকুই মনে রাখে মাত্র।

'এ দেশের অধঃপতিত জনগণকে মুক্তির পথ দেখানো ইংরেজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের আগমন ঘটেছিলো বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধা অর্জনই ছিল তাদের লক্ষ্য। যখন তারা এদেশে শাসক হয়ে উঠলো, তখনও তাদের বণিকচরিত্র এতটুকু লুপ্ত হলো না, বরং শাসক হিসেবে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেয়ে তারা তাকে পুরোপুরি নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের কাজে লাগালো। ইংরেজদের ভারতবর্ষ জয়ের পর্ব তাদের স্বদেশে শিল্পবিপ্লবের কালের সঙ্গে মিলে যায়। উল্টোদিক থেকে বলা চলে, উপনিবেশ গড়ার অর্থনৈতিক তাগিদটা এসেছে শিল্পবিপ্লবেরই প্রয়োজনে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে একদিকে চাই প্রচুর কাঁচামাল, অন্যদিকে চাই উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের উপযোগী বিরাট বাজার। আপন দেশে আবদ্ধ থেকে এ দুটো চাহিদার কোনটিই পূরণ করা সম্ভব ছিল না। ওদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও প্রযুক্তি বিদ্যায় বিস্ময়কর সাফল্য বৃহৎ শিল্পের প্রসারে ক্রমাগত প্রেরণা জোগায়। অনেকটা প্রাণের প্রয়োজনেই ইংরেজদের তাই বাইরের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। উপনিবেশ গড়ে তোলায় একদিকে যেমন বাজারের সমস্যা মিটলো, অন্যদিকে তেমনি কাঁচামালের অবাধ আমদানিও সহজতর

হলো। উপনিবেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া ঘটলো অন্যভাবে। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব সফল করার প্রয়োজনে উপনিবেশের শিল্পভূমি ধ্বংস করতে হলো। তার কৃষিপণ্যও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হতে থাকলো। তার নিজস্ব চাহিদা পূরণ হলো কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে কোন রাজপুরুষ বা প্রভাবশালী অন্য কেউই তেমন আগ্রহী ছিল না। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাতেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাইরে থেকে ঔপনিবেশিক আঘাতে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার বুনিয়াদ ভেঙে তছনছ হয়ে যায়; তার বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর মোটেই বজায় রাখা যায় না। তবে বহির্বাণিজ্য তাকে বাইরের সঙ্গে যুক্ত করলেও তার নিজস্ব উৎপাদিকাশক্তিকে চূর্ণ করে। নতুন কোন উৎপাদনব্যবস্থা দৃঢ়মূল না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতটা নিরাবলম্ব ও শোচনীয় হয়ে পড়ে, তার বর্ণনা পাই কার্ল মার্কস্‌-এর রচনায়ঃ

সুতীবাণিজ্যের ২/৩ অংশেরও বেশি। কিন্তু সুতী মাল উৎপাদনেও এখন বৃটেনের ১/৮ ভাগ লোক নিযুক্ত এবং তা থেকে আসছে সমগ্র জাতীয় আয়ের ১/১২ ভাগ। প্রত্যেকটা বাণিজ্য সংকটেই পূর্বভারতীয় বাণিজ্য বৃটিশ সুতী কারখানা মালিকদের পক্ষে হয়ে উঠেছে ক্রমেই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পূর্ব-ভারতীয় মহাদেশ হয়েছে আসলে তাদের সেরা বাজার। যে হারে সুতী মাল উৎপাদন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃটেনের গোটা সমাজকাঠামোর পক্ষে মূল স্বার্থ, ঠিক সেই হারেই পূর্বভারতও হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃটিশ সুতীমাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।"[২]

কৃষি ও কুটিরশিল্পভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের রুদ্ধ দুয়ার যদি ভেঙে পড়ে, এক হীন অনড় নিশ্চেতন অস্তিত্ব যদি বাইরের অকরুণ আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, তবে শুধু তার জন্যেই বিলাপ করা নিতান্ত অর্থহীন। ধ্বংসের পটভূমিতেই বিপুল কোন সৃষ্টিক্রিয়া যদি জীবনকে প্রসারিত করে, তবে এই বৈনাশিকতাকে জড়ত্ব নাশের মহৎ প্রয়াস বলে মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু সত্যি সত্যিই বৃটিশ শাসন কি তেমন কোন সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়? অস্বীকার করবার উপায় নেই, উনিশ শতকের বাংলায় তথাকথিত নবজাগরণ এ দেশের জনগণের ইংরেজের সংস্পর্শে আসারই প্রত্যক্ষ ফল। য়োরোপের বিপুল জীবন-তৃষ্ণা ও প্রচণ্ড কর্মোন্মাদনা তাদের মুগ্ধ করে; অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকরণের চেষ্টায় তারা নিজেরাই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমাজে নতুন আলোড়ন জাগে সত্য, এবং তা নগর-জীবনে প্রাচুর্যও আনে, কিন্তু তা কি প্রকৃতই নবজাগরণ? বহমান কালগঙ্গায় তা কি নতুন প্রাণের জোয়ার আনে? এদেশে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার চারিত্র্য বিচারে এই প্রশ্নের জবাব মেলে।

বাণিজ্যকেন্দ্র ও বহির্বন্দর হিসেবে কলকাতার সুযোগ-সুবিধা সেখানে

নির্মাণে প্রেরণা জোগায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ অভিযানে তাদের প্রধান কুঠি স্থাপন করে কলকাতায়। পরবর্তীকালে যে বিরাট কলকাতা নগর গড়ে ওঠে, তা তাদের এই কুঠি নির্মাণেরই ফল। একদিকে বাণিজ্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের বাসনা, অন্যদিকে গণজীবন থেকে তাদের দূরত্ব এই দুই-এর ভেতরে সামঞ্জস্য আনতে এক শ্রেণীর দেশীয় লোকের সহায়তা প্রয়োজন। তা মিলে যেতে দেরি হয় না। ভাগ্যান্বেষী, সুবিধাবাদী ও অকুলীন এক দল লোক কোম্পানির ব্যবসার সূত্র ধরে প্রচুর লাভের সুযোগ পেলো। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে তারা বিন্দুমাত্র দেরি করে না। কোন সৃজনশীল কর্মতৎপরতা নয়, হঠাৎ বড় লোক হবার উদগ্র লোভই তাদের স্বার্থকে কোম্পানির স্বার্থের সঙ্গে একত্রে বেঁধে দেয়। ইংরেজ বণিকদের সহকর্মী এই সুযোগসন্ধানীর দল পরিচিত হয় দেওয়ান ও বেনিয়ান নামে, সরকার, মুন্সী ও খাজাঞ্চি হিসেবে, অথবা দালাল ও মুৎসুদ্দি রূপে। কোম্পানি আমলের প্রথম পর্যায়ে এরাই হলো বিদেশী বণিকদের প্রধান ভরসাস্থল। বেনিয়ানরা হয়ে দাঁড়ায় সাহেবদের 'interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, supplier of cash, cash keeper, and in general secret keeper'.[৩] অন্যান্য ধরিবাজ সুবিধাবাদীরাও অনুরূপ ভাবে কোম্পানির ব্যবসায়ে সহায়তা করে, এবং তারাও তার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে বাঁচে। কোম্পানি রাজশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের প্রতিপত্তিও বেড়ে যায়। অনেকে নতুন শাসকের কাছ থেকে জমিদারি ঘুঁষ পেয়ে, আবার কেউ কেউ জমিদারি কিনে সমাজে মাতব্বর হয়ে বসে। শাসন ও শোষণ এর ফলে নির্বিবাদে চলতে থাকে, উৎপাদনে ও নবজীবনে সৃজনশীলতার স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় সামান্যই।

যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো সমাজে নতুন

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উৎপাদন বিমুখতা অথবা উৎপাদনবিচ্ছিন্নতা। প্রাচীন সমাজ ভেঙে পড়লো ; নতুন শহরও গড়ে উঠতে থাকলো। গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্য কলকাতা হয়ে পাড়ি জমায় ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডের কলকারখানায় তৈরি ভোগ্যপণ্য বেচা হয় গ্রামের বাজারে। হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বড়লোক শ্রেণী শহরে বসে এই কেনা-বেচার সুবিধা আংশিক ভোগ করে। কি কৃষি ক্ষেত্রে, কি বাণিজ্যে, এই বড় লোক শ্রেণী শুধুই মধ্যস্বত্বভোগী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমির উৎপাদক ও শাসকের মাঝখানে উৎপাদনবিমুখ জমিদারের অর্থনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। শহরে বাণিজ্য ব্যবসায়ে মধ্যবর্তীর দল উৎপাদন কর্মে লিপ্ত না হয়েও কোম্পানির ছত্রছায়ায় থেকে অহেতুক মুনাফা লুঠে। হঠাৎ বড় লোকের অতিরিক্ত সঞ্চয় উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত হয় না। টাকা জমিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদারি কিনে অনেকে অভিজাত হবার সুযোগ খোঁজে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষককুলের স্বার্থ অথবা উৎপাদনে উন্নতিকে এতটুকু মূল্য দেয় না ; জমিদারের নিশ্চিত আধিপত্যের সুযোগ গড়ে তোলাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঔপনিবেশিক পরিবেশে হয়ত এইটেই স্বাভাবিক ছিল। উপনিবেশ প্রতিযোগীর স্থান নেবে, বিদেশী শাসক নিজের স্বার্থেই তা কখনো চায় না। উপনিবেশের উৎপাদিকা শক্তি ক্রমাগত বাড়লে তা তাদের নিজেদেরই শংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটলেও এদেশে তাই তা প্রথম পর্যায়ে উৎপাদন পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনেনি। উনিশ্ শতকের দ্বিতীয় পর্বে পরিবর্তন যেটুকু এলো তাও ঘটলো বিদেশী রাজশক্তিরই অর্থনৈতিক স্বার্থে। ক্রমাগত শোষণের ফলে এদেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী উপনিবেশের বাজারে বিক্রি না হলে তা আঘাত হানবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পকেই। অতএব তাদের নিজস্ব শিল্পে উন্নতির প্রয়োজনেই এদেশের উৎপাদন ও ক্রয় ক্ষমতা কিছুটা বাড়াবার

দিকে নজর দিতে হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে আংশিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলেই। এ সত্ত্বেও উৎপাদন ক্রিয়ায় জীবনের নতুন স্পন্দন প্রায় কিছুই শোনা যায় না। শোষণভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থায় মানুষের সৃজনশীলতা উৎসাহ পায় খুব কমই। গ্রাম ও শহর পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এক সর্বব্যাপী শোষণের প্রয়োজনে। জীর্ণ, পুরাতন গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে; নতুন সুস্থ ও জীবনমুখী কোনো সমাজ-ব্যবস্থা তার জায়গায় গড়ে ওঠে না। মানুষকে যা নিত্য অপমান করে, তার অস্তিত্বকে যা কুণ্ঠিত করে, সেই অপরিসীম নীচতা ও বীভৎস লালসা ঐশ্বর্যের মুখোশ পরে জীবনকে ঠকায়। জীবন অরুগ্ন উল্লাসে আত্মপ্রকাশের আশায় ভবিষ্যতের পথ চেয়ে থাকে, কালগঙ্গায় আর যাই হোক নকল জীবন ভাসে না। জীবনকে যা প্রত্যাখ্যান করে অথবা যা জীবননির্ভর নয়, তা আপাতদৃষ্টিতে যত মনোহরই দেখাক না কেন, সমুদ্র তাকে আহ্বান জানায় না; কালগঙ্গা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার পথ খোঁজে। বাংলার নবজাগরণ ঘটে এই ধরনের অবস্থাতেই।

এদেশে উনিশ শতকের নগরজীবনে বিশেষ করে নতুন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় উপনিবেশসুলভ মানসিকতা অনিবার্য ভাবেই দেখা যায়। নির্লজ্জ দাঁওবাজেরা জনগণকে বঞ্চিত করে বড়লোক হয়, কিন্তু উৎপাদনকর্মে পুঁজিবিনিয়োগে লক্ষণীয় কোন উৎসাহ দেখায় না; ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় তার সুযোগও অবশ্য তারা পায় না। বিকৃত রুচির বিলাসে ও অপকর্মের অপচয়ে অপরিমিত অর্থ প্রবলবেগে ভেসে যায়। উপযুক্ত বিনিয়োগের সম্ভাবনা না থাকায় সঞ্চয় যেখানে অর্থহীন, অসংযমী লালসায় লালিত হওয়ায় মানসিক পরিমণ্ডল যেখানে সংকীর্ণ, সেখানে হঠাৎবাবুদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন অস্তিত্বে তাৎক্ষণিক সুখ ও জীবনবিমুখী আমোদই প্রশ্রয় পায় বেশি। আমরা তাই অবাক হইনে, যখন জানি এই সব সুবিধাভোগীর দল খানাপিনা করে আর বাইনাচ দেখে, আতসবাজি পুড়িয়ে আর মোকদ্দমায় মেতে, বুলবুলির লড়াই দেখে

আর রক্ষিতা পুষে বেহিসেবি খরচের স্রোত বইয়ে দিয়ে অর্থহীন সঞ্চয়ের বোঝা হালকা করে সগর্বে উচ্ছন্নে যাবার নেশায় মাতে। সময়কে তারা জয় করে না, বরং সময়ের হাতেই তারা মার খায়। তাদের জীবন যে কতটা ইতর, উদ্দেশ্যহীন ও অন্তঃসারশূন্য, তা ১৮৪২ সালে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক 'বড়মানুষের' এই রোজনামচা থেকে অনেকটা অনুমান করা চলে ঃ

"গত বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ১০॥ ঘণ্টার সময় প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা-পান করিলাম, পরে দুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম কি, বেলা যখন ১১॥০টা তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎকাল নিদ্রাগত হইলাম, এবং বেলা যখন দুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাসখেলা এবং অন্য অন্যপ্রকার আমোদ করা গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পরন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি দশঘণ্টাবধি গানবাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

শুক্রবার—৭ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, সেদিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্নান ভোজন করিতে দুই প্রহর অতীত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার নিলাম দেখিতে গমন করিলাম, আমার চেরেটের জন্য একটা ঘুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিল, কিন্তু মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না ; সুতরাং নীলাম পরিত্যাগ পূর্বক একবার সুপ্রীমকোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিলাম, বস্ত্রত্যাগ করিয়া জলপান করিলে আমি, হরিবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

শনিবার—শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে দুইজন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক

পরিহাস ও কথোপকথন পূর্বক স্থির হইল যে খড়দাহে রামযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন—লোকও ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রবিবার—অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময় বাটী আসিয়াছি। আবার—বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।”

এই হলো বাঙলার নবজাগরণের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির স্বরূপ। গণজীবনকে তা দূরে থেকে উপেক্ষা করে, কাছে টেনে সঙ্গী করে না। নব্যসভ্যতার যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা এই অকর্মণ্যতা ও উৎপাদন বিচ্ছিন্নতাকে সরাসরি আঘাত করেননি বরং তাঁরা নিজেরাও সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে পরিচিত হতে চেয়েছেন। দাঁওবাজি ও টাউট-গিরি করে প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে এবং অসার আমোদ প্রমোদে আর অসংকোচ অপচয়ে এইসব নবযুগের প্রভুরা খুব কম কেরামতি দেখান নি। তাঁদের কর্মের অন্তর্নিহিত অনৈতিকতা যে তাঁদের কুণ্ঠিত করেছে, এমন প্রমাণ আমরা পাইনে, বরং অহংকারের অট্টরোলে নিজেদের জাহির করবার অলজ্জ প্রচেষ্টাই তাঁদের বড় বেশি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে তাঁর hero বলে মনে করেন সেই রামমোহন রায়ের বাড়িতে এক ভোজসভার বিবরণ দেন ফ্যানি পার্কস নামে জনৈকা ভদ্রমহিলা :

“সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা একজন ধনী বাঙালীবাবু রামমোহন রায়ের বাড়ীতে ভোজসভায় গিয়েছিলাম, প্রচুর আলো দিয়া বাড়ী ও বাগান সাজান হয়েছিল, বাজীও যথেষ্ট পোড়ান হয়েছিল। গৃহের বিভিন্ন কক্ষে নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। ভোজ শেষ হবার পর ভারতীয় যাদুকররা নানা রকম মজার খেলা দেখাল; কেউ তরবারী গিলে ফেললে, কেউ বা মুখ দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া বার করলে। একজন ডানপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ পা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে কাঁধে আটকে দিল।”[৪]

ঐশ্বর্যের খেল দেখানোয় রবীন্দ্রনাথের পিতামহ এবং রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরও কম আগ্রহী নন। তাঁর বাড়িতেও ভোজসভায় 'ভাগ্যবান সাহেব-বিবি'দের নেমন্তন্ন হয়, নাচগানের আসর বসে, ভাঁড়েরা সঙ সেজে স্থূল রসিকতায় সবাইকে খুশি করে। পান, ভোজন ও নৃত্যগীতের উৎকট উল্লাস শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন কর্মে এতটুকু প্রেরণা জোগায় না; নির্মম শোষণের অসহায় শিকার হয়ে তারা সুন্দরী নগরীর মোহিনী রূপের দিকে হতাশ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

একথা অবশ্য মানতে আপত্তি নেই যে সমকালীন য়োরোপের জীবনমুখী ধারণা এই সময়ে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ে। বিদেশী জীবন ভাবনায় বলিষ্ঠতার বিপরীতে নিজেদের জীবনযাত্রায় হীনতা এর ফলে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। নব্য শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীদের মনে তুমুল আলোড়ন জাগে। আত্মগ্লানির তীব্রতা ও আত্মান্বেষণে ব্যাকুলতা তাদের নব্যসভ্যতার ভাবরূপ রচনায় প্রেরণা জোগায়। তবে এ কথা মনে রাখা উচিত, ভাবরূপ চিন্তার জগতেরই সম্ভাব্য ফসল। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে যদি তা খাপ না খায়, তবে তার কর্মে রূপায়ণ সব সময়ে সুফল দেয় না। কাজের ভেতরে তাকে প্রকাশের চেষ্টাও অনেক সময়ে দুরূহ থেকে যায়। বাঙলার নবজাগৃতির যাঁরা পথিকৃৎ, এ জাতীয় সমস্যাকে তাঁরা এড়াতে পারেন নি। ফলে তাঁদের বিদ্রোহ বহু ক্ষেত্রে শৌখীন চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁদের জনহিতকর কর্ম অনেক সময়ে সামগ্রিক কল্যাণের চেয়ে বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়কেই বেশি ডেকে আনে। উৎপাদন-কর্মপ্রবাহের বাইরে তাঁদের অবস্থান এই অসংগতিকে আরো প্রকট করে তুলে।

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় যাঁরা কোন ভাবেই সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত নন, দালালি আর ফেরেব্‌বাজি করে, 'ধর্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক

সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের'* যে সব ফন্দি ফিকির বের করেন সেগুলো নির্বিবাদে কাজে লাগিয়ে যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁদের গোটা অস্তিত্বটাই এক বিরাট ফাঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া মানে নিজেদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা, আবার এই অবস্থাকে মেনে নেবার অর্থ, ঔপনিবেশিক শোষণকর্মে নিজেদের যুক্ত রাখা। নব জাগৃতির মহানায়কেরা শোষণকর্মে লিপ্ত থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারাকেই অনেক বেশি কাম্য মনে করেছিলেন। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা এজাতীয় লিপ্সায় প্রকাশ পায় না। বাঙলার নবজাগরণ যে মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত একথা অকুণ্ঠে মেনে নেওয়া তাই যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে। সত্য কথা, অনেক সামাজিক কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কিন্তু এই লড়াই-এর মূল কারণ মানবিক মূল্যবোধ যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি সভ্য মানুষের ভদ্রতাবোধ। তাঁরা যে সতীদাহ বা দাস প্রথার বিরোধী এর অন্যতম কারণ, সমকালীন য়োরোপীয় সমাজে এজাতীয় নৃশংস প্রথার অনুপস্থিতি। যে সব সামাজিক বর্বরতা য়োরোপীয়দের কাছে তাঁদের হেয় করে, নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যেই তাদের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁরা যত্নবান হন। বিদেশী শাসকের চোখে ভদ্র থাকবার ইচ্ছা যে তাঁদের সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে নেতৃত্ব নিতে প্রেরণা জোগায়নি, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের সব কর্ম সমর্থনের যোগ্য নয়; অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তারা বাড়িয়েই তোলে। যেহেতু এইসব কর্ম বিদেশী রাজশক্তির প্রশ্রয় পায়, তাই তাদের অনৈতিকতা তাদের চোখে ধরা পড়ে না। রামমোহন রায়ের দল আত্মীয় সভা, ইউনিটেরিয়ান কমিটি স্থাপন করেন, ধর্মতত্ত্ব,

সমাজ-সমস্যা নিয়ে বিচারবিতর্ক করেন, সহমরণ নিবারণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন, আইনের রক্ষাকবচে তাকে প্রতিষ্ঠিতও করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা নতুন জমিদারি প্রথার সমর্থনে তাঁদের মত ব্যক্ত করেন, নীলকরদের হয়ে প্রকাশ্য ওকালতি করেন, অবাধ বাণিজ্যকে হিতকর বলে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, এই দুই প্রবণতা পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের উৎস একই। সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরনির্ভর ও সুবিধাভোগী অস্তিত্বের স্বার্থচিন্তাকেই তারা প্রতিফলিত করে। নবজাগৃতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ নয়। কর্মের ও উৎপাদনের বাস্তবভূমিকে হয় তাঁরা এড়িয়ে চলেন, নয় ত' বা তাঁদের কার্যকলাপ সেখানে সর্বনাশই ডেকে আনে। শ্রেণীবিন্যাসের নব পর্যায়ে নিজেদের বৃত্তের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে যা কিছু কুৎসিত, গ্লানিময় ও হাস্যকর, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু তাঁদের সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ের বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এইদিক থেকে তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের এক সামাজিক অনিবার্যতা ছিল। যদি সেই মুহূর্তেই রামমোহন আসরে না নামতেন, তা' হলেও এ আন্দোলন ঘটতো। তাঁর শ্রেণী থেকেই তাঁর মত আরো অনেকে এই ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতেন। ইতিহাস কিন্তু একমাত্র তাঁদের শ্রেণীতেই কর্মরত থাকে না। যেখানে উৎপাদনের বিভিন্নরূপে জীবনের অন্বেষণ, ইতিহাসের কর্মব্যস্ততা সেইখানেই সবচেয়ে বেশি। বাঙলার নবজাগরণের নেতাদের কোন সুকৃতিই সেখানে তেমন কোন আলোড়ন জাগায় না, যদিও তাঁদের দুষ্কৃতি নানাভাবে ইতিহাসের গতিকে ব্যাহত করে।

উনিশ শতকের শুরুতেই য়োরোপে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে উদার দৃষ্টিভংগি গড়ে উঠতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

উদার দৃষ্টিভংগি রূপ নেয় অবাধ প্রতিযোগিতার ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনে। রাষ্ট্রচিন্তায় উদার দৃষ্টিভংগির প্রকাশ ঘটে ব্যক্তি-স্বাধীনতায়, সংসদীয় গণতন্ত্রে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতায় ও বিচারের পক্ষপাতহীনতায়। উদার অর্থনীতি ও উদার রাষ্ট্রনীতি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়, যদিও অনেক সময়ে তারা একে অন্যের পরিপূরক। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদার মনোভাব হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসে না। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে, এবং শিল্পবিপ্লব ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগিকে উৎসাহ দেয়। একই সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনে গড়ে তুলতে হয় উপনিবেশ, দরকার হয় আন্তর্জাতিক-বাণিজ্যের। উপনিবেশের নিজস্ব শিল্পকাঠামো যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর দেশীয় শিল্পের পক্ষে ভয়ের কারণ থাকে না, বরং তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে তা সহায়কই হয়। এ্যাডাম্ স্মিথ্ থেকে শুরু করে রিকার্ডো পর্যন্ত সব ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ-নীতিবিদই যে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল দেখানোয় ব্যস্ত, তা মোটেই আকস্মিক নয়। শিল্পবিপ্লবের উপযোগী অর্থনীতিকেই তাঁরা গড়ে তুলছিলেন। ওদিকে বেন্থাম তাঁর বস্তুতান্ত্রিক উপযোগবাদে (Utilitarianism) সমকালীন লিবার্যাল ভাবনার তাত্ত্বিক ভূমিকেই রচনা করছিলেন। অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সর্বাধিক সুখ ইত্যাদি বড় বড় কথা যতটা মানবিক মূল্যবোধের অন্বেষণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বীকার করে উৎপাদন কর্মে বাস্তব পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য দাবিকে। শিল্পবিপ্লবকে সফল করায় লিবার্যালিজ্‌মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনগণের কল্যাণবৃদ্ধিতে যে সব সময়ে সহায়ক হয় না, তা অন্য দেশ দূরে থাক, ইংল্যাণ্ডেরই তৎকালীন বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা থেকে বুঝে ওঠা কঠিন হয় না। শ্রমনীতির ক্ষেত্রে নতুন বিধিব্যবস্থা যা কিছু কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়েছে, তা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিসামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠেনি, বরং গড়ে উঠেছে সমষ্টি কল্যাণেরই

ধারণা থেকে। এ'কথা আজ অস্বীকার করা চলে না যে বেন্থামীয় সমাজচিন্তা ভ্রান্ত। প্রতিটি মানুষ তার নিজের ভাল বোঝে এবং তার কল্যাণের পথ সে নিজেই বেছে নিতে পারে, এ ধারণা কোন বাস্তব পরিস্থিতির সমর্থন পায় না।

বাঙলায় যাঁরা নবযুগের প্রবর্তক, তাঁরা কিন্তু এই ভ্রান্ত সমাজ-ভাবনাকেই নিজেদের আদর্শ বলে মনে করলেন। ইংল্যাণ্ডে তবু লিবার‍্যালিজ্‌ম্ চর্চার উপযোগী শিল্প-বিপ্লবের পরিবেশ ছিল, এদেশে আবার তা'ও অনুপস্থিত। পুরোপুরি নৈতিক সমর্থন না থাকলেও তা ইংল্যাণ্ডে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এ'দেশে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তার ফল হয় ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কার ও তাদের বিস্ময়কর প্রয়োগকুশলতা বাঙলার মানুষের কাছে তখন সম্পূর্ণই অজানা। এ অবস্থায় শিল্প-বিপ্লবের কথা বোধহয় মানুষ স্বপ্নেও চিন্তা করে না। তা'ছাড়া ঔপনিবেশিক শক্তির আক্রমণে দেশীয় শিল্প একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা অসম প্রতিযোগিতার রূপ নেয়। সবল ও দুর্বলের প্রতিযোগিতায় দুর্বলের ন্যায্য দাবি খুব কমই প্রতিষ্ঠিত হয়। যে পরিবেশ এর ফলে গড়ে ওঠে তা যেমন অকরুণ, তেমনি ভয়াবহ। অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ভোগ্যপণ্যের যথেচ্ছ আমদানি দেশীয় শিল্পকে আর মাথা তুলবার সুযোগ দেয় না। ওদিকে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ও তার কেনাবেচার ব্যবস্থা কৃষির ক্ষেত্রেও চালু হওয়ায় খোলাবাজারের অসম প্রতিযোগিতায় কতিপয় জমিদার সব জমির মালিক হয়ে দাঁড়ায়। বাঙলায় যাঁরা নবজাগরণের হোতা, তাঁদের চোখে এই অন্যায় ধরা পড়ে না, বরং অবাধ বাণিজ্যের পথে অসার কর্মে লিপ্ত থেকে ধনী হবার ও খোলাবাজারে জমিদারি কিনে সমাজে কল্কে পাবার সুযোগ তাঁরা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেন। সমকালীন য়োরোপের লিবার‍্যাল চিন্তা ভাবনার প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের মূল কারণ বোধ

হয় এইটেই। তাঁদের গণ্ডির বাইরে গোটা সমাজের, বিশেষ করে উৎপাদন কর্মে রত মানুষের অবস্থা এই নীতির প্রয়োগে ক্রমশ খারাপের দিকে যায়, তা ভেবে দেখবার ইচ্ছা বা অবসর, কোনটিই তাঁদের ছিল না। যে কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর সমাজের মূল চালিকা শক্তি, তারাই হয়ে পড়ে পঙ্গু, চলৎশক্তিহীন ও বিপর্যস্ত। তাদের দুর্দশার মূল্য দিয়ে কেনা হয় ছিন্নমূল নগরজীবনের নানা বিলাসের উপকরণ। শাসন ও শোষণের উৎকট প্রয়োজনে 'লিব্যারাল' নীতির সুবিধাবাদী প্রয়োগে উৎপাদনে নিয়োজিত মানুষগুলোর অবস্থা দাঁড়ায় একরকম ক্রীতদাসের মত। তাদের হতাশা ও ঘৃণা জমাট বাঁধতে থাকে, যদিও এই পুঞ্জীভূত অভিযোগ সুস্থ প্রকাশের কোন সুযোগ পায় না। তিতুমির ও তাঁর মত আরো অনেক অশিক্ষিত কৃষক নেতার বিদ্রোহ ধর্মের গোঁজামিলে বিকৃত হলেও তাদের অন্তর্নিহিত আক্রোশটুকু চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না। বাঙলার নব জাগরণ জীবনকে যতটা পুষ্ট করে, বঞ্চিত করে তার চেয়ে অনেক বেশি। বঞ্চনার অভিশাপ জীবনকে কোন মহত্তর তীর্থে পৌঁছে দেয় না। বহমান কালগঙ্গা তাকে উপেক্ষাই করে।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের বাঙলায়। এই আবির্ভাব কি ইতিহাসের মনে থাকে? নাকি তার উপেক্ষার বোঝা বয়ে বেড়ানো তার কর্মফল হয়ে দাঁড়ায়? বাঙলার নব্যসভ্যতার যদি তিনি কারিগর হন তবে তাঁর দায়িত্বের ভাগও তাঁকে বইতে হয়। শুধু ভাল বা মন্দ নয়, ভালমন্দ মিলিয়ে সব কিছুর দায়িত্ব। কিন্তু এই কি সব? নব্যসভ্যতার বাঁধা পথের বাইরে কি তিনি পা ফেলেননি? শ্রেণী অস্তিত্বকে অতিক্রম করে সমগ্রকে ধরবার চেষ্টা তাঁর কর্মে যদি কখনও বড় হয়ে ওঠে, তবে তার প্রাপ্য মূল্যে তাঁকে সম্মান জানাতে ইতিহাস কোন আপত্তি করে না। আপন স্বভাবের তাগিদেই সে তাকে বয়ে

নিয়ে যায়। প্রবল প্রাণের অমিত উচ্ছলতায় বিদ্যাসাগর ছিলেন অনন্য। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ। তবে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকলেই যে কেউ নির্বাসন এড়াতে পারে না।

বিদ্যাসাগর কি তা পেরেছিলেন ?

বহু বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেও যে কাজ বিদ্যাসাগরের খ্যাতিকে বহুবিস্তৃত করে, তা' হলো এদেশে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে তাঁর সফল কিন্তু দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এই কাজে ব্রতী হতে প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধ তিনি উপেক্ষা করেছেন। মানুষের দৃঢ়মূল সংস্কারের ওপর সোজাসুজি আঘাত হেনেছেন। যা তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি নির্ভয়ে সব বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। আপন শক্তিতে তাদের চূর্ণ করে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। সফল হয়েছেন। এই সাফল্য শুধু গণমত গঠনে বা আইন পাশ করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। যাকে সত্য বলে জেনেছেন শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে তিনি কর্মে রূপায়িত করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করেন। আত্মীয় স্বজন তাতে অসন্তুষ্ট হলে তিনি তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন—

> "...আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক ; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম...বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ' জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।..."[৬]

বিদ্যাসাগরের নিজের মতেই বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম', তার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন। ভয় দেখিয়ে বা তোষামোদ করে তাঁকে নিরস্ত করা যায় নি। একটি নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথাকে সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সন্দেহ নেই এটি একটি মহৎ কাজ। কিন্তু সমাজজীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুললেও তা বৃত্ত ছাড়ায় কি? গণজীবনকে তা সঞ্জীবিত করে কতটুকু? জনগণের বাস্তবজীবনধারায় যার যোগ নেই, অনেক প্রশংসনীয় ও মহৎ হলেও সে কাজ আসলে নিষ্প্রভ ও ব্যর্থপ্রাণ। কালগঙ্গার মূল স্রোত থেকে তা দূরেই থাকে।

বিদ্যাসাগরের আমলে সমাজের সব সম্প্রদায়ের ভেতরেই বিধবা-বিবাহ এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। মোসলেম সম্প্রদায় সমাজের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকেন। বিধবাবিবাহ তাঁদের কাছে এক বিধিসম্মত ও প্রচলিত প্রথা। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভেতরেও বিধবা-বিবাহ অবাধে চলে এসেছে। একে অবৈধ ভাবার কথা সেখানে কারো মনে জাগেনি। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করে রাখে। সমস্যার অকরুণ রূপটিও তাই প্রকট হয়ে দেখা দেয় তাঁদেরই ভেতরে। তবে এই সমস্যাকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমগ্র সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। অন্যান্য সামাজিক কু-প্রথার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিধবাবিবাহের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করেননি। কিন্তু তাঁর এই সমাজ-ভাবনা ও সংস্কার-চিন্তা উচ্চবর্ণের জীবনবৃত্তে আটকে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যাকে তা স্পর্শ করে না।

উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে বিধবাদের করুণদশা এদেশে কৌলীন্য প্রথার অন্যতম কুফল। কৌলীন্যপ্রথা বহু বিবাহের প্রশ্রয় দেয় এবং কুলীন পুরুষের বিবাহ-ব্যবসায় ও কুলীন ললনার অকাল বৈধব্য বহুবিবাহ প্রথারই অনিবার্য পরিণতি। সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই

এ এক অর্থহীন অপচয়। এই অপচয়ের অবসান ঘটাবার জন্যেই বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। বিবাহ-ব্যবসায় যদি আর লাভজনক না থাকে, অথবা তা যদি সমাজে নিন্দনীয় হয়, এবং বিধবাদের ওপর সমাজের শাসন যদি শিথিল হয় তবে মানুষের এত দিনের রুদ্ধ ও বিকৃত কর্মপ্রবণতা মুক্তি পেয়ে নতুন পথ খোঁজার সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহে বিরোধিতা প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সময়োপযোগী করে তোলারই এক প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে এই সময়োপযোগী করে তোলার অর্থ তাদের বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এই সব নয়। এরই সঙ্গে অনেক গভীরে অতি সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা। আরো স্পষ্ট করে বলা চলে, তা হলো, ব্রাহ্মণদের নবলব্ধ য়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে বুদ্ধিজীবী হিসেবে গড়ে তোলা, এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের যজমানী বা বিবাহ-ব্যবসায়ের পরিবর্তে আরো অধিক লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্যে লিপ্ত হ'তে উৎসাহ দেওয়া। সমাজে প্রকৃত উৎপাদনকর্মের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগ, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আংশিক ভাবেও তাদের স্পর্শ করে না। কালগঙ্গা দূর থেকেই এই সংস্কার-রঙ্গ প্রত্যক্ষ করে।

আরো লক্ষণীয়, বিধবাবিবাহের প্রবর্তনেই সমাজে নারীর মর্যাদা সরাসরি প্রতিষ্ঠিত হয় না। একই সময়ে মোসলেম সমাজে বিধবা-বিবাহ চালু থাকলেও সেখানে নারীর স্থান এতটুকু উন্নত ছিল না। অনেকটা আসবাবপত্রের মতই তাঁদের গণ্য করা হতো। বিধবাবিবাহ চালু থাকার অর্থ এ নয়, যে একমাত্র তার ফলেই নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সমাজে স্বীকৃতি পায়। আর নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না হলে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় সামান্যই। বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রেমনির্ভর নয়, প্রয়োজন নির্ভর। এ প্রয়োজন যতটা নারীর নিজস্ব, তার চেয়ে অনেক বেশি সমাজের; যে সমাজ পুরুষশাসিত

ও উচ্চবর্ণ হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। বিদ্যাসাগর এক বিরাট মানুষ হলেও ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' এই কথাটাই যেন মনে করিয়ে দেয়।

অবশ্য বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহের বিরোধিতাই বিদ্যাসাগর-কীর্তির সবটুকু নয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। তবে সাফল্যই যদি সার্থকতার একমাত্র পরিমাপ হয়, তা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান কীর্তি নিঃসন্দেহে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্। আজকের মহাবিদ্যালয়ের প্রাথমিক রূপটিই ফুটে ওঠে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। যে শিক্ষাব্যবস্থা আজ এদেশে প্রচলিত বিদ্যাসাগর পরিচালিত এই বিদ্যানিকেতন তার ভিত্তিকে মজবুত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাসাগরচরিতে বলেন, "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁর অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন···মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষণ করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়।···"

মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্-এর মত বিরাট এক শিক্ষায়তন বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় সে যুগে গড়ে তুলতে পারা অতুলনীয় কর্মদক্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কর্মদক্ষতা কাদের মঙ্গল আনে? রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি' তার সঙ্গে কি কোন কালোত্তীর্ণ

শ্রেয়োবোধ যুক্ত হয় ? না কি তা সাময়িকীর বরমাল্যকেই পরম পাওয়া বলে মানে ? যে শিক্ষাব্যবস্থা আজ এদেশে চালু রয়েছে কোন সৃজনশীল কর্মে তা যথেষ্ট প্রেরণা জোগায় না। জীবনে জীবন যোগ তার ধর্ম নয়, বিচ্ছিন্নভাবে কিম্ভূতকিমাকার এক 'ভদ্র' শ্রেণী গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। মানুষকে এই শিক্ষা যতটা কাছে টানে, দূরে ঠেলে তার চেয়ে অনেক বেশি। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত। শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন তার মেজাজ ও চারিত্র্যকে প্রভাবিত করে। বৃহৎ কোন সামাজিক কল্যাণ তার সাধ্যে কুলোয় না ; নিষ্ঠুর এক অন্যায়ের দিকেই তা সমাজকে ঠেলে দেয়। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত এই অন্যায়কে মেনে নিয়েই মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্ গড়ে ওঠে। তার কর্ণধার হয়ে বিদ্যাসাগর অনিচ্ছায় এক সামাজিক অপকর্মের অন্যতম নায়ক হয়ে পড়েন।

তবে কি আমরা এই কথাটিই মানতে বাধ্য হবো যে উনিশ শতকে সমাজদেহে যাঁরা অসুস্থতার বীজ বপন করেন, সেই সব চতুর কীর্তিমানদের সারিতেই বিদ্যাসাগরের মত এক বিরাট মানুষ আপনার ঠাঁই করে নিয়ে তুষ্ট থাকেন ? ইতিহাসে কারো মূল্যায়ন যদি শুধু তার সফল কীর্তির ওপর নির্ভর করে, তবে না মেনে পারিনে যে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ সাফল্য কোন সুদূরপ্রসারী কল্যাণের সূচনা করে না। সমকালের হাতে পুরস্কার পেলেও তারা অল্পপ্রাণ। মহাকালের প্রসাদ তাদের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু এই কি সব ? ইতিহাসের মূল্যায়ন কি শুধুই সাফল্যনির্ভর ? ব্যর্থতা কি তার বুকে কোন চিহ্নই রাখে না ? তা'হলে এক যুগের ব্যর্থতা অন্যযুগের চরিতার্থতায় প্রেরণা জোগায় কেমন করে ? প্রকৃতপক্ষে সাফল্য ও ব্যর্থতা, উভয়কে একসঙ্গে নিয়েই ইতিহাসের পথ চলা। একটি ছেড়ে অন্যটির পক্ষপাতিত্ব তার ধর্ম নয়। বিদ্যাসাগর যদি কালকে অতিক্রম করে ইতিহাসে পদচারণার অধিকার পেয়ে থাকেন, তবে তা যতটা তাঁর

সাফল্যের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর ব্যর্থতার জন্য। যা তিনি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কাল পিছিয়ে থাকায় করতে পারেন নি, তাকেই ভাবীকাল পরমশ্রদ্ধায় আপনার বলে দু'বাহু বাড়িয়ে তুলে নিয়েছে। তাঁর জীবনধারা যদি বহমান কালগঙ্গায় মিশে গিয়ে থাকে, তবে সে এই কারণেই। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাঙলার প্রথম পরিপূর্ণ মানুষ, বোধহয় একমাত্র মানুষ, কিন্তু ব্যর্থ মানুষ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরিচালনা ও তাঁর শিক্ষাদর্শ সবসময়ে একই খাতে বয়ে যায়নি। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্ ছাত্রদের যে ধরনের শিক্ষা দেয়, তা যে মানুষ হবার শিক্ষা নয়, এ সত্য বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে চার্লস্ ক্যামেরন ও চার্লস উড্ এদেশের শিক্ষা কাঠামোকে যেভাবে গড়ে তুলবার নির্দেশ দেন তাতে মৌলিক চিন্তার ঔৎকর্ষের চেয়ে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় চাকুরির প্রয়োজন অধিকতর গুরুত্ব পায়। ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকুরির বাজারে প্রতিযোগিতায় জেতে; তারাই সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিদ্যাসাগরের অন্তরের সমর্থন ছিল না। তিনি নিজেই এক সময়ে বিদ্রূপ করে বলেছেন, "আমাদের যে সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,—দেখাইয়া দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি-কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এণ্ট্রান্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ বা এম. এ. হইয়া বেরোয়, কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈয়ারী কি না!"[৭] ঔপনিবেশিক পরিবেশে যে এমন শিক্ষাব্যবস্থার

পরিবর্তন সম্ভব নয়, একথা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তবে অসার জেনেও বিদ্যাসাগর তারই শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, কতিপয় মানুষের আংশিক শিক্ষা সব মানুষের অশিক্ষার চেয়ে ভাল। সমাজের সব মানুষকে পৃথকভাবে না নিয়ে একত্রে ধরলে যে এই যুক্তির ফাঁকি ধরা পড়ে, তা বোধহয় তিনি ভেবে দেখেন নি।

বিদ্যাসাগরের নিজস্ব শিক্ষাদর্শে কিন্তু এমন কোন ফাঁকি ছিল না। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা, মৌলিক চিন্তার বিকাশে উৎসাহ দেওয়া ও শিক্ষাকে সব রকমের ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে তার বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ মানবিক আদর্শের প্রকাশ ঘটানো—এই ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মূল কথা। বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে শিক্ষাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তার উল্লেখ আছে।[৮] সেখান থেকে আমরা জানতে পারি, বাঙলা ভাষার বিস্তার ও সুব্যবস্থার ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন, তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না। সম্পূর্ণ শিক্ষাই যাতে বাঙলা-ভাষায় দেওয়া যায়, তার জন্যে তিনি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এর জন্যে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানেরও বাঙলা-ভাষায় শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব বিষয় পড়াবার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন, তার ভেতরে রয়েছে জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণ ও কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। মাতৃভাষার মাধ্যমে মুক্তবুদ্ধির চর্চাই যে মানুষের চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে ও তার আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে, একথা এদেশে বিদ্যাসাগরই প্রথম উপলব্ধি

করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই এদেশে আজ পর্যন্ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্যে বাঙলা ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। হয়ত' বাঙলায় পাঠ্যপুস্তক আরো অনেকে লিখেছেন। কিন্তু শুদ্ধ মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন শুধু একজন। অবশ্য ইংরেজিকে বিদ্যাসাগর বিদেশী ভাষা বলে বর্জন করেন নি। আর সবাই বর্জন করুক, এ'ও তিনি চাননি। য়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচয় পাবার জন্যে ইংরেজি জানবার প্রয়োজন ছিল। তাঁর ইংরেজি শেখার ও শেখাতে চাইবার উদ্দেশ্য ছিল বাঙলাভাষা ও বাঙালী মনের উন্নতি সাধন। বাঙলা ভাষাকে ধারণ ও বাহনক্ষম করে য়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও তিনি তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ক্যামেরন ও উডের পরামর্শে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ডিগ্রি দেবার কারখানা স্থাপিত হলো, তা অবহেলা করলো মাতৃভাষাকে, উপেক্ষা করলো স্বাধীন চিন্তার প্রয়াসকে। ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বাঙালী নকলনবিশ, স্বার্থপর, মেরুদণ্ডহীন এক আজব প্রাণীতে পরিণত হলো। সমাজ যা হলো, তা বিদ্যাসাগর চাননি। বিদ্যাসাগর যা চেয়েছিলেন তা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষা করে থাকে। কালগঙ্গা বয়ে চলে সেখানেই।

শুধু শিক্ষাদর্শে নয়, সমস্ত মানবিক ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের চিন্তা তাঁর বৃত্তকে অতিক্রম করে সমগ্র মানবসমাজকে ধারণ করে। তাঁর নিজস্ব কালে এইসব চিন্তার বাস্তব সামাজিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর শুদ্ধ মানবিক আদর্শকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছেন। এই মেনে চলায় কোন আপোস ছিল না, ফাঁকি ছিল না। হয়ত' কোন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে তারা তুমুল হয়ে ওঠেনি, তবু এইসব কর্মেই বিদ্যাসাগর নিজেকে অতিক্রম করেছেন,

শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। সমাজের সুবিধাভোগী লোকেরা যাকে তাঁর ওপর থেকে বর্ষিত দয়া বলে দূরে ঠেলেছেন, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজ ব্যয়ে অন্নসত্র খুলেছেন। তাঁর লোকজনদের কড়া নির্দেশ দিয়াছেন, "যতটাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন অভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খাইতে পায়।"[৯] কিন্তু এই সব নয়। প্রচুর ধনসম্পদ থাকলে দাতা হতে পারেন অনেকেই। এর ভেতরে তেমন কোন মহত্ত্ব নেই; বরং অনেক সময়ে মহত্ত্ব কেনার গ্লানি আছে। দাতা যখন সাহায্যপ্রার্থীকে ভিখারির মত গণ্য করেন, তখনই এই গ্লানি প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোকে বিদ্যাসাগর তুচ্ছ জ্ঞান করেননি, বরং তাদের পুরো মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরজীবনীকার লিখছেন, "ইতরজাতীয় দরিদ্র লোকদের প্রতি পাছে কোন প্রকার অযত্ন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নিজে দুঃখী ও দুঃখিনীর মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন। হাড়ি ডোম প্রভৃতি ইতর জাতীয় লোকদের রুক্ষ মাথায় তৈল দিতে কেহই অগ্রসর হইত না। তাই তিনি নিজ হাতে তৈল লইয়া তাহাদের মাথায় মাখাইয়া দিতেন।...যে অসংখ্য স্ত্রীলোক এই ছত্রের অন্নে প্রাণ ধারণ করিত, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সন্তান সম্ভাবনা ছিল। গৃহে থাকিলে প্রসবের প্রাক্কালে এদেশে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে অন্নসত্রেই সেই সকল অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। ইহার কারণ এই যে, গরীব লোক, গৃহে পরিজন পরিবেষ্টিত থাকিলে, যে সকল অনুষ্ঠানে সুখানুভব করিতে পায়, দুর্দিনে অন্নসত্রে আছে বলিয়া, সে সুখে বঞ্চিত হইবে কেন?"[১০] জাতি, ধর্ম ও অবস্থা নির্বিশেষে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানানো, এই হলো বিদ্যাসাগরের সকল কর্মের মূল কথা। তাঁর কাজের তাৎপর্য তাঁর

কালের মানুষ বুঝে উঠতে পারে নি। আজকের মানুষও কি ঠিক ঠিক বুঝেছে? কিন্তু সমাজের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও বর্জনীয় মনে হলেও এইসব কাজই বিদ্যাসাগরকে তাঁর নিজস্ব গণ্ডি থেকে মুক্তি দেয়।

বিদ্যাসাগর জানতেন, যে সমাজে তাঁর অবস্থান, তা অসার ও অসুস্থ। উৎপাদন-বিমুখ 'ভদ্র'লোকের এই সমাজের প্রতি তাঁর মনে তীব্র ধিক্কার জন্মেছিল। গভীর ক্ষোভে তিনি বলেছেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহুবিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।..."[১১] জীবনের মধ্যাহ্ন বেলাতেই যে তাঁর সমাজসংস্কারের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে তা একেবারে অহেতুক নয়। তখনই তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবেশে তাঁর অবস্থান, তার নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নির্লজ্জ শোষণের ও প্রতিকারহীন অবিচারের ভেতরে সমাজকে অপ্রতিরোধ্য বেগে সোজা ঠেলে দেয়। তাঁর একক ইচ্ছার প্রেরণা বা একক শক্তির চেষ্টা তার গতিরোধ করতে পারে না। তাই কলকাতার কর্মচাঞ্চল্য থেকে দূরে কার্মাটাড়ে চাষী, শ্রমিক, সাঁওতালদের ভেতরে, বর্ধমানে গরীব মুসলমানদের ভেতরে, তিনি নীরবে মনুষ্যত্বের আরাধনা করে গেছেন। একথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হননি যে "তোমাদের মত ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভাল।"[১২] মাটির কাছাকাছি এই সব মানুষকে তিনি তাঁর একক প্রচেষ্টায় কোন বৃহত্তর চরিতার্থতায় উত্তীর্ণ করতে পারেননি। কাল তাঁর অনুকূল ছিল না। তিনি পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু এ পরাজয় নিজের মনের অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, অদৃষ্টের

হাতে অকারণ মার খাওয়াও নয়। মহাকাব্যের মহানায়কের পরাজয়ের মত এই পরাজয়, যা বিস্মৃত করে না, অমর করে।

কালগঙ্গা বিদ্যাসাগরের বিপুল ব্যর্থতাকে পরম শ্রদ্ধায় ভবিষ্যতের ঘাটে বয়ে নিয়ে চলে।

শকুন্তলা ও সীতার বনবাস

মুখলেসুর রহমান

অতিশয়োক্তি না করেও একথা বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর জীবদ্দশায় বিদ্যাসাগর মোট ৫২খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনীকার।[১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর তালিকাটি[২] উপরোক্ত সংখ্যাটিকে সমর্থন করে। কিন্তু, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান-প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী[৩] দৃষ্টে মনে হয় বিদ্যাসাগরের জীবনীকার এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের তালিকা থেকে বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভারের Marriage of Hindu Widows (1856), পাঠমালা (১৮৫৯), রামের অধিবাস (১৯০৯), বাল্মীকি রামায়ণ (১৮৬০), এই চারখানি পুস্তক বাদ পড়ে গেছে। তাছাড়া পরবর্তী দুজনের কেউই পূর্বোক্ত লেখকদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে[৪] বিদ্যাসাগরের রচনার তালিকাভুক্ত করেননি।

জীবনীকারের মতে বিদ্যাসাগরের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১৭ খানি সংস্কৃত, ৫ খানি ইংরেজি এবং ৩০ খানি বাংলা।[৫] বাংলা ৩০ খানির মধ্যে ১৪ খানি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক, ৩ খানি সম্পাদিত গ্রন্থ এবং ১৪

খানি সাধারণপাঠ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী ইংরেজি পুস্তকের সংখ্যা হওয়া উচিত ৬ খানি আর বাংলা পুস্তকের ৩৩ খানি।

বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই চারিখানি বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্মৃতি বা পাঠ্য পুস্তক"।[৬] শকুন্তলা, সীতার বনবাস গ্রন্থ দুখানি সম্বন্ধে মন্তব্য হল, "অন্য ভাষায় (সংস্কৃত) রচিত গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল"।[৭] বেতালপঞ্চবিংশতি আর ভ্রান্তিবিলাসের অনুরূপ শকুন্তলা আর সীতার বনবাসকে অনুবাদমূলক রচনা বলে গণ্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয়।[৮]

শকুন্তলার প্রকাশকাল ২৫শে অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১১ ডিসেম্বর, ১৮৫৪ সাল। এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "ভারতবর্ষের সর্ব প্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলম সংস্কৃত ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল"।[৯] বিজ্ঞাপনটি পাঠ করলে স্বভাবতই মনে হয়, অভিজ্ঞান শকুন্তলম আদর্শ হলেও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা তার অনুবাদ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি অনুবাদ কর্ম হলে বিজ্ঞাপনে তার স্বীকৃতি থাকত, যেমন আছে কথামালার ভূমিকায়ঃ "...গল্পগুলি অতি মনোহর—পাঠ করিলে আনুষঙ্গিক সদুপদেশলাভ হয়...কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবে না; এজন্য, ৬৮টি মাত্র অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল"।[১০] কথামালার ৩৭শ সংস্করণের

বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন, "এই সংস্করণে অশ্ব ও অশ্বপাল, বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক, কুক্কুরদষ্ট মনুষ্য, পথিকগণ ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জল-দেবতা, দুঃখী বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নূতন অনুবাদিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে"।[১১]

শকুন্তলা বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা, একথা অবশ্য আমাদের বক্তব্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনুবাদ অর্থে সচরাচর যা বোঝায়, এ গ্রন্থখানি ঠিক সেই শ্রেণীর নয়। মূল নাটকের সাতটি অঙ্কের অনুসরণে শকুন্তলার সাতটি পরিচ্ছেদ রূপ নিয়েছে ঠিক, নাটকের ঘটনাক্রম আর সংলাপের অনুসরণও করেছেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু মূল থেকে যা বর্জন করেছেন, তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করলেও শকুন্তলার রচনা কোথাও অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট নয়, বা তার ভাষার স্বচ্ছতা এবং কাহিনীর রস কোথাও ব্যাহত হয়নি। এর কারণ হল বিদ্যাসাগরের অসাধারণ শিল্পসচেতনতা। রসের রাজা কালিদাসের রচনার সঙ্গে এখানে বিদ্যাসাগর যে আধুনিক মনোভাব, পরিমাণবোধ আর স্বাভাবিকতার সমন্বয় সাধন করেছেন, একমাত্র সৃজনধর্মী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হলেও শকুন্তলার রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগরের নিজস্ব, কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত নয়। মূল নাটকের প্রথম তিন অঙ্কে উদ্বেলযৌবনা শকুন্তলা, কৌতুকে উচ্ছল সখীদ্বয়, নবপুষ্পিতা বনতোষিণী, সৌরভভ্রান্ত মূঢ় ভ্রমর, নায়ক মহারাজ দুষ্মন্ত এবং রাজবয়স্য মাধব্যকে আশ্রয় করে কালিদাস কয়েকটি সৌন্দর্যমদমথিত দৃশ্য দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর শকুন্তলায় এই দৃশ্যগুলি বা তৎসংক্রান্ত ঘটনাগুলি বিশেষ বর্জন করেননি, যা করেছেন তা হল কালিদাসের বাস্তবধর্মী, অতিরিক্ত মাত্রায় আদিরস ঘেঁষা বর্ণনার আতিশয্য।

মূল নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ঋষিদের আতিথ্যস্বীকার করে তপোবনে প্রবেশ করবার পর বৃক্ষান্তরাল থেকে শকুন্তলা ও তার দুই প্রিয় সখীর অন্তরঙ্গ আলাপ শুনছেন[১২] :

> "শকুন্তলা : অনুসূয়ে, আমার পরিধান বল্কল অত্যন্ত আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে, তাহাতে অতিশয় কষ্ট হইতেছে, অতএব তুমি তাহা শিথিল করিয়া দাও।
>
> অনুসূয়া : (শিথিল করিয়া বাঁধিয়া দিল।)
>
> প্রিয়ম্বদা : (সহাস্যে) সখি, এ বিষয়ে তুমি পয়োধর বিস্তারের হেতুভূত আপন যৌবনারম্ভের প্রতি তিরস্কার কর। অন্য কাহারও দোষ নাই।"

প্রিয়ম্বদার কথা শুনে রাজার স্বগতোক্তি :

> "প্রিয়ম্বদা ঠিক বলিয়াছে। শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থি দ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবলীন দেহ পরিপক্ক, অতএব পাণ্ডুবর্ণপত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায় আপনার কান্তির পুষ্টি সাধন হইয়া উঠিতেছে না। (আবার বিকল্প করিয়া কহিলেন) অথবা বল্কল শকুন্তলার শরীরের অযোগ্য হইলেও উহা দ্বারা তাঁহার অলঙ্কার-শোভা পর্যাপ্তরূপে পুষ্টি সাধন করিতেছে না, এমন নহে। ...এই তন্বঙ্গী শকুন্তলা জঘন্য বল্কলেও অতিশয় মনোহারিণী হইয়াছেন...মৃগনয়নার বল্কল কঠিন অথচ কান্তরূপ প্রস্ফুটিত পদ্ম, কমলিনীর কর্কশ বৃন্তসমূহের ন্যায় মনে অল্পমাত্রও অপ্রীতি উৎপাদন করে না।"

কিছু পরেই রাজার পুনরুক্তি :

> "প্রিয়ম্বদা প্রকৃতই বলিয়াছে, যেহেতু, শকুন্তলার অধর নবপল্লবের ন্যায় রক্তবর্ণ, বাহুদ্বয় কোমল শাখাযুগলের ন্যায় এবং কুসুমের ন্যায় স্পৃহনীয়, যৌবন যেন সমস্ত অঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

বিদ্যাসাগরের শকুন্তলায় দুষ্মন্তের স্বগতোক্তি বা সখীযুগলের আলাপের মধ্যে নায়িকার পয়োধর বিস্তার কিংবা বিশাল স্তনযুগলের উল্লেখ নেই। শকুন্তলার যৌবন-পুষ্ট দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কালিদাস যেখানে বিশেষভাবে সচেষ্ট, সেখানে বিদ্যাসাগর অদ্ভুত সংযম ও পরিমাণবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিমিতবোধের পিছনে কোন গোঁড়ামি নেই, আছে শালীনতা, যা উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবোধ হতে সৃষ্ট। শকুন্তলা ও তার সখীযুগলের রূপলাবণ্য দর্শনে রাজার স্বগতোক্তি ঃ

> "ইহারা আশ্রমবাসিনী, ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল।" ১৩

শকুন্তলাকে দেখে রাজা বলছেন ঃ

> "এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ এই সর্বাঙ্গসুন্দরী, বল্কল পরিধান করিয়াও যারপরনাই মনোহারিণী হইয়াছেন।"১৪

বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার নায়ক দুষ্মন্ত নায়িকার রূপমুগ্ধ, কিন্তু তাঁকে দর্শন করবামাত্র কামার্ত নন। এখানে শকুন্তলা আশ্রম বালিকা, সরলা। শকুন্তলা ও তাঁর সখীদ্বয়ের কথাবার্তায় যৌবনসুলভ যে চাপল্য প্রকাশ পেয়েছে, তা স্বাভাবিক, অতি প্রগল্‌ভতায় দুষ্ট নয়। অশালীন বিবেচনায় শকুন্তলার পরিধেয় বল্কল শিথিল করা এবং প্রিয়ম্বদা কর্তৃক তাঁর পয়োধর বিস্তারের কথা বিদ্যাসাগর বর্জন করেছেন, কিন্তু তাতে কাহিনীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।

মাধবীলতায় জলসেচনরত শকুন্তলার অধরে উপবেশন করবার জন্য একটি নাছোড়বান্দা ভ্রমরের আবির্ভাবে শকুন্তলার ভয় ও অস্থিরতা দর্শনে দুষ্মন্তের প্রতিক্রিয়া, বৃক্ষান্তরাল থেকে তাঁর আত্মপ্রকাশ, শকুন্তলা ও তার সখীদ্বয়ের সঙ্গে রাজার কথোপকথন, দুষ্মন্তকে দেখে শকুন্তলার মনে

প্রেমের সঞ্চার, এ ঘটনাগুলির বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্র মূল নাটককে অনুসরণ করেছেন। শকুন্তলার পরিচয়, তার জন্মবৃত্তান্ত, রাজা শকুন্তলার এবং শকুন্তলা রাজার মনোভাব জানবার প্রচেষ্টা এ সবও মূল নাটক-অনুসারী, কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। জলসেচনে ক্লান্ত শকুন্তলার অবস্থা বর্ণনা করে প্রিয়ম্বদার প্রতি মূল নাটকে রাজার উক্তি ঃ

> "ভদ্রে! বৃক্ষে জলসেচন করা হেতু এই মাননীয়া শকুন্তলাকে পরিশ্রান্তার ন্যায় অবলোকন করিতেছি, আর ইহাও দেখ, বৃক্ষে পুনঃপুনঃ জলসেচনজন্য ইহার স্কন্ধদ্বয় দুর্বল ও অবনত হইয়াছে এবং হস্ততল অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বারংবার জলকলস উত্তোলন করায় নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক হইয়া এখনও স্তনদ্বয়কে কম্পিত করিতেছে।"[১৫]

বিদ্যাসাগর এই উক্তিটি অশালীন, অশ্লীল বিবেচনায় গ্রহণ করেন নি। শকুন্তলায় রাজার উক্তি তাই রূপ নিয়েছে ঃ

> "তাপস কন্যে! তোমার সখী বৃক্ষ সেচনদ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন; আর উঁহাকে পল্বল হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা উচিত হয় না।"[১৬]

এখানে কালিদাসকে যথাযথ অনুসরণ না করে বিদ্যাসাগর শকুন্তলার ক্লান্তিদর্শনে বিচলিত রাজার মনোভাব আতিশয্যবিহীন, সংযত ভাষায় প্রকাশ করেছেন, কাহিনীর শিল্পগুণের এতে কোন মর্যাদাহানি হয় নি।

শকুন্তলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম পরিচ্ছেদের ন্যায় মূল নাটকের উপাখ্যান অনুসারী। কিন্তু বাহুল্য ও অশালীনতাবর্জিত। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বয়স্য মাধব্যের সঙ্গে শকুন্তলার বিষয়ে আলাপ আলোচনার সময় রাজার যে রূপ আমরা দেখি, তা কামপীড়িত ব্যক্তির। দুষ্মন্ত বহুপত্নীক, কিন্তু তাঁর সম্ভোগ ইচ্ছার কোন বিবৃতি হয় নি। শকুন্তলাকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর ভাবভঙ্গীতে তিনিও তাঁর

প্রতি অনুরক্তা উপলব্ধি করে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা রাজার মনে প্রবলাকার ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাজার উক্তিতে তাঁর মনোভাব বিশেষ স্পষ্ট ঃ

"সেই শকুন্তলার রূপ ঠিক যেন অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় নির্মল ও নখচ্ছেদ-বিরহিত নূতন কিসলয়ের সদৃশ এবং অপরিহিত রত্নের তুল্য ও যেন আস্বাদ-বিরহিত অভিনব মধুস্বরূপ হইতেছে, এই পৃথিবীতে বিধাতা কোন ব্যক্তিকে যে ইহার উপভোক্তা করিবেন, তাহা কিছুতেই বলিতে পারিতেছি না।"[১৭]

শকুন্তলা অনাঘ্রাতা কুসুম তিনি নখচ্ছেদবিরহিত[১৮] কিসলয়, অব্যবহৃত রত্ন এবং অনাস্বাদিত মধুর ন্যায়; তাঁর নির্মল সৌন্দর্য কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সম্ভোগ করবে আশঙ্কায় রাজার যে দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে কালিদাস অন্যত্র বর্ণনা করেছেন "প্রিয়াবিরহে একান্ত কাতর মদনানলে সন্তাপিত"[১৯] অবস্থা বলে। 'শকুন্তলা'র এই অংশটিতে রাজা বলেছেন ঃ

"তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুমস্বরূপ, নখাঘাতবর্জিত নবপল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্নস্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্য-রাশির অখণ্ড ফলস্বরূপ; জানি না, কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্মলরূপের ভোগ আছে।"[২০]

বিদ্যাসাগরের রচনানৈপুণ্যে প্রাসঙ্গিক অংশটিতে শকুন্তলাকে লাভ করবার জন্য রাজার উৎকণ্ঠার শোভন প্রকাশ, কামার্ত মনোভাবের নয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে রাজার উক্তির পিছে বিদূষকের উক্তি ঃ

"আপনি অতি সত্বরেই গমন করুন, যাবৎ সেই শকুন্তলা ইঙ্গুদী তৈলধারা চিক্কণ শীর্ষ কোন তাপসের হস্তে পতিত না হন,"[২১]

বিদ্যাসাগর স্থূল বিবেচনায় বর্জন করেছেন যেমন করেছেন রাজার আর একটি উক্তির অংশবিশেষকে ঃ

"যখন সখীদ্বয়ের সঙ্গে নির্জনে গমন করেন, তখন তিনি অঙ্গভঙ্গীর সহিত আমার প্রতি অতিশয় কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ...কিছু পদ গমন করিয়া 'কুশাঙ্কুরদ্বারা চরণ তল ক্ষত হইয়াছে,' এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলেন ও তাঁহার পরিহিত বল্কল শাখায় সংলগ্ন না হইলেও বল্কল মোচন করিবার ছলে স্বকীয় বদনাবরণও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।"[২২]

এর পরিবর্তে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলায় আছে ঃ

"আবার প্রস্থানকালে কতিপয় পদমাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; আর কুরুবক শাখায় বল্কল মোচনছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে, বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।"[২৩]

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের এই অংশটিতে শকুন্তলার সরলা, তাপস-কন্যার রূপটি অনুপস্থিত। তিনি যেন চতুরা নায়িকা, নায়কদর্শনে রতিবিহ্বলা, অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে তা কৌশলে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা তাঁর প্রথম প্রেমের প্রেরণায় কৌতূহলী, সখীদের অগোচরে দুষ্মন্তকে আরও কিছুক্ষণ দেখবার জন্য যে ছলনার তিনি আশ্রয় নিচ্ছেন, তার মধ্যে চতুরতার তুলনায় অনভিজ্ঞতাই বিশেষরূপে স্পষ্ট।

অভিজ্ঞান শকুন্তলমের তৃতীয় অঙ্কে রাজা এবং শকুন্তলার পরস্পরকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, লতামণ্ডপে উভয়ের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ভাষায় আদিরসের আধিক্য সুস্পষ্ট। শকুন্তলাকে অসুস্থ বিবেচনা করে তার সেই পীড়াকে মদনপীড়া বলে সাব্যস্ত করছেন রাজা দুষ্মন্ত ঃ

"হা ঈশ্বর! এমন সুধারূপিণীর শরীর-মনেও কি ব্যাধির অধিকার? (মনে মনে বিতর্ক করিয়া) তবে কি ইহা আতপদোষ অথবা আমার চিত্তে যেরূপ, সেই স্মরসন্তাপ? (অভিলাষ সহকারে অবলোকন পূর্বক) সন্দেহে প্রয়োজন

নাই, যেহেতু, ইহার স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে উশীরাণু লেপন, করা হইয়াছে, একটি মাত্র মৃণালবলয়, তাহাও শিথিল হইয়াছে, অতএব প্রিয়ার এই দেহ পীড়াযুক্ত হইলেও অত্যন্ত মনোহরভাব ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ কামসন্তাপ ও নিদাঘ-সন্তাপ তুল্য হইলেও গ্রীষ্মসন্তাপে সন্তপ্ত যুবতীগণের শরীরে এরূপ কমনীয়তা বিদ্যমান থাকে না, অতএব ইহা কামসন্তাপই বটে, সন্দেহ নাই।"[২৪]

বিদ্যাসাগরের রচনায় এই অংশটির রূপান্তর হয়েছে ঃ

"ইহাকে আজ নিরতিশয় অসুস্থ শরীর দেখিতেছি। কিন্তু, কি কারণে ইনি এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাববশতঃ ইহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইহারও তাহাই। অথবা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে।"[২৫]

শকুন্তলার পীড়া গ্রীষ্মতাপসঞ্জাত নয়, এটুকু বলেই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হয়েছেন। শকুন্তলার পীড়া বিরহসঞ্জাত, একথা বললে শালীনতা ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু যতটুকু বললে শকুন্তলার অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা সম্ভব, তার বেশি না বলে বিদ্যাসাগর সংযত শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন এখানে।

মূল নাটকের এই অঙ্কটিতে রাজার উক্তির মধ্যে শকুন্তলার স্তন এবং উরুর উল্লেখ রয়েছে একাধিকবার। রাজা তাকে সম্বোধন করেছেন 'করভোরু' বলে। লতাবিতানে অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদার অনুপস্থিতির সুযোগে শকুন্তলার প্রতি রাজার আচরণ ও উক্তি বেশ কিছুটা বেসামাল। শকুন্তলা তাঁর অনুরাগিণী জেনে তাঁকে নিশ্চয়ই কামপীড়িতা বলে সন্দেহ করছেন রাজা। তাঁর স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করে অধৈর্য রাজা স্বগতোক্তি করছেন ঃ

"যে কুমারীগণ অতিশয় ঔৎসুক্য থাকিলেও বল্লভের প্রার্থনার প্রতিকূলবর্তিনী হন এবং পরস্পর আলিঙ্গনসুখের আকাঙ্ক্ষা করিলেও স্বীয় সঙ্গ প্রদানে কাতরা

হয় ; অতএব অবসরপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া কেবল মদন কর্তৃকই যে নিপীড়িতা, তাহাও নয়, আবার কালক্ষেপপ্রযুক্ত মদনকে সবিশেষ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।"২৬

বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় এ অংশটি বর্জন করে রাজার চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। নাটকের এই অঙ্কটিতে শকুন্তলার হাতে রাজার মৃণালবলয় পরিয়ে দেওয়া এবং তার চোখে ফুৎকার দেবার ছলে অধর চুম্বনের প্রচেষ্টা বর্ণনা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় মুখ চুম্বনের প্রচেষ্টা নাই, আছে প্রেমিক প্রেমিকার কৌতুকপূর্ণ বাক্য বিনিময়।

বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি মূল নাটকের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের আখ্যানভাগ অবলম্বী। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ দোষে দুষ্ট নয়। বিদ্যাসাগরের রচনায় ভাষার যে সাবলীল গতি, যে স্বাভাবিকতা আমরা দেখি তা আক্ষরিক অনুবাদে অনুপস্থিত। আমরা যথার্থ মনে করি, শকুন্তলা রচনায় মূল উপাখ্যানের গতিকে ব্যাহত না করে বিদ্যাসাগর তাকে নিজের প্রয়োজন মত সম্পাদন করে নিয়েছেন। যথা—

"কিয়ৎক্ষণে, তাঁহারা (অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা) কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, স্পন্দনহীনা, মুদ্রিতনয়না, চিত্রার্পিতার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ম্বদা কহিলেন, অনুসূয়ে! দেখ, দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে ; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে ?"২৭

ভাষার এই স্বচ্ছতা আর সাবলীলতা আক্ষরিক অনুবাদে কি সম্ভব।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনা বিদ্যাসাগরের লেখনী-প্রসাদে সত্যিই করুণ মধুর রসে ভরা একটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এ যেন আশ্রমবাসিনী কন্যার পতিগৃহে যাত্রা নয়, বাঙালী গৃহস্থ কন্যার

শ্বশুরালয় গমনের দৃশ্য। আদরযত্নে লালিত কন্যা যেভাবে পিতামাতা, গুরুজন, ভাইবোন, বাল্যসখীদের বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে যাত্রা করে, এখানে শকুন্তলার ভূমিকা তার অনুরূপ। বিদায়কালে আবাল্য-পরিচিত গৃহাঙ্গণ, স্বহস্তে রোপিত দু'চারটি ফুল ও ফলের গাছ, বা কোনও গৃহপালিত জন্তুর জন্য তার প্রাণ স্বাভাবিকভাবেই কেঁদে উঠে। শকুন্তলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কালিদাস এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে ত্রুটি করেন নি। বিদ্যাসাগর এই দৃশ্যপ্রসঙ্গে মূল উপাখ্যানের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁর শিল্পীজনোচিত দৃষ্টি ও সহানুভূতি দিয়ে। তাই তাঁর রচনায় এই দৃশ্যটির বর্ণনা আমাদের মন ও হৃদয়কে বিশেষ অভিভূত করতে পেরেছে।

অভিজ্ঞান প্রদর্শনে ব্যর্থ শকুন্তলাকে রাজা যখন পত্নীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, সেখানে বিদ্যাসাগরের মূলাশ্রয়ী রচনা (৫ম পরিচ্ছেদ) তাঁর নিজস্ব শৈলরচনারীতিতে সার্থক। পরম আকাঙ্ক্ষিত পতির সহিত মিলনে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে প্রবঞ্চিতা শকুন্তলার ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। এই পরিচ্ছেদ রচনায় মূল নাটকের উপাখ্যানের যতটুকু গ্রহণ করা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর তাই করেছেন। শকুন্তলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ বিদ্যাসাগরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। অঙ্গুরীয় চোর সন্দেহে ধৃত ধীবর ও নগরপালের মধ্যে কথোপকথনকে আদৌ অনুবাদ বলে সন্দেহ হয় না। যথা—

"নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া ধরিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, আরে বেটা চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বল? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোরে দান করিয়াছেন?···ধীবর কহিল, আজ সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতর এই আঙ্‌টি দেখিতে পাইলাম। তারপর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমাকে ধরিলেন, আমি

আর কিছুই জানি না; আমাকে মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।"[২৮]

মূলকে ছাঁটকাট করে তার ভাষান্তরের পরেও যে তার সৌন্দর্য বা শিল্পগুণ মোটেই নষ্ট হয়নি, বরং অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে, মূল নাটকের প্রাসঙ্গিক অংশটির সঙ্গে উদ্ধৃতির তুলনামূলক পাঠ তা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে অনুতপ্ত রাজা দুষ্মন্তের মিলন দৃশ্যে মূল নাটকের প্রাসঙ্গিক অঙ্কটির (সপ্তম) মতই করুণ মধুর। কশ্যপ মুনির আশ্রমে সিংহশাবক তাড়নারত শিশু ভরতকে দেখে রাজার হৃদয়ে অপত্য স্নেহের আবির্ভাব, শিশুটি পুরুবংশজাত এবং রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত জেনে তাকে নিজ পুত্র সন্দেহে দুষ্মন্তের উৎকণ্ঠা বিরহক্লিষ্টা "বসনে পরিধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ" (মলিন ধূসর বসনা, নিয়মচর্যায় শুষ্কমুখী, এক বেণীধরা) শকুন্তলার আবির্ভাবে রাজার একাধারে হর্ষ, খেদ ও বিষাদ, তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য রোদন, শকুন্তলার নিকট মার্জনা ভিক্ষা, এ সমস্ত চিত্রণে বিদ্যাসাগর যে অপূর্ব মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মূলের সৌন্দর্য ব্যাহত না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আক্ষরিক অনুবাদের তুলনায় এই অংশের বর্ণনায় বিদ্যাসাগরের রচনা যে কতদূর স্বাভাবিক, সহজ ও সরল, রাজা ও শকুন্তলার কথোপকথনের করুণরস মূল নাটকের প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনায় কত বেশি স্পষ্ট, নীচের দুটি তুলনামূলক উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

"শকুন্তলা: আর্যপুত্র! এক্ষণে আপনি কিরূপে এই দুঃখভাগিনীকে স্মরণ করিলেন?

রাজা: প্রিয়ে! তোমার বিষাদশল্য উদ্ধার করিয়া তারপর বলিব। হে শোভনাঙ্গি! বাষ্পবিন্দু তোমার অধরদেশ পরিপীড়িত করিয়া নিপতিত

হইলেও পূর্বে আমি মোহবশে যাহা উপেক্ষা করিয়াছি, অদ্য তোমার কুটিল পক্ষ্মলগ্ন সেই বাষ্পবিন্দু মুছাইয়া দিয়া এক্ষণে আমার মনোগত অনুতাপ বিদূরিত করিব। (এই বলিয়া বাষ্পমার্জন করিয়া দিলেন)।"[২৯]

"তদ্দর্শনে শকুন্তলা অস্তব্যস্তে রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, আর্যপুত্র! উঠ, উঠ ; তোমার দোষ কি ; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এতদিন পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া, বাষ্পবারি পরিপুরিত নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যানকালে তোমার নয়ন যুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সব দুঃখ দূর করি এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার_শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল ; প্রবল প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল।"[৩০]

তুলনামূলক বিচারের স্বাভাবিক রায় হবে মূলের চেয়ে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার এই অংশটির রচনা শুধু অনেক বেশি স্বাভাবিক নয়, উপরন্তু মৌলিকতার সীমা স্পর্শ করেছে। যথেষ্ট বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে, প্রচুর অনুতপ্ত হয়েও মূল নাটকের পুনর্মিলনের দৃশ্যে দুষ্মন্ত শকুন্তলার অঙ্গ শোভা আর কুটিল পক্ষ্মের কথা উল্লেখ করছেন, তাতে কালিদাসের রচনানৈপুণ্য প্রকাশ পেলেও, আমাদের কাছে তা বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

দুই

সীতার বনবাসের প্রকাশকাল ১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১৭ অর্থাৎ এপ্রিল ১৮৬০-সাল। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত

উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।"[৩১] উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কটি সুদীর্ঘ এবং বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ এবং ৪৫শ সর্গের ঘটনাবলম্বনে রচিত। রামচন্দ্রের সুশাসন, সীতার গর্ভ, সীতার তপোবন দর্শনের ইচ্ছা, রামের নিযুক্ত গুপ্তচর কর্তৃক অযোধ্যা-নগরীর অধিবাসীদের সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশের সংবাদ প্রদান, তিন ভ্রাতাকে আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে সীতা সংক্রান্ত প্রজাবর্গের নিন্দাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা এবং শেষে তিন ভ্রাতার পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত স্বীকার করেও প্রজানুরঞ্জনের খাতিরে সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে পরিত্যাগ করে আসবার জন্য লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের আদেশ প্রদান, এই ঘটনাগুলি উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু। বিদ্যাসাগর নিজের সুবিধার্থে ঘটনাগুলি সময়ক্রম অনুযায়ী তিনটি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশ করেছেন। ভবভূতির নাটকের প্রাসঙ্গিক অঙ্কটির প্রথমাংশটি, যেখানে সূত্রধর ও নটের কথোপকথন রয়েছে, তিনি তার কিছুটা বর্জন করেছেন। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যাসাগর এই অংশের ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞানুষ্ঠান, সীতার পূর্ণ গর্ভাবস্থার কথা গ্রহণ করেছেন। সূত্রধর ও নটের কথোপকথনের মাধ্যমে সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে অযোধ্যায় জনসাধারণের সন্দেহ প্রকাশের কথা মূল নাটকের প্রারম্ভেই। অবশ্য এই সন্দেহের বা দোষাপবাদের সংবাদ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করা হচ্ছে তাঁর সদাসন্নিহিত ভৃত্য দুর্মুখের মাধ্যমে নাটকের প্রথম অঙ্ক কিছুটা অগ্রসর হবার পর। রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে মুনি ও মুনিপত্নীদের আশীর্বাদ বহন করে রামচন্দ্রের নিকট অষ্টাবক্রের আগমন সংবাদ নেই, কিন্তু উত্তররামচরিতে আছে এবং বিদ্যাসাগরও সীতার বনবাসের প্রথম পরিচ্ছেদে অষ্টাবক্র সংবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরম ধার্মিক, মুনি

ঋষিগণের সেবায় সর্বদা তৎপর রাজা রামচন্দ্র এবং তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী সীতার জন্য শুভেচ্ছা-বহনকারী অষ্টাবক্রকে নাটকের প্রথম অঙ্কেই উপস্থিত করবার পিছনে ভবভূতির যে উদ্দেশ্য ছিল তা অষ্টাবক্র ও রামের কথোপকথন[৩২] থেকেই স্পষ্ট হবে :

"রাম : তারপর, ভগবান বশিষ্ঠের কিছু আদেশ আছে কি?
অষ্টাবক্র : আছে বই কি। তাঁর বক্তব্য এই—"আমরা ত জামাতার[৩৩] যজ্ঞানুষ্ঠানে আবদ্ধ। তুমি বালক, নূতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ ; প্রজারঞ্জনে সর্বদা রত থাকিবে। যেহেতু, আমাদের বংশের প্রজারঞ্জনের যশই পরম ধন।"
রাম : ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য। এই আমার প্রজাপুঞ্জের মনস্তুষ্টির জন্য স্নেহ, দয়া সুখ—এমন কি, প্রাণপ্রিয়া জানকীকে পর্যন্ত যদি বিসর্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি ব্যথিত নহি।"

অষ্টাবক্রকে এখানে উপস্থিত করে রাজা রামচন্দ্রকে অন্যতম প্রধান কর্তব্য প্রজানুরঞ্জনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং রামচন্দ্রও প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন, প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি শুধু স্নেহ, দয়া, সুখ বিসর্জন দেবেন না, প্রয়োজন হলে তাঁর প্রাণপ্রিয়া সীতাকেও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবেন। নাটকের ঘটনার গতি কোন দিকে চলেছে, বা চলবে, তার আভাষ এখানে পাওয়া যাচ্ছে, আর পাওয়া যাচ্ছে রামের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তিনি অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ রাজা। বিদ্যাসাগর এই অংশটিকে তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে।

"রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম ; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্বদাই আমার শিরোধার্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজা-

লোকের সর্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জনের জন্য স্নেহ, দয়া বা সুখভোগ বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জন কার্যে ক্ষণকালের জন্যও অলস বা অনবহিত নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এরূপ না হইলেই বা আর্যপুত্র রঘুকুল-ধুরন্ধর হইবেন কেন?" ৩৪

এখানে বিদ্যাসাগর মূলকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অন্ধের মত নয়। তাঁর নিজস্ব অবদানই এখানে তাঁর রচনার অন্যান্য অংশের অনুরূপ আলোচ্য অংশটি মূলকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় সীতার উক্তিতে রামের বাক্যে তাঁর যেমন হর্ষ ও গৌরব বোধ প্রকাশ পেয়েছে, ভবভূতির নাটকে তা অনুপস্থিত? "এই জন্যই আর্যপুত্রকে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে"৩৫ সীতার এই উক্তি যেন ভদ্রতা রক্ষার জন্য কথার পিঠে কথা বলে মনে হয়।

আলেখ্যদর্শন বিষয়টি সীতার বনবাসের একটি বিশিষ্ট অংশ। এই অংশটি রচনায় বিদ্যাসাগর ভবভূতির মত ভারতবিখ্যাত কবিকে পরাস্ত করেছেন, যদিও এর উপাদান উত্তররামচরিত থেকেই সংগৃহীত। সার্থক নাট্যকার হলেও নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনায় ভবভূতি বিশেষ পটু ছিলেন না, অন্তত কালিদাসের মত ত' নয়ই। কিন্তু সীতার বনবাসের সাত পৃষ্ঠা থেকে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী চিত্রকূট অরণ্য, গোদাবরী তীরভূমি আর দণ্ডকারণ্যের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তাতে মনে হয় সরস্বতী কালিদাসকেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ করে বিদ্যাসাগরের লেখনী আশ্রয় করেছেন। দু'একটি তুলনামূলক দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

"রাম: দেখ, এই সেই সকল তপোবন—যেখানে বৃক্ষমূলে সংসার-বিরাগী গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক মুষ্টিমেয় তৃণধান্যে দিন যাপন করিতেন।

লক্ষ্মণ: ইহার পরেই দেখুন, কেমন ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত অরণ্য। ইহারই অভ্যন্তরে আবার প্রশস্ত গোদাবরী নদী কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে এবং জনস্থানারণ্যের মধ্যভাগে প্রস্রবণ নামক গিরি কেমন সততই মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার শ্যামলতাকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে।"[৩৬]

"রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"[৩৭]

ভবভূতি রামের মুখ দিয়ে পম্পাসরোবরের বিবরণ দেওয়াচ্ছেন:

"দেবি! আহা, এই সরোবরটি কি সুন্দর! এইখানেই রোদন করিতে করিতে আমার অশ্রুজলের আগমন ও নির্গমনের মধ্যবর্তী মুহূর্তকালের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, মল্লিকা নামক হংসশ্রেণী মহা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আপন আপন পক্ষ বিস্তারপূর্বক এই সরোবরের যে অংশে বৃহৎ দণ্ডে ভর করিয়া শ্বেত ও নীল কমল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, সেই সলিলে সন্তরণ করিতে করিতে তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।"[৩৮]

সীতার বনবাসে এই অংশটি যে রূপ নিয়েছে তা অপূর্ব। যথা—

"রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম: দেখিলাম, প্রফুল্ল কমলসকল মন্দমারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক

আমোদিত হইয়া রহিয়াছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে ছিল। সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক অনুভব করিতে পারি নাই ; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।"[৩১]

আলেখ্যদর্শন বিষয়টি রামায়ণে নেই। এটি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। বিষয়টি অসাধারণ শিল্পগুণসম্পন্ন। তাছাড়া এর পশ্চাৎপটে রয়েছে বনবাসকালে রাম-সীতার সুখ-দুঃখ অভিজ্ঞতার কথা। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হবার পর, তাকে অন্বেষণের সময় রামের গভীর উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণার উল্লেখের মাধ্যমে সীতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম প্রকাশিত হয়েছে এখানে। পূর্বেকার বনবাসের সময় রাম ও সীতা ছিলেন অবিচ্ছিন্ন, একত্র, তাই অরণ্যবাসেও তাঁরা ছিলেন সুখী, পরিতৃপ্ত। সীতা অপহৃত হবার পর থেকে তাঁর উদ্ধারসময় পর্যন্ত উভয়েই যে দারুণ বিরহযন্ত্রণা ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিলেন, তার স্মৃতি উভয়ের মনে সর্বদাই জাগরূক। সেই যন্ত্রণার কথা আলেখ্য-দর্শনের সময় উল্লেখ করে ভবভূতি এখানে ইঙ্গিত করেছেন অদূর ভবিষ্যতে নিরাপরাধী সীতাকে বনবাস দেবার পর রাম-সীতার মনে সেই বিরহানল দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠবে।

রামায়ণে দেখা যায়, ভদ্র নামক জনৈক রাজকর্মচারী প্রকাশ্য রাজ-সভায় রামকে সীতাসংক্রান্ত লোকাপবাদ জ্ঞাপন করছে। ভবভূতি সে স্থলে এই সংবাদটি রামের কর্ণগোচর করাচ্ছেন দুর্মুখ নামক গুপ্তচরের মাধ্যমে, রাম-সীতার বিশ্রাম কক্ষের নিভৃতে। সে কক্ষে সীতা আলস্য নিদ্রায় মগ্না, তাই দুর্মুখ অতি সাবধানে চুপি চুপি সেই অপ্রিয় সংবাদটি

রাজার শ্রুতিগোচর করছে। বিদ্যাসাগর দুর্মুখ নামটি গ্রহণ করছেন, কিন্তু এই অপ্রিয় সংবাদদাতার মনে কর্তব্য-পালন আর সত্যকথনের দরুন প্রভু ও প্রভুপত্নীর জীবন বিষময় করে তোলবার অনিচ্ছার দ্বন্দ্বকে তিনি ভবভূতির চেয়ে অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সীতাকে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন দেখেও, বিশ্রামকক্ষে দুঃসংবাদ জ্ঞাপনে দুর্মুখের অনিচ্ছা এবং তার অনুরোধে রামচন্দ্রের কক্ষান্তরে গমন, এই অংশটুকু বিদ্যাসাগরের নিজস্ব। এমন কি,

> "মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর, তুমি আমার দুর্মুখ নাম অন্বর্থ করিয়া দিলে। এই বলিয়া, বিদায় লইয়া, রোদন করিতে করিতে, দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।"৪০

এই অংশটুকুও বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা।

সীতা সম্বন্ধে লোকাপবাদ অবগত হবার পর রামচন্দ্রের মানসিক যাতনা, একনিষ্ঠা, পতিপ্রাণা, আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে প্রজানুরঞ্জনের অনুরোধে তিন ভাইয়ের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বনবাসে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিবরণগুলিও অনুবাদ দুষ্ট না হওয়ায় মূল নাটকের তুলনায়, সীতার বনবাসে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে।

সীতার বনবাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪৬শ ৪৭শ ৪৮শ ও ৪৯শ সর্গের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এই পরিচ্ছেদের ঘটনাগুলি রামায়ণে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। রামের আদেশে সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে লক্ষ্মণের যে প্রচণ্ড ক্ষোভ, গভীর দুঃখ আর অপরাধবোধ, লক্ষ্মণের মুখে নিরপরাধা জেনেও শুষ্ক কর্তব্যের তাড়নায় প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাম তপোবনদর্শনের নাম করে তাঁকে বনবাসে প্রেরণ করেছেন একথা জেনে সীতার যে মর্মভেদী যাতনা আর আক্ষেপ, বিদ্যাসাগরের রচনায় তা যতখানি প্রত্যক্ষ, রামায়ণে তা

নেই। পরিত্যক্তা, শোকবিহ্বলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সীতাকে বাল্মীকির সান্ত্বনা ও আশ্রয় দেবার কথা রামায়ণে আছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের রচনায় বাল্মীকির দয়া ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার অধিকতর বাস্তব।

সীতার বনবাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা। সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করে রামের অন্তর্দাহ, বিরহযন্ত্রণা ভোগ, এবং অসুখী জীবনযাপন, সীতাকে বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্মণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁর প্রবল শোকোচ্ছ্বাস, এবং বারবার মূর্চ্ছা, লক্ষ্মণের রামকে সান্ত্বনা দান এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে আছে লবকুশের জন্মসংবাদ যার উল্লেখ রামায়ণে[৪১] অতি সংক্ষিপ্ত। সন্তান প্রসবের পর সীতার যুগপৎ হর্ষ ও শোক প্রকাশ। তিনি আনন্দের সময় কেন শোকাকুলা, ঋষিকন্যাদের এই প্রশ্নে সীতা যে উত্তর দিয়েছেন, তা একমাত্র অবলাবান্ধব বিদ্যাসাগরের লেখনীর পক্ষেই সম্ভব।

> "মুনিকন্যারা, সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি ! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এ জন্য, তিনি কিয়ৎক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না ; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ ! তোমরা কি কিছুই জান না, যে আমি, এমন আনন্দের সময়, কি জন্য শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? পুত্রপ্রসব করিলে, স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়,...আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে এ জন্মের মত, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম ; অথবা, অন্য কোনও প্রকারে, আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।"[৪২]

স্বামী পরিত্যক্তা সীতা গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হবে আশঙ্কায় আত্মহত্যা করতে পারেন নি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর যে হর্ষ, তা চিরন্তন জননীর সন্তান লাভের হর্ষ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁর আনন্দের স্থান অধিকার করেছে বিসর্জনের যাতনা। আবার, সদ্যোজাত শিশুদ্বয়ের ক্রন্দনশব্দে তাঁর মাতৃস্নেহ প্রবল হয়ে উঠেছে, এবং "তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।"[৪৩] এই করুণ মধুর দৃশ্যটি থেকে রামায়ণকার আমাদের বঞ্চিত করিলেন, বিদ্যাসাগর আমাদের এটি উপহার দিয়েছেন। লবকুশের বাল্যকাল অতিক্রান্ত হবার পর সীতা ঋষি-পত্নীদের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু "রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।"[৪৪]

বিনা অপরাধে রাম তাঁকে পরিত্যাগ করলেও সীতা ভ্রমেও কখনও রামের উপর ক্রুদ্ধ হননি বা তাঁকে দোষারোপ করেন নি। নির্বাসন দণ্ডকে তিনি মন্দ ভাগ্য বিবেচনা করেছেন। রামের প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুগত্য অটুট, অবিচল থাকায় সদা সর্বদা তিনি স্বামীর মঙ্গল কামনাই করেছেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার তপস্যা ছিল জন্মান্তরে রামের সহধর্মিণী হবার তপস্যা। দেবতাদের নিকট সেজন্য আকুল প্রার্থনায় দিনের অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু রাত্রিতে পর্ণকুটিরে নির্জনতায় "তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া যামিনী যাপন করিতেন।"[৪৫] কালক্রমে সকল শোকেরই নিরসন হয়, কিন্তু সুদীর্ঘ একযুগ পরেও বিরহক্লিষ্টা পতিপ্রাণা সীতার দুঃখের কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। দুর্বিষহ শোকের জ্বালায় সীতার

দেবতুর্লভ রূপ ও লাবণ্য অদৃশ্য হয়েছে, এবং তিনি চর্মাবৃত কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে শোকবিহ্বলা জানকীর এই অন্তরঙ্গ চিত্রের একান্ত অভাব। তিনি পতিবিরহে কাতরা, ঋষির আশ্রমে দীনহীনার ন্যায় অসুখী জীবন যাপন করেছেন এটুকু বলেই কবি ক্ষান্ত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর রামায়ণের কাহিনীকে নিজের সৃজন-শক্তির সাহায্যে পরিবর্ধিত করে সীতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন।

কণ্বমুনির আশ্রমে অবস্থানকালীন শকুন্তলার সঙ্গে বাল্মীকির তপোবনের সীতার অনেকাংশে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা দুষ্মন্তের কোন অপরাধই দেখতে পান নি। অসহ্য বিচ্ছেদ যাতনার মধ্যেও তিনি সর্বদা পতির মঙ্গল কামনাই করেছেন। তিনিও সীতার ন্যায় মলিনবসনা, ম্রিয়মানা তপস্যায় শুষ্কমুখী, শুদ্ধশীলা, বিরহব্রতচারিণী। প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুষ্মন্তকে দোষারোপ না করে, করেছেন নিজের ভাগ্যকে। সুদীর্ঘ বিরহকাল উত্তীর্ণ হবার পর সপুত্র শকুন্তলার সঙ্গে যখন দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ হচ্ছে, পুনর্মিলন হয়ত নিকটবর্তী, একথা অনুমান করেও ভরতের প্রশ্ন, "মা। ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস কেন?" তার উত্তরে তিনি বলছেন, "বাছা, ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"[৪৬] অর্থাৎ, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তবেই স্বামীর সঙ্গে সপুত্র মিলিত হবেন। সীতাকেও আমরা দেখি ভাগ্যনির্ভর। শেষ পর্যন্ত যখন রামচন্দ্র প্রজাসাধারণের মতানৈক্যের দরুন সীতাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন তাঁর ভাগ্যলিপিতে নেই, একথা উপলব্ধি করে সীতা প্রাণত্যাগ করলেন।

সীতার বনবাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সপত্নীক এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিতব্য, অতএব সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র রাজগুরু বশিষ্ঠের অনুমোদন ভিক্ষা

করছেন সীতার স্বর্ণমূর্তিকে পার্শ্বে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য। রামায়ণের ৯১ ও ৯২ সর্গে এই যজ্ঞের আয়োজন ও সীতার সুবর্ণ প্রতিমার উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর শিষ্যবর্গ ও লবকুশকে নিয়ে নৈমিষারণ্যে রামচন্দ্রের যজ্ঞস্থলে আগমন করলেন। লবকুশকে সেখানে নিয়ে আসার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বাল্মীকির। তিনি রামের জীবনকাহিনী অবলম্বনে যে মহাকাব্য (রামায়ণ) রচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে দুই ভ্রাতা কণ্ঠস্থ করেছিল তাঁর আদেশে। বাল্মীকির অভিপ্রায় ছিল, যজ্ঞের সময় কোন কৌশলে লবকুশকে রামের সম্মুখে উপস্থিত করে তাদের দিয়ে রামায়ণ গান করান, তাহলে, হয়ত বা, তাদের আকৃতি দেখে, তাদের মুখে সীতা ও তাঁর নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে রচিত রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্রের হৃদয়ে স্বাভাবিক অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হবে। লবকুশের আকৃতির সঙ্গে রাম ও সীতার সাদৃশ্য কেবল রামই লক্ষ্য করবেন না, সভায় উপস্থিত মুনিঋষি, ইতরভদ্র, রামের তিন ভাই ও কৌশল্যা এবং অন্যান্য পুরস্ত্রীরাও করবেন। উপরন্তু বালকদ্বয়ের সুললিতকণ্ঠে রাম-সীতার কাহিনী শ্রবণে সকলেই এতদূর অভিভূত হয়ে পড়বে, তারা একবাক্যে রামকে অনুরোধ করবে লবকুশকে পুত্র বলে স্বীকার করে নিতে এবং নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করতে। বাল্মীকির উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হল। যজ্ঞস্থলে লবকুশের রামায়ণ গানে মোহিত হয়ে অনেকেই রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন তাদের রাজসভায় আহ্বান করে গান করবার জন্য। রামের আদেশে লবকুশ সভাস্থলে প্রবেশ করবামাত্র তাদের দেখে রামচন্দ্রের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হল।

> "তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন।"[৪৭]

সীতাকে নির্বাসন দেবার পর তাঁর কোন সংবাদই রাম রাখেন নি। বিনা অপরাধে নির্বাসিতা সীতা নিঃসন্দেহে লজ্জায়, দুঃখে আত্মঘাতিনী হয়েছেন, বা কোন বন্য জন্তু তাঁর প্রাণ সংহার করেছে, এই ছিল রামের বিশ্বাস। তাই লবকুশকে দর্শন করে তাঁর চিত্তে বাৎসল্য রসের সঞ্চার হচ্ছে, কিন্তু সীতা জীবিত আছেন কিনা জানতে না পেরে লবকুশকে ক্ষত্রিয় কুমার মনে হলেও বা সীতার ও তাঁর নিজের সঙ্গে তাদের অবয়বের সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেও তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারছেন না এরা তাঁরই পুত্র কিনা। আবার ঃ

> "এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনামাত্রে পর্যবসিত হইবেক? আর, ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে; আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতারে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিতে। হয়তঃ, মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া, সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভযুগলধারণ করিয়াছেন।"[৪৮]

আশা ও নিরাশায় আন্দোলিত হৃদয় রাম মনে মনে এইরূপ প্রচুর তর্কবিতর্কের পর স্থির করলেন, সীতা নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাম সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করবেন সঙ্কল্প করলেন। সীতা সম্বন্ধে লোকাপবাদ, প্রজাদের সন্তুষ্টি তিনি উপেক্ষা করবেন, এবং তা সম্ভব না হলে সিংহাসন ত্যাগ করে সীতাকে নিয়ে বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করবেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে রামের সভায় লবকুশের পুনরায় রামায়ণ গানের কথা বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি যা আশা করেছিলেন তাই হল। লবকুশের গান শুনে, তাদের আকৃতি দেখে সভাস্থ গুণীজন, রামচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন সকলেই অভিভূত হলেন। লবকুশের আত্মপরিচয় তখনও তাঁদের নিকট অজ্ঞাত। তাদের জননী

আশ্রমবাসিনী, কোন অজ্ঞাত কারণে সর্বদাই হৃতস্বাস্থ্য জীবনমৃত প্রায়। লবকুশের মুখে তাদের জননীর আকৃতি ও তাঁর সে-সময়কার শারীরিক ও মানসিক বর্ণনা শ্রবণ করে সকলেই নিঃসংশয় হলেন, তিনি আর কেউ নন, সীতা। এই সময় কৌশল্যার অনুরোধে বাল্মীকি সীতার বনবাসের পর থেকে সকল ঘটনা, বিশেষ করে রামের বিরহে তাঁর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ করলে সকলেই শোকে দ্রবীভূত হলেন। তখন সীতাকে সভাস্থলে আনয়ন করবার জন্য কৌশল্যা শিবিকা প্রেরণ করলেন।

জনসাধারণের মতিগতি সর্বকালেই বিচিত্র, তার কোন স্থিরতা নেই। লবকুশ রামের পুত্র, বাল্মীকির আশ্রমে তাদের জন্ম, সীতা তখনও জীবিতা, তাঁকে গৃহে পুনরায় স্থান দেওয়া হবে, এ সংবাদে অনেকে আনন্দিত হলেও, পরছিদ্রান্বেষী, পরসৌভাগ্যে ঈর্ষাতুর, কুটিলচিত্ত, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব সেই সভায় ছিল না। তারা সীতাকে পরিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্তকে রামের অব্যবস্থিতচিত্ততা সাব্যস্ত করে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, যে কারণে সীতা পূর্বে পরিত্যক্তা হয়েছিলেন সে কারণ তখনও বিদ্যমান। রামচন্দ্র রাজা, কিন্তু তিনি অধর্মাচরণ করে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন না।

জনসাধারণের এই মনোভাবে রামচন্দ্রের সীতাকে গ্রহণ করবার পূর্ব সংকল্প বিচলিত হল। শুধু তাই নয় সীতাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোন বিপত্তি উপস্থিত হলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁকে নিয়ে বনবাসী হবেন তাঁর সে সদিচ্ছাও রাজধর্ম প্রতিপালনের কর্তব্যের নিকট পুনরায় পরাস্ত হল। প্রজানুরঞ্জক রামের সৎসাহস প্রজাদের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করল। রাজগুরু ও ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এখন স্থির করলেন "সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিতা প্রমাণ সিদ্ধ করিলে"[৪৯] তাঁকে গৃহে স্থান দেবেন।

এদিকে বাল্মীকির আশ্রমে সীতা রামচন্দ্রপ্রেরিত শিবিকা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে জেনে মনে করছেন, বুঝি বা এতদিন পর তাঁর দুঃখনিশার অবসান হল। তিনি বিশ্বাস করছেন, রাম তাঁকে পুনরায় সাদরে গ্রহণ করবেন, কারণ তাঁর প্রতি রামের স্নেহ মমতা ও প্রেম তাঁর অজানা নেই।

> "আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই।"৫০

তাঁর প্রতি অপার স্নেহের জন্যই রাম এতদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নি, যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনে সীতার স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত করেছেন, একথা জেনে সীতা প্রচুর সান্ত্বনালাভ করলেও, স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ছিল তাঁর নিকট স্বপ্নেরও অতীত। তাই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে, স্বামী ও পরিজনবর্গের সঙ্গে সম্ভাব্য মিলনের কাল্পনিক সুখের চিত্র আঁকতে আঁকতে, পুলকিত হৃদয়ে, সীতা শিবিকারোহণে নৈমিষারণ্যে গমন করলেন। তিনি তখনও জানেন না, সেখানে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, জনসাধারণের সব সংশয় বিদূরিত করে, তাঁকে স্বামীর গৃহে আশ্রয় লাভ করতে হবে। বাল্মীকির বিশ্বাস ছিল, সভামণ্ডপে তিনি স্বয়ং সীতাকে পুনর্গ্রহণের আবেদন করলে, কোনও ব্যক্তি অসম্মতি প্রকাশ করতে সাহস করবে না, তাই পূর্বেই সীতাকে পরীক্ষা দিতে হবে একথা তাঁকে জানান নি। বাল্মীকির সমভিব্যাহারে সীতা সভাস্থলে প্রবেশ করলে, তাঁর কঙ্কালসার, দুঃখিনী মূর্তি দেখে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল, অপরাপর অনেকেরই অন্তঃকরণ করুণরসে আর্দ্র হল। সীতার সম্বন্ধে লোকাপবাদ একান্ত অমূলক, তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, একথা ঘোষণা করে বাল্মীকি সভাস্থ সকলকে অনুরোধ করলেন, প্রশস্ত মনে তাঁর পরিগ্রহণ অনুমোদন করবার জন্য। কিন্তু রাম যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই হল। সভাস্থ উপস্থিত রাজন্যবর্গ সম্ভ্রান্ত প্রজারা

একবাক্যে সীতার পরিগ্রহণ সমর্থন করলেও অবশিষ্ট সকলে মৌনভাব অবলম্বন করে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। নিরুপায় বাল্মীকি তখন সীতাকে বললেন, তিনি যে সত্যই নিষ্পাপ সে বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত করে সভাস্থ সকলের সংশয় ভঞ্জন করতে। বাল্মীকির এই আদেশ শ্রবণ করবামাত্র সীতার আশা-মুকুলিকা বৃন্তচ্যুত হল। গভীর হতাশা, লজ্জা ও অপমানে নিরপরাধা সতী সাধ্বী সীতা প্রাণত্যাগ করলেন।

বাল্মীকি রামায়ণের ৯৭তম সর্গে বলা হয়েছে, তাঁর পরিগ্রহণ পুনরায় পরীক্ষাদান সাপেক্ষ অবগত হয়ে সভাস্থলে সীতা ঘোষণা করলেন :

> "আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের ফলে দেবীপৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবীপৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর হইতে আর কাহাকেই জানি না, যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবীপৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।"[৩১]

এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করবার পর সভাভূমি বিদীর্ণ করে দিব্য সিংহাসনে দেবীপৃথিবীর আবির্ভাব এবং বাহু প্রসারণে সীতাকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে পুনরায় রসাতলে প্রবেশ।

সীতার পাতাল প্রবেশ রামায়ণের একটি অবাস্তব, অতি-নাটকীয় ঘটনা। যুক্তিবাদী,, বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বভাবতই রামায়ণের এই অংশটিকে গ্রহণ করেন নি। বাল্মীকির আশ্রমে সীতা প্রাণধারণ করেছিলেন রামের সঙ্গে তিনি হয়ত বা কোনদিন পুনর্মিলিত হবেন এই ক্ষীণ আশাটুকু অবলম্বন করে। কৌশল্যাপ্রেরিত শিবিকা তাঁর সেই কুটির দ্বারে উপস্থিত হলে তাঁর সেই সামান্য আশাটুকু বলবতী হয়েছিল। রামচন্দ্র তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করবেন, প্রজারা এ ব্যাপারে আর কোন

অসম্মতি প্রকাশ করবে না, সপুত্র তিনি স্বামী, শাশুড়ী, দেবর ও দেবর-পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হবেন, এ আশাই তাঁর মৃতপ্রায় দেহে বলের সঞ্চার করেছিল, তিনি অনেক সুখের চিত্র আঁকছিলেন। তাঁর পরিগ্রহণ পরীক্ষা-সাপেক্ষ তা তিনি জানতেন না। অপমানজনক হলেও রাবণবধের পর লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি একবার প্রমাণ করেছিলেন, তিনি সত্যই শুচি, নিষ্কলঙ্ক। তাঁকে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে, তাতে উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীগৃহে স্থান করে নিতে হবে, ঘুণাক্ষরেও একথা পূর্বে জানলে, তিনি হয় বাল্মীকির আশ্রমেই প্রাণত্যাগ করতেন, কিংবা সেখান থেকে এক পাও অগ্রসর হতেন না। কিন্তু পরিগ্রহণ সম্পর্কে একরূপ স্থিরনিশ্চয় সীতা যখন শুনলেন, বিনা পরীক্ষায় তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে প্রজারা নিঃসংশয় হবে না, এবং তা না হলে তাঁর প্রজানুরঞ্জক স্বামীও তাঁকে গৃহে স্থান দিতে সাহসী হচ্ছেন না, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর সব আশার সমাধি হয়েছে। গভীর হতাশা ও স্বামীর চলচিত্ততা তাঁর মনকে গভীর আঘাত করল। স্বভাবত বিনীতা হলেও, সীতা তেজস্বিনী, অসামান্য আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন নারী। তাই পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে নিজের সচ্চরিত্রতা প্রমাণ করার চাইতে তিনি একদা ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে প্রমাণ করলেন তিনি সত্যই সতীসাধ্বী। সীতার জীবনের শেষ অঙ্কের বিয়োগান্ত দৃশ্যটি বিদ্যাসাগর যেভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, রামায়ণের প্রাসঙ্গিক সর্গটির তুলনায় তা অনেক বেশি বাস্তব, সংযত, শিল্পগুণমণ্ডিত। সীতার মত পতিপ্রাণা চিরদুঃখিনী নারীর জীবনের এই স্বাভাবিক পরিণতি।

তিন

বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাংলা গদ্য-ভাষা এমন একটি স্তরে ছিল, যা দিয়ে কোন সার্থক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব ছিল না। বাংলা গদ্য যে সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে এর প্রথম কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের। সেকালের "শ্রীছাঁদহীন্ বাংলা ভাষাকে সংযত ও সুবিন্যস্ত করে শিল্পরূপ

দান করেছিলেন"[৫২] বিদ্যাসাগর। এই মন্তব্যের সমীচীনতা বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি রচনাই সমর্থন করবে। বিদ্যাসাগরের ভাষার সহজ গতি আর কার্যকুশলতা শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, দুটি গ্রন্থকেই অনুবাদ গ্রন্থের আড়ষ্টতামুক্ত করে স্বাধীন রচনার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। মহাকবি কালিদাসকে অনুসরণ করলেও, শকুন্তলায় বিদ্যাসাগর কখনও বিস্মৃত হন নি তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন সাধারণ পাঠকের জন্য। তাই তিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলমের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। মূল নাটকের বহু অংশ বর্জন করে অথচ মূল উপাখ্যানের যাতে অঙ্গহানি না হয় সেদিকে দৃটি রেখে শোভন ও সরল ভাষায় তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক। স্বদেশবাসীকে সুশিক্ষা দান ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি প্রাণপণ করে ছিলেন সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে সেখান থেকে সব অন্যায় অবিচার আর অপবিত্র বস্তু দূর করে সত্যম শিবম সুন্দরমকে প্রতিষ্ঠা করতে। বাঙালী জাতির নৈতিক উন্নতি বিধান ছিল তাঁর জীবনের আর একটি লক্ষ্য। এই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশে শিক্ষাবিস্তারে তিনি বিশেষ যত্নবান হন, কারণ জনসাধারণ শিক্ষিত না হলে, কোনরূপ সমাজ-সংস্কার সম্ভব নয়। তাই কর্মবীর বিদ্যাসাগর প্রকৃত শিক্ষার সহায়ক হবে এই বিবেচনায় সহজ সরল সুন্দর গদ্যে নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সাধারণ পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেকালে বাংলা ভাষায় আদর্শ পাঠ্য-পুস্তকের অভাব থাকায় বিদ্যাসাগর শিশুপাঠ্য ইংরেজি সৎসাহিত্যের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলি অনুবাদ বলে প্রচারিত হলেও, সুখপাঠ্য স্বাভাবিক বাংলা রচনা।

বিদ্যাসাগর প্রচলিত অনেক শাস্ত্রীয়বিধি আচারবিরোধী হলেও, তাঁর নীতিবোধ ছিল অসামান্য। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তু অধিকাংশই নীতিকথা, বিদ্যার্থীদের চরিত্রগঠনের সহায়ক। বিদ্যাসাগরের

অসামান্য নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর শালীনতাবোধ, তাই কি পাঠ্যপুস্তক, কি অন্যান্য পুস্তক, কোথাও অশ্লীলতা নেই, অপবিত্রতা নেই, অস্বাভাবিকতা নেই। সবই সহজ সরল ও সুন্দর। শকুন্তলায় তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্য আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি।

চক্রবৎ পরিবর্ততন্তে সুখানি দুঃখানি চ, এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি বিশেষভাবে জানা ছিল বিদ্যাসাগরের। এর তাৎপর্যকে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ঙ্গম করাবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, দুটি কাহিনীকে নির্বাচন করেন, মহাভারত থেকে শকুন্তলার আর রামায়ণ থেকে সীতার বনবাসের। উচ্ছলিত যৌবনা শকুন্তলা ও তার কৌতুকপ্রিয়া দুই সখী, পুষ্পিত লতাবিতান, শকুন্তলার অধরলোভী মূঢ় ভ্রমর, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয় সঞ্চার, তাঁদের গান্ধর্ব বিবাহ, রাজার বিরহে শকুন্তলার হতচৈতন্য অবস্থা, এ সব মিলিয়ে কাহিনীর প্রথমাংশ মধুর প্রেমরসসিক্ত, যৌবনের রঙে উজ্জ্বল একটি অপরূপ দৃশ্যকাব্য। কিন্তু এত সুখ বিধাতা শকুন্তলার ভাগ্যে লেখেন নাই, তাই দুর্বাসার আবির্ভাবে, এবং তাঁর শাপে শকুন্তলার অবর্ণনীয় দুর্দশা। ঋষির শাপে মোহগ্রস্ত রাজা, শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর বারংবার শকুন্তলা তাঁর ধর্মপত্নী ঘোষণা করা সত্ত্বেও, বিনা অভিজ্ঞানে তাঁকে গ্রহণ করলেন না। অনতি-বিলম্বেই রাজা অবশ্য মোহমুক্ত হচ্ছেন, কিন্তু শকুন্তলা তখন অদৃশ্য, তিনি কোথায় গেছেন, তা সকলের অজ্ঞাত। এদিকে জননী মেনকার দ্বারা শকুন্তলা কশ্যপ মুনির আশ্রমে নীত হয়ে সেখানে পুত্র প্রসব করেছেন। কিন্তু পুত্রমুখ দেখেও তিনি দুষ্মন্তের জন্য অশান্তহৃদয়া, নিদারুণ বিরহক্লিষ্টা। শয়নে স্বপনে দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান বেদনায় জর্জরিত শকুন্তলা তাঁর সকল দুর্দশার জন্য নিজের ভাগ্যকে দায়ী করে শুষ্ক মুখে, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন, যদি কখনও বিধাতা সদয় হন, তিনি হয়ত দুষ্মন্তের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারবেন। কণ্বের তপোবনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে প্রেম, তা ছিল দুর্বার, যৌবনমদগর্বিত। সে প্রেম কোন

বাধাবন্ধন মানে নি, গুরুজনের সম্মতির অপেক্ষা করে নি। তাই সে প্রেম হয়েছিল ঋষিশাপে প্রতিহত। ঋষিশাপ যখন খণ্ডিত হল, তখন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উভয়ের প্রেম বিরহ-আগুনে পরিশুদ্ধ। কশ্যপ মুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত আর অসংযত প্রেমিক নন, তিনি স্নেহময় পিতা, পত্নীগত-প্রাণ স্বামী। শকুন্তলা এখানে আর নায়িকা নন। সুদীর্ঘ ব্রতচারণে তাঁর প্রথম সমাগমের গ্লানি দগ্ধ হয়ে তিনি এখানে পুত্র শোভায় পরমভূষিতা, করুণ কল্যাণময়ী জননী। রাজা ও শকুন্তলার প্রথম মিলন ছিল অসম্পূর্ণ, তাই দুঃখ দুর্দশার ভোগ অন্তে তাঁদের এই দ্বিতীয় মিলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

শকুন্তলা উপাখ্যানের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর যে নীতিবাক্যটি প্রচার করতে চেয়েছেন, তার তাৎপর্য হল, মোহান্ধ প্রেম উচ্ছৃঙ্খল অধ্রুব অসুন্দর, তাতে মঙ্গল নেই। ধর্মাশ্রয়ী প্রেমই সত্য, কৃতার্থ। "প্রেমের, শান্ত সংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ, বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি।"[৫৩]

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের একটি সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীচরিত্রকে বাংলার নারীসমাজের সম্মুখে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। সীতার গুণ ভারতবর্ষীয় রমণীমাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁর অনিন্দ্যরূপ, সরলতা, চরিত্রের বিশুদ্ধতা, পতিপরায়ণতা তুলনাবিহীন।

> "তাঁর তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধচরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পাতিব্রত্যধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"[৫৪]

পরম সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না সীতা সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী লাভ করেও অশেষ দুঃখভাগিনী হয়েছিলেন, তাই তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কম নয়, সীতার বনবাসে শুধু সীতার অতুলনীয় চরিত্র কীর্তিত হয় নি, সর্বগুণসম্পন্ন রামচন্দ্রের চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। রাম ও সীতার জীবন পূর্ব থেকেই অভিশপ্ত[৫৫]। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্বমুহূর্তে তখনই বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছে। কুসুমকোমলা সীতা স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাজপ্রাসাদের ভোগ-বিলাস তাঁর নিকট অসহ্য হবে বিবেচনায় স্বেচ্ছায় রামের অনুগামিনী হয়েছেন। পরস্পরের সাহচর্যে বনবাসের কঠোর ক্লেশ তাঁদের স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু তাঁদের এ সুখও ছিল ক্ষণস্থায়ী। লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে হরণ করে তাঁকে আবদ্ধ করে রাখল নিজ পুরী লঙ্কায়। এই আকস্মিক বিপদে উভয়কেই সুদীর্ঘকাল ধরে ভোগ করতে হয়েছিল বিচ্ছেদের গভীর যন্ত্রণা। কিন্তু রামায়ণ পাঠ করলে মনে হয়, বানরসেনার সাহায্যে রামের লঙ্কা অবরোধ ও রাবণকে নিধন করাই ছিল মুখ্য কর্তব্য, সীতার উদ্ধার ছিল গৌণ ব্যাপার। কারণ, রাবণ সীতাকে হরণ করে রঘুবংশে যে কলঙ্ক আরোপ করেছিল তাকে বধ করে সে কলঙ্ক মোচন করাই ছিল রামের নিকট প্রধান কর্তব্য। নচেৎ তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর সমক্ষে সীতার প্রতি এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে পারতেন না :

"তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্র রক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে এই কার্য

করিয়াছি। এক্ষণে পর গৃহবাস নিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। ...তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পর গৃহবাসনী, কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহার পুনর্গ্রহণ করিতে পারে।...তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতের অনুগামী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।"[৫৬]

দেবীপৃথিবীর সকল গুণ নিয়ে নারী সৃষ্ট, তাই সে সর্বংসহা। প্রকাশ্য সভায় রামের উপরোক্ত উপমানজনক মর্মবিদারী কঠোর বাক্যও সীতা তখন সহ্য করেছিলেন। তিনি লজ্জায় অবনত হলেও, সিংহিনীর তেজে একথার প্রতিবাদ করেছিলেন। শুধু তাই না, রামের নীচজন-সুলভ আচরণে, অযথা তাঁর চরিত্রে অপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে অক্ষত শরীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সমস্ত জগতের সম্মুখে প্রমাণ করলেন, তিনি সত্যই নিষ্পাপ, নিরপরাধী সীতার অগ্নি-পরীক্ষা তাঁর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও চরিত্রবলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাভ্রম, তথা মহাপাতকের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। প্রকৃতই শুচি, স্বামী-চিন্তাই যার ধর্ম, কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, কোন কিছুই তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে না।

রাবণবধের পর, অগ্নিপরীক্ষান্তে রামসীতার পুনর্মিলন। অযোধ্যায় রামের রাজপদে অভিষেক, সীতার গর্ভসঞ্চার এ সব ঘটনা আনন্দময়, কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ রামসীতার ভাগ্যে নেই, তাই লোকাপবাদে বিচলিতচিত্ত রামচন্দ্র সীতা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, একথা প্রত্যক্ষ জেনেও প্রজানুরঞ্জনের জন্য তাঁকে বনবাসে প্রেরণ করলেন। নির্বাসিত অবস্থায় সীতা সুদীর্ঘ বার বৎসর বিচ্ছেদ যাতনা

ভোগ করলেন, কিন্তু কখনও স্বামীর উপর বিরক্ত হন নি বা তাঁকে দোষারোপ করেন নি। অবশেষে যখন তাঁকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করবেন বলে শিবিকা প্রেরণ করলেন, তখন সব অভিমান ও দুঃখ বিস্মৃত হয়ে, উৎসুক হৃদয়ে সীতা সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তখনও সংশয়ের অবকাশ আছে, তাঁকে পুনরায় সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে জেনে, তাঁর মধ্যেকার তেজস্বিনী নারী বিদ্রোহ করে। পরীক্ষা দেবার প্রস্তাবকে তাঁর নারীত্বের চরম অপমান জ্ঞান করে তিনি প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন।

সীতার বনবাসে রামের বহু সদ্‌গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি প্রজাবৎসল রাজা, তিনি মহাবীর, সুশীল, ধর্ম ও কর্তব্যপরায়ণ। এক পত্নীক রাম সীতাগত প্রাণ, সীতার গুণমুগ্ধ, প্রেমমুগ্ধ, সীতার জন্য তাঁর স্নেহ দয়া ও মায়ার শেষ নাই। সীতার অদর্শনে তিনি কাতর হন, তাঁর বিরহে ও বিচ্ছেদের শোকে বার বার মূর্ছিত হন। এ সবই অকৃত্রিম। কিন্তু সেই সঙ্গে রামের চরিত্রের একটি দুর্বল দিকও আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাম সব কিছু করতে পারেন, এমন কি নিরপরাধ এ কথা জেনে সীতাকেও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। যদি বা একবার সঙ্কল্প করলেন প্রজারা সীতার পরিগ্রহণ শেষ পর্যন্ত অনুমোদন না করলে, সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁকে নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন, কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল তা করলে তাঁর রাজধর্মের প্রতিপালন হয় না। প্রজামতাবলম্বী হয়ে রাজ্যশাসনই তাঁর কর্তব্য। জনমত উপেক্ষা করে স্ত্রীকে প্রতিগ্রহণ করা অকর্তব্য, সীতার চরিত্রগুণের পরিপ্রেক্ষিতে রামের এই দুর্বল সিদ্ধান্ত পাঠকের মনে বিশেষ পীড়াদায়ক হয়েছে।

সীতা অসামান্যা নারী, তাই তাঁর জীবনের পরিণতি এত করুণ। তিনি বার বার এত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করলেন কি অপরাধে? সংসারে দুর্বৃত্ত স্বামীর অত্যাচারে বহু নিরপরাধা সতীসাধ্বীর জীবন বিনষ্ট

হয়েছে। কিন্তু রাম কি দুর্বৃত্ত ছিলেন? সীতার প্রতি তাঁর ব্যবহার হয়ত অপরাধদুষ্ট, কিন্তু সে অপরাধেরও একটি যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখান হয়েছে। তিনি প্রজানুরঞ্জক রাজা, প্রজার অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করাকে তিনি কর্তব্য মনে করেন নি। তাই রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্রের মত স্বামীলাভ করে, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, লক্ষ্মণের মত দেবর, লবকুশের মত পুত্র লাভ করে, মুনি ঋষিদের সতত আশীর্বাদ লাভ করেও সীতার জীবন যে এত দুঃখময় হয়েছিল তার জন্য একমাত্র তাঁর ভাগ্যকেই দায়ী করা চলে। মন্দভাগ্যই সীতার জীবনের আসল 'ট্র্যাজেডি'।

বিদ্যাসাগরের নীতিবোধ এবং কর্মনিষ্ঠা

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ

মানুষ এবং সমাজ ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং সমাজ-হিতৈষণা তাঁর নির্ভীক মননশীল এবং প্রাণবান ব্যক্তিত্বের ঋজু অভ্যাস, কোন ঈশ্বরচিন্তা বা অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূত নয়, লৌকিক গতানুগতিকতার ফলশ্রুতি তো নয়-ই। এক উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের মধ্যে, এক অপরাজেয় এবং নিরুপম পৌরুষের মধ্যে সরস পরিহাস প্রিয়তা, অকৃত্রিম নাটকীয়তা, সাদর এবং সুগভীর হৃদয়ানুভূতি, কঠিন এবং কোমল কি এক অপূর্ব রসায়নে বিমিশ্র ছিল তা ভাবতে গেলে বিস্ময় জাগে। একটি শীর্ণ, খর্বকায়, প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট, দেশী মোটা পরিধেয়ে আবৃত শরীর যখন চেয়ারে সোজা হয়ে আসীন হতো তখন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে মনে হতো বিশ্বকর্মা প্রকৃতির সমস্ত তেজ যেন হাড় ক খানায় সংহত করে দিয়েছেন। এমন এক প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি ছিল তাঁর যা দুর্জ্ঞেয়, যার পাঠোদ্ধার ছিল কঠিন। এমন যে মূর্তি তা কে রচনা করবে, এমন যে চরিত্র তা কে ফুটিয়ে তুলবে? প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন,—'বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাস্করশ্রেষ্ঠের বাটালীর অপেক্ষায় আছে, বিদ্যাসাগরচরিত্র প্লুটার্কের লেখনীর অপেক্ষায় আছে।' কবি হেমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—'উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি' এবং 'স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।' অনেকের নীতিবোধ আছে, তদনুকূল কর্ম নেই, বিদ্যাসাগরের দুই-ই ছিল, বলতে গেলে কর্মই ছিল তাঁর নীতি। শিক্ষাপ্রসার, শিক্ষা-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার তথা বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবৃত্তিকালে অনন্যতন্ত্র নিষ্ঠায় তিনি যে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করে গেছেন উনিশ শতকে একমাত্র রামমোহন রায় ভিন্ন এদেশে-তার

কোন তুলনা নেই। তিনি ছিলেন যথার্থ আধুনিক নীতিবোধের আদর্শ। ধর্ম এবং পরাতত্ত্ববিবর্জিত পুরাপুরি সংস্কার-মুক্ত নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব এবং কর্মের মূল্যায়ন সম্ভব। এভাবে বিচার করলে তাঁর মানবতাবোধ অস্তীতিবাদী বললে বোধ হয় অতিকথন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে কার্লাইলের 'হিরো' আখ্যা দিয়েছেন এবং জন্‌সনের চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সৌসাদৃশ্য সম্পর্কে অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন। জন্‌সন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিগ্রহ এবং স্বকীয়তন্ত্র ছিলেন। জীর্ণজুতো পায়ে অকসফোর্ডের রাস্তায় বরফের মধ্যে হাঁটতেন দেখে এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র জন্‌সনের দরজায় এক জোড়া নতুন ভালো জুতো রেখে দিয়েছিলেন। জন্‌সনের তৎপ্রতি দৃষ্টিনিবেশ হওয়ামাত্র তিনি তা ছুঁড়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের তালতলার চটিজুতো-ও তো কম বিখ্যাত ছিল না। যাতুঘরে বাঙালী জুতোর প্রবেশাধিকার, বিশেষ করে বিখ্যাত সে জুতো নিয়ে তখনকার পত্র-পত্রিকা কিরকম সরগরম হয়েছিল তা তো অনেকেরই অবিদিত নয়। তাছাড়া 'ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা নেই যার গালে এ-চটি বসিয়ে দিতে না পারি'—এমন-ই অহংতেজে সে চটি প্রদীপ্ত ছিল। বিদ্যাসাগরকে কেউ এক জোড়া হাল-ফ্যাসানের জুতো দিতে চেয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে বর্ধমানের রাজা পাঁচশত টাকা এবং একটি সাল পণ্ডিত বিদেয়স্বরূপ বিদ্যাসাগরকে দিতে গিয়ে যে শ্লেষ উপহার পেয়েছিলেন তা অনেকেরই জানা আছে। এছাড়াও অবশ্য বিদ্যাসাগর-জীবন এবং জন্‌সন-জীবনের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ' গ্রন্থে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকে প্রাচ্যের চিন্তাধারায় রেনেসাঁর অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ প্রতীচ্যে যে আন্দোলন পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দে সংঘটিত হয়েছিল প্রাচ্যে তা এসেছিল অষ্টাদশের শেষ পাদে এবং বিশেষ করে ঊনবিংশ

শতাব্দে। বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) অবশ্য জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—১৮৭৩)-এর প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। মিলের চিন্তাধারা ছিল গণতান্ত্রিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতত্ত্বগত সংস্কারবিমুক্ত। মার্টিন হেইডেগার (১৮৮৯—), অ্যালবার্ট ক্যামু (মৃত্যু ১৯৬০) এবং জঁা পল সার্ত্র (জন্ম ১৯০৫) প্রতীচ্যে মিলের-ও পরবর্তীকালের সর্বাধুনিক চিন্তাবিদ। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রতীচ্যের চিন্তাবিদ্‌দের প্রতি অকস্মাৎ লক্ষ্যনির্দেশ সমীচীন হবে না, কেননা বিদ্যাসাগরের বাল্য, কৈশোর এবং এমনকি যৌবনেরও পরিবেশ ভিন্নতর।

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন এক কৌলিক আচার-নিষ্ঠ সনাতন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে। তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলে ঊর্ধ্বতন তিন/চার বা ততোধিক পুরুষের বিদ্যালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কসিদ্ধান্ত এ-রকম সংস্কৃত উপাধি ছিল। নিজেও তিনি শাস্ত্র পঠনের ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস তো ভেবেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশেষে বীরসিংহ গিয়ে একটি টোল-চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। বড়বাজার হতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে ক্ষুধার যাতনা ভুলতে চেয়েছিলেন ঠাকুরদাস একদিন। অবশেষে এক বিধবা মুড়ি-মুড়কি-বিক্রয়িকার কারুণ্যে তিনি ক্ষুন্নিবৃত্ত হয়েছিলেন। আরও কত কষ্ট গিয়েছে ঠাকুর-দাসের জীবনে! ঈশ্বরচন্দ্রের ছোলা-বাতাসা ছাড়া ছাত্রজীবনে বড় একটা জলযোগের সংস্থান ছিল না। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুরদাস আর অধিক-ই বা ভাববেন কি করে? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পরিণামে কৌলিক আচারের সনাতন ব্যূহ ভেদ করে প্রগতিবাদী হয়েছিলেন, পিতৃপিতামহের মৌরুসী ঐতিহ্যের এবং লোকাচারের যূপকাষ্ঠে তিনি তাঁর চৈতন্যকে বলি দেন নি এবং তন্মধ্যে বা তৎ-প্রেরণায় কৈবল্য বা মোক্ষ পেতে চান নি। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের নিরতিশয় তেজস্বিতা, বলিষ্ঠ ঋজু-স্বভাব, অনুপম শ্লেষ-ভাষণ এবং পরিহাস নৈপুণ্য, পিতার দুর্জয় কষ্ট সহিষ্ণুতা, ত্যাগ

এবং তিতিক্ষা, মাতা ভগবতীদেবীর উদার প্রাণ-মন অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের উপর সচেতন প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি অতিমূল্যবান কথা বলেছেন,—'অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই কিন্তু ডোবা আছে ; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল ; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।' [দীপিকা, জীবনী—বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা ৩২৯ (প্রথম প্রকাশ)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত ভাষণের মধ্যে দু'টি মন্তব্য প্রণিধেয় যথা, 'যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না' এমন-ই একটি বৃহত্তর আধুনিক যুগ এবং 'বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল।' ঈশ্বরচন্দ্র এবং রামমোহন প্রাচ্যে রেনেসাঁর স্থপতি। উভয়ের চিন্তন প্রক্রিয়া ছিল মানবপ্রধান, লোকাচার নিরপেক্ষ এবং যুক্তিবাদী। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' মূলত বেদ-পাঠ অথবা ব্রহ্মোপসনার সভা হলেও তাতে জাতিভেদ প্রথা, নিষিদ্ধ খাদ্য, পৌত্তলিকতা, প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে সতীদাহ, সহমরণ, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো, যার ফল-শ্রুতিস্বরূপ বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ-লোপ আইন (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) পাশ হলো। রেনেসাঁর চিন্তানায়কদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ক্ল্যাসিক্যাল শাস্ত্র এবং ঐতিহ্য পুনরায় অনুসন্ধান করে যুক্তির আলোকে তাকে মানবমুখিন বা মানবকেন্দ্রিক (anthropo-centric) এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন। রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৮১৫) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সপক্ষে পরাশর সংহিতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র ঘেঁটে প্রতিপক্ষের রক্ষণশীল

বিতণ্ডাকে খণ্ডন করেছেন। তাছাড়া উভয়ের এবং বিদ্যাসাগরের ততোধিক কঠোর প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ (individuality) ছিল, যা রেনেসাঁর চিন্তানায়কদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। রামমোহন সম্পর্কে অধিক আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতে হয় যে তিনি প্রতীচ্যের প্রায় তিনশত বৎসর পরে রেনেসাঁর স্বীকরণ করলেও, প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্যের চিন্তাধারাকে আরও কয়েক শত বৎসর এগিয়ে নিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

প্রতীচ্যের চিন্তাজগতে এক নতুন স্বাধীন সৃজনশীল নৈতিক মূল্য-বোধের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেকার্ত (১৫৯৬—১৬৫০)-এর দর্শনে। দেকার্ত থেকে স্পিনোজা, লাইব্‌নিজ, বিশপ বার্কলে, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, শেলিং, হেগেল (১৭৭০—১৮৩১), ব্র্যাড্‌লি এবং বোশাংকে (১৮৪৮—১৯২৩) পর্যন্ত আরও অন্তত আড়াই-শ বৎসর দর্শন ছিল ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নয়। দু-একজন অবশ্য কমবেশি ব্যতিক্রম ছিলেন, যেমন হিউম (১৭১১—১৭৭৬) এবং ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২)। ঈশ্বরচন্দ্র নিরীশ্বর বা নাস্তিক ছিলেন এ-কথা বলি না, তিনি অবশ্য জঁা পল সার্ত্রের মত বলে রাখেননি, 'আমার মানবতাবাদ ধর্মকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হবে, তবে একমাত্র চিঠি-পত্রের শিরোনামে, 'শ্রী শ্রী হরিঃ', 'শ্রী হরিঃ' ইত্যাদি ছাড়া এবং কিশোর পাঠ্য 'বোধোদয়'-এর শেষে সংযোজিত কয়েকটি শব্দ ছাড়া এতবড় বিস্তৃত কর্মজীবনে একটি বারও ঈশ্বরের নামগন্ধ উচ্চারণ করেন নি। বরং ইহলোক-পরলোক এ-সব পার্থক্যবিচার শুনে তিনি রীতিমত ঠাট্টা করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার পর তাঁর পিতা হারাণশাস্ত্রী কাশীবাসী হয়েছেন শুনে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় এমন কিছু অন্যায় করেননি যার জন্য মনের দুঃখে তাঁকে কাশীবাসী হতে হবে। আরও মজার কথা হলো, হারাণবাবু কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি বলেছিলেন, 'গাঁজা খেতে শিখেছ কি ? কাশীতে মৃত্যু হলে

লোকে সাক্ষাৎ শিব হয়। শিব হলেন পাঁড় গাঁজাখোর। মৃত্যুর আগেই যদি একটু প্রাকটিস্ করে রাখতে তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হতো। (সংক্ষেপিত)।' ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একদিন দুজন ধর্মপ্রচারক বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে ধর্মসম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; তারা আরও পীড়াপীড়ি করলে বললেন, আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না। এ উক্তিটি বিবেচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) ছিলেন। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুও বিদ্যাসাগরকে 'Agnostic সংশয়বাদী বলেছেন; তিনি তাঁকে দেখেছেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। তবে এ-টুকু স্বল্প প্রমাণের উপর সিদ্ধান্তে পৌঁছান কঠিন। অবশ্য কেবল যে প্রাকটিক্যাল ছিলেন বলে সাধারণের ধর্মবিশ্বাসে কটাক্ষ করতেন না তা নয়, বরং বলতে হয় যে, মানুষ সম্পর্কে তিনি সরাসরি ভাবতে পারতেন। মিল্-এর তর্কবিদ্যায় (Logic) তাঁর আস্থা ছিল, তাই কাশীর সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইন সাহেব বিদ্যাসাগরের কলেজ পরিদর্শন করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়কল্পে বিশপ বার্কলের Inquiry পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা সম্পর্কে প্রস্তাব দিলে, তিনি বলেছিলেন, "বিশপ বার্কলের Inquiry বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তকরূপে এ বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই বেশি।...সংস্কৃতে যখন এইগুলি (বেদান্ত ও সাংখ্য) পড়াতেই হবে তখন প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতনই বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্ত দর্শন রচনা করেছেন।..." (শিক্ষা সংসদের সমীপে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩)।

বিদ্যাসাগরের নীতিবোধ এবং কর্মনিষ্ঠা।

[২]

বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতির এবং সমাজ-হিতৈষণার নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য-গুলোর মধ্যে অস্তীতিবাদী মানবপ্রেমের লক্ষণ সুস্পষ্ট :

(ক) মানবকেন্দ্রিকনীতি, যা ধর্মকেন্দ্রিক (Theo-centric) নয়, 'ক্রীশ্চান ফিলানথ্রপি' অথবা 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজম্' নয়।

(খ) প্রচলিত অমানবিক লোকাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা।

(গ) তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, অপরবশ্য স্বভাব, নিজত্বসম্পর্কে চৈতন্য, নিজত্বের বিস্তারে অবলার এবং অপাংক্তেয়ের দুঃখ-লাঘব, জনতা (crowd) এবং তত্ত্ব (ism) থেকে নিজত্বকে (individuality) বিচ্ছিন্ন রাখা, একটি আপসহীন মনোভাব (uncompromising attitude)

(ঘ) সাহিত্য-প্রতিষ্ঠায় এবং অলংকার বিদ্যায় (rhetorics) প্রাতিস্বিকতা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

(ঙ) নৈরাশ্যভাব (pessimistic outlook) এবং অতৃপ্তি।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে একটু বিস্তৃততর আলোচনা করা যাক্।

[ক]

ঈশ্বরচন্দ্রের মানবকেন্দ্রিক নীতিবোধের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের কথা ক'টির উদ্ধৃতি আবশ্যক ; তিনি লিখেছেন, "নবযুগের বাংলার আদর্শ, 'হিউমানিস্ট' বিদ্যাসাগর। 'হিউম্যানিজম্' আর 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজম্'-এর অর্থ এক নয়। শুধু মানবপ্রেমেও হিউম্যা-নিজম্ নয়। ঐশ চিন্তায় মগ্ন ব্যক্তিও মানব-প্রেমিক হতে পারেন। হিউম্যানিজম্ হল মানবতন্ময়তা, মানব-মুখিনতা। বিদ্যাসাগর এই অর্থে হিউমানিস্ট।"

বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩

ঈশ্বরসেবার কল্পনায় তিনি জীবসেবা করেন নি। নির্মল যুক্তিবাদ এবং অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের প্রেরণায় তিনি কর্ম করতেন, কোন ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁর কর্মের মাধ্যম ছিল না। সব সময় প্রামাণ্য সত্তায় authentic existence-এ থাকতেন তিনি। অমর্তলোকের বিশ্বাসে, অমূর্ত-তত্ত্বের সাধনায় অপ্রামাণ্য সত্তায় যে জীবন কাটে, তাতে সাক্ষাৎ কর্মফলের উৎকণ্ঠা অনুপস্থিত। ঋষি হতে চান নি তিনি। কর্মী হতে চেয়েছেন। সে-যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কে না দেখতে যেতেন। বিদ্যাসাগরের অবকাশ ছিল না। অগত্যা রামকৃষ্ণ নিজেই 'সাগর' দেখতে এসেছিলেন। দু'জনের পথ ভিন্ন ভেবে রামকৃষ্ণ নীরবে বিদায় নিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের তৃতীয় কি চতুর্থ দশক থেকেই ধর্ম নিয়ে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল। ধর্মসভার রক্ষণশীলেরা, তত্ত্ববোধিনীর ব্রাহ্মরা এবং ডিরোজিয়ানদের অ্যাসোসিয়েশন ও তাঁদের মুখপত্র এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ ও পরবর্তীকালে বেঙ্গল স্পেক্টেটর ধর্ম নিয়ে পরস্পর মারমুখী হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কোন দিকেই ধর্ম নিয়ে ভেড়েন নি। তিনি জানতেন ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদে মানুষের এবং সমাজের স্থায়ী কল্যাণ কিছুই হবে না, এক গোঁড়ামি থেকে আর এক গোঁড়ামি বরণ করতে চান নি তিনি। বৃথা শক্তিক্ষয়ে কি লাভ? তাঁর চোখের উপর কৃষ্ণমোহনের এবং মধুসূদনের ধর্মান্তর হলো, দেবেন্দ্রনাথ এবং শেষে অক্ষয়কুমারও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা এবং কৌলিক সংস্কৃতি তাঁকে রক্ষণশীল করতে পারে নি।

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মিলন ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (প্রকাশকাল ১৮৪৩, ১৩ই আগষ্ট) সম্পাদক ছিলেন, বিদ্যাসাগর উক্ত পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষদের অন্যতম ছিলেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েও তিনি ঠিক ব্রাহ্ম হয়ে ওঠেন নি। দেবেন্দ্রনাথ

অনেক চেষ্টা করে অক্ষয়কুমারকে আপন নিয়মে আনতে না পেরে খেদোক্তি করেছিলেন : 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ পাতাল প্রভেদ-ই বটে।' অক্ষয়কুমারের আর একটি যুক্তি বড় সুন্দর। তিনি বলতেন, কৃষকেরা পরিশ্রম করে শস্য পায়, প্রার্থনা দ্বারা নয় ; অতএব

পরিশ্রম=শস্য

পরিশ্রম+প্রার্থনা=শস্য

প্রার্থনা=শূন্য (০)

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকায় নিজের বইগুলোর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ দুই খণ্ড ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পাঠ্য বস্তু নির্বাচন ঈশ্বরচন্দ্র কখনও চোখ বুজে করতেন না। স্বলিখিত কিশোর পাঠ্য 'বোধোদয়'-এ পরে অন্যের অনুরোধে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' লিখেছিলেন। তবে বোধোদয়ের প্রথম পাঠে ছিল 'পদার্থ' : পদার্থ ত্রিবিধ, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্, ইত্যাদি।

[খ]

বিধবাবিবাহের সপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের তীব্র আন্দোলন ব্যক্তি-জীবনের কোন দুঃখ থেকে জাগে নি, যেমন রাজা রাজবল্লভ তাঁর তরুণী বিধবা কন্যাকে বিয়ে দিতে বিধবাবিবাহ চালু করতে চেয়েছিলেন। অবলা-জাতিকে নিজের মায়ের মত, নিজের কন্যার মত বোধ করতেন তিনি। কথায় বলে, নরশ্রেষ্ঠ মাত্রই নারীজাতির প্রতি উৎকৃষ্ট আচরণকে শ্রেয় জ্ঞান করে (Best of men are best for women)। নারী জাতির প্রতি তাঁর এ অনুকম্পার মধ্যে পৌরুষের পরিচয় ছিল। 'নব্যচৈতন্যচরিতামৃত', এরকম কত ব্যঙ্গ করে, কত কি অশ্লীল অকথ্য

ভাষায় তাঁর 'সর্বপ্রধান সংকর্মের' অপব্যাখ্যা হতো। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন পর্বতের মত অনড়, বজ্রের মত কঠিন। গুপ্ত কবি ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, 'গোল-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার', 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা', 'সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন। তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন ॥'

নিজে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন। একবার নয়, অনেকবার। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবাবিবাহ করেছিলেন (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬)। সে-সব বিবাহে মুখচন্দ্রিকা, 'কড়ি দে কিনলেম, কড়ি দে বাঁদলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করতো বাপু' এ-সব স্ত্রী আচারও অনুষ্ঠিত হতো। পুনর্ভূর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য বিদ্যাসাগর গহনাপত্র পর্যন্ত দিতেন। এতে বিদ্যাসাগর সর্বস্ব পণ করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। আপন পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। আইন হলেও আজকাল বিধবাবিবাহের চলন নেই, তবে বাল্যবিবাহ এবং কৌলিন্যকীর্তি বহুবিবাহের সংখ্যা প্রায় লোপ পেয়েছে বলে সমস্যাটি এখন তেমন তীব্র নয়।

বিদ্যাসাগর কেন এত উঠে-পড়ে লেগেছিলেন ? অনেকেই অনেক কথা বলেন। মূলত কূপমণ্ডুক বাঙালীজীবনের বদ্ধ অমানবিক লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। নতুন নৈতিক প্রথা এবং মূল্যজ্ঞান (morals and values), নতুন বিচারবোধ এবং জীবনবোধ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। ইয়ংবেঙ্গলদের বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় অবশ্য উনিশ শতকের চতুর্থ দশকেই বিধবাবিবাহ নিয়ে আলোচনা এবং আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন অনেকেই ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত এবং পোশাক-পরিচ্ছদে, স্বভাব-চরিত্রে অবাঙালী। বাঙালী থেকে রক্ষণশীল সমাজের নোঙর (moorings) তুলে দেওয়া যে কি কঠিন ছিল ঈশ্বরচন্দ্র তা জানতেন, কিন্তু গ্রাহ্য করেন নি। শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি অশেষ লাঞ্ছনায় বিধবাদের দুঃখের

অন্ত ছিল না। কচি শিশু মেয়েরও বিয়ে হতো। মুখ, বন্দ্য, ঘোষ, বোস প্রভৃতি উপাধিভুক্ত কুলীন পুরুষদের শতাধিক বিবাহও চালু ছিল, অতএব গতার্তবা হওয়ার বহু পূর্বেই নারীকে বৈধব্যজীবন বরণ করতে হতো। 'পতিবিয়োগ হলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময়' হয়ে যায় না, 'দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল' হয়ে যায় না, বিদ্যাসাগরের এ অনুভূতি ছিল এবং একেও অস্তীতিবাদী অনুভূতি বলা হয়। বায়ু চলাচলবিহীন দেশাচার-দুর্গের নোনাধরা দেওয়াল হিংস্র প্রহরীদের চোখের সামনে খুঁড়ে খুঁড়ে তিনি বদ্ধপিষ্ট ক্রন্দসী বিধবাদের অসংবৃত দুঃখ অনুভব করতে চেয়েছেন, যারা ছিল সমাজের কাছে কলঙ্ক তাঁদের দুঃখ, যে-সব মর্তুকাম বিধবা কামিনীর অদৃষ্ট পরিবর্তন তৎকালীন বৃটিশ শাসক এবং প্রশাসকগণও সহসা ভাবতে পারেন নি। ভারতীয় 'ল কমিশনের' সেক্রেটারী জে. পি. গ্রান্ট ১৮৩৭-এ কলকাতা, এলাহাবাদ, মাজাদ্র প্রভৃতি অঞ্চলের আদালতের বিচারকদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে প্রায় সকলেই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। হিন্দুদের বিবাহ একটা বিধানিক চুক্তি (civil contract), বিশ্বাস, পুনর্ভূ স্বর্গবাস থেকে বঞ্চিতা হবে, দায়ভাগের ভিত নড়ে উঠবে, নীতি ও ধর্মরক্ষার মূলে আঘাত করলে জনসাধারণের অনুভূতিকে আঘাত করা হবে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিদ্রোহ করবে,—এ রকম কত কি আপত্তি এলো। বিদ্যাসাগর টললেন না। অমানুষিক নিষ্ঠুর আচারের নোঙর তুলে দিতে হবে তাঁকে, বিদ্রোহ করবার যে কারণটি তিনি পেলেন তা ছাড়লে চলবে কি করে? প্রবল জিদ নিয়ে বাত্যাতাড়িত প্লাবনের মত তিনি আঘাতের পরে আঘাত হানলেন। এমন-ই দামাল ছিলেন তিনি, এমন-ই দুর্দম কর্মনিষ্ঠা ছিল তাঁর।

[গ]

পাছে সংশয় জাগতে পারে বৃটিশ রাজশক্তির এ-দেশে সংস্কার-কর্মে আনুকূল্য ছিল বলে বিদ্যাসাগর সাহসী হয়েছিলেন, তাই বলে রাখা

আবশ্যক বিদ্যাসাগরের authentic individuality-র বা প্রামাণ্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্পর্কে সাহেবদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ব্যালেণ্টাইন, হেলিডে, হার্ডিঞ্জ, ডকটর ময়েট, অধ্যক্ষ কার এবং গর্ডন ইয়ং প্রভৃতি যাঁরা তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন তাঁরা জানতেন ঈশ্বরচন্দ্র কি রকম একগুঁয়ে। শৈশবেই তাঁর গোয়ার্তুমি এবং একরোখামোর জন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে 'ঘাড়কেঁদো' বলে ডাকতেন। গর্ডন ইয়ং-এর নির্দেশ সত্ত্বেও রিপোর্টে যা লিখেছেন একটি অক্ষরও বদলাতে রাজি হলেন না। আট বৎসর যেতে না যেতেই মধ্যজীবনে অত বড় একটা পদ, অধ্যক্ষ এবং স্কুল ইনস্পেক্টরের উচ্চপদ নির্দ্বিধায় ইস্তাফা দিলেন। ১৮৫১-তে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, পদত্যাগ ১৮৫৮-তে। যা বলেছিলেন তাতে রয়েছে আরও স্পষ্টভাবে আপন ব্যক্তিত্বের স্বীকারোক্তি—'চাকরীর চেয়ে আমি আত্মসম্মানকেই বহু মূল্যবান মনে করি।' চটি-সহ পা টেবিলের উপরে তুলে হিন্দু কলেজের ডাকসাইটে অধ্যক্ষ কার সাহেবকে তাঁর-ই অনুকরণে অভ্যর্থনা করে এবং পরে আপন-শৈলীতে জ্বালাময়ী কৈফিয়ৎ দিয়ে কী উচিত শিক্ষাই না দিয়েছিলেন সাহেবকে! ঘটনাটা যতই ছোট হোক, তখনকার দিনে দুঃসাহসিকতা বলতে হবে।

দাসসুলভ নৈতিকতার (slave morality) কথা বিদ্যাসাগর স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করেছেন শুনে, কুটুম্ব মহাশয়েরা যদি আহার বিহার পরিত্যাগ করেন তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না, ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'আমি দেশাচারের দাস নহি'। তেমন-ই যখন কোন প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, ফণ্ড, পত্রিকা প্রভৃতির সম্পাদনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, নিজের দৃঢ় ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, মুক্ত এবং নির্মল চিন্তা-প্রসূত কার্যকরী নীতি প্রণয়ন, প্রবর্তন এবং প্ররোচন করেছেন। সহকারী কর্তৃপক্ষ অরাজি হলে নির্মমভাবে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন; ওপর-অলা কর্তাদের সঙ্গে বনি-বনা না হলে স্বচ্ছন্দে কর্মত্যাগ করেছেন, তৎসত্ত্বে

আপন প্রত্যয়ে অনাস্থা আনেন নি। কারো সঙ্গে আপস করতে পারেন নি।

কেবল যে যুক্তিদ্বারা চলতেন তা নয়, সেন্টিমেণ্ট দ্বারা চলতেন বেশ। এতবড় প্রাকটিক্যাল হয়েও, আপন ব্যক্তিত্বকে খাটো করতে জানতেন না। 'কাজ করবো না' বলে অনেকবার অনেক স্থলে হুমকি দিয়েছেন। মার্শাল সাহেব জানতেন কিছু কিছু। দামোদর সাঁতরে বাড়ি গিয়েছেন, তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে হাজির করতে ত্রিশ মাইল দুর্গম পথ হেঁটেছেন রাতে, আরও কত দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর জীবনে। গয়ংগচ্ছভাব ছিল না তাঁর ধাতুতে। কল্যাণকামী অনুভূতি-আবেগের প্রাধান্য ছিল তাঁর চরিত্রে। ঘাটাল, আরামবাগ এবং উদয়গঞ্জের মৎস্যব্যবসায়ীরা বেশি থাকতো বহুবাজারে। ভালবাসতেন তাঁদের, ভালবাসতেন সাঁওতালদের। কখনও বাড়ি গেলে এ-সব অপাংক্তেয় শ্রেণীর নারীদের মাথায় তৈল মেখে দিতেন নিজ হাতে নিঃসঙ্কোচে। বন্ধু-তনয়া প্রভাবতীকে সম্বোধন করে কি অপূর্ব 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' লিখেছেন। আর যে উইল রেখে গেছেন তখনকার দিনের যৌথ পরিবারগুলোও অত বিস্তৃত ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারতো না।

স্নেহার্দ্র হয়েও, যুক্তিবাদী হয়েও সেন্টিমেণ্টাল ছিলেন তিনি। কর্ম-ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন, নিজের অভিক্ষেপে (project) বাহ্যনীতির রূপ-বদল অপাংক্তয়ের এবং অবলার দুঃখ মোচন এ-সব অতি আধুনিক মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য। নিজের নীতিকে অগস্ট কোঁতের মত কাল্ট করেন নি, কর্ম করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতির অস্তীতিবাদী বিশিষ্টতা। তাঁর নৈতিকতাকে আবদ্ধ নৈতিকতা (Closed morality) বললে ভুল হবে। একটা সমাজব্যবস্থা বা System-এর বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি, যার মধ্যে থেকে নির্মম অভিজ্ঞতা হয়েছিল জীবনে। যে অভিজ্ঞতাকে অস্তীতিবাদীরা বলেন—'brute facticity of life'।

[ঘ]

সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি সাহিত্যের সুন্দর সুন্দর গল্প বাংলায় ভাষান্তর করেছেন তিনি, লিখেছেন সরলভাবে শিশু-কিশোর সকলের বোধগম্য করে। সারা জীবনটাই প্রায় তার মজার মজার, নানা অভিজ্ঞতার—মমতার নির্মমতার গল্প দিয়ে অকৃত্রিম নাটকীয়তায় বাঁধা, গল্প ভালবাসতেন তিনি। সাধারণের কাজ-কর্মের, চিন্তার-দুশ্চিন্তার শ্রীছাঁদহীন গদ্যকে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোতে' সুললিত করে অমরকীর্তি রেখে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চরম প্রকাশ ঘটেছিল 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' শ্লেষবিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতায়। আগে তো কোন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হতো। গোষ্ঠীর বদলে ব্যক্তির উন্মেষ ঘটলে, অর্থাৎ জেখব বুখার্ট যাকে বলেছেন, the developed individual with personal pretensions তেমন দাবি এবং অহং-বোধ সম্পন্ন উন্নত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগ থেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্লেষ-বিদ্রূপ চালু হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তক এবং 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রভৃতি পুস্তকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শ্লেষ-বিদ্রূপের ধারাল পরিচয় আছে। এমন করে লিখতেন যে, প্রতিপক্ষকে একেবারে সসেমিরা বানিয়ে ছাড়তেন। দু'একটি নমুনা দেখা যাক।—

> "তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। ··· বিদ্যাসাগর, তাহার জবাব লিখিয়া আবার একখানা বই বাহির করিয়াছেন। সেই বই পড়িয়া সবাই বলিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি! (অতি অল্প হইল)
>
> অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা

নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়েকটি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।" (বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক)

দিগ্‌গজ পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতির সংস্কৃতে ভুল-ভ্রান্তি তিনি যেমন খুঁটে খুঁটে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তা আরও উপভোগ্য, কিন্তু এ প্রবন্ধে তার স্থান সংকুলান হবে না। মোটের উপর, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শ্লেষ-বিদ্রূপে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

[৬]

অনেকেই বলেন বিদ্যাসাগর নৈরাশ্যগ্রস্ত বা দুঃখবাদী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখেছেন, তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত (**pessimist**) ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন ; তার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, প্রতারিত হয়েছেন তিনি। মানুষের মূঢ়ত্ব, অন্ধত্ব সহজে ঘোচে না, বহুবিবাহ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিধবাবিবাহের নাম করে তাঁর কাছে বকশিস্‌ পর্যন্ত নিতে আসতো অনেকে। বিদ্যাসাগর সহজে ছাড়বার পাত্র নন, একটা অঙ্গীকার পত্রের খসড়া তৈরি করলেন। বিধবা-বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রদের দ্বারা তা সই করিয়ে নিতেন। দিঙ্‌মূঢ় হয়ে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি তিনি, তবে তিলে তিলে অশেষ প্রকারে যে অপমান, দুঃসহ দুঃখ সঞ্চিত হয়ে হৃদয় ভারী হয়েছিল, তা ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে কয়েকটি পত্রে। পিতামাতাকে তিনি পরমেশ্বর জ্ঞানে ভক্তি করতেন, যাঁদের উদ্দেশ করে কাশীতে পাণ্ডাদের উত্তরে বলেছিলেন, এঁরাই তো আমার ঈশ্বর, যাঁদের প্রাণে তিনি কখনও অকারণে সজ্ঞানে ব্যথা দেন নি, তাঁদের কাছে তিনি করুণভাবে বিদায় চেয়েছেন। মাকে লিখেছিলেন ঃ

'নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার

ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ··· এজন্য স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। ······' ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬॥

ঠিক একই বেদনা-বিধুর কথা একই সুরে তিনি ঐ সালেই লিখেছেন তাঁর পত্নী দিনময়ী দেবীর কাছে, পিতার কাছে এবং ভ্রাতাদের কাছে। লিখেছিলেন মনের আক্ষেপে, কিন্তু তার পরেও আরো ২২টি বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮ সালে (ইং ২৯শে জুলাই, ১৮৯১) তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যিকার বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস নেন নি কখনও, কেননা তার পরেও অনেক কাল তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের সুন্দর সাফল্যে খুশি হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব ১২৮১ সালে উক্ত ইন্‌স্টিটিউশনের সম্পাদক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'The Pundit has done wonders'

ব্যর্থতার গ্লানিতে হৃদয় বিদীর্ণ হলেও কক্ষনো তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম কেশব সেনের মত চৈতন্যভাবে মজেন নি, ব্রহ্মভাবেও আশ্রয় নেন নি, ঈশ্বরের কাছে সব কর্ম সমর্পণ করে ব্যর্থতার সান্ত্বনা যাচ্ঞা করেন নি। অদৃষ্টকেও দোষ দেন নি প্রকাশ্যে কখনও, বলেন নি, 'আহা! বিধবাদের শাখা-সিঁদুর পরিয়ে এ-পাপ হলো, আমি সর্বস্বান্ত, প্রতারিত, লাঞ্ছিত হলাম।'

নৈরাশ্যভাব বিদ্যাসাগর চরিত্রের দুর্বলতা নয়, সরাসরি মানবপ্রীতির তা অবশ্যম্ভাবী মানসিক পরিণাম। আদর্শবাদী মন কবি শেলীর স্কাইলার্কের মতন, অস্তীতিবাদে আছে নির্মম বাস্তবতার স্বাদ, বিবমিষা (nausea)।

[৩]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবপ্রীতি এবং পুরাতন system-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং কর্মপ্রৈতি আধুনিক নৈতিকতার গুণে বিশিষ্ট। এখনও জোর করে বলা চলে তা ভাবী কালকেও প্রত্যাখ্যান করবে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিদ্যাসাগরই এদেশে মূল ব্যক্তিত্ব (magnum opus) ছিলেন। প্রতীচ্যের সমাজ-সংস্কার এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ এসে এ দেশের নাগরিক জীবনকে জঙ্গম করে তুলেছিল। সমাজ বিন্যাসে ভিন্নতর আদর্শমুখী সচলতা (mobility) শুরু হয়েছিল। ডালহৌসি রেলপথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রচলিত করলেন। কলকাতায় গড়ে উঠ্‌লো একটি মধ্যবিত্ত নগর-সভ্যতা। প্রগতিশীল পরিবেশের প্রভাবে বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, সংস্কার-মুক্ত উদার, বিদ্রোহী মন একে একে পাপড়ি খুললো, কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় 'ঘ্রাণে পারিজাত' হলো। নিজের বিষয়ীত্ব বা চৈতন্য (subjectivity) দিয়ে তিনি সেই প্রগতিশীল শক্তিপুঞ্জকে বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে সংহত করলেন।

যাঁরা সত্যিকারের মানবপ্রেমিক, যাঁরা বিদ্রোহী তাঁদের কর্মনীতির আধুনিক ব্যাখ্যা না করে চিরকাল সনাতন মর্মরমূর্তিতে আবদ্ধ করে রাখলে, সে মূর্তি ভাঙবেই; মূর্তি বিচূর্ণ বা অপসৃত হলেও বিদ্যাসাগরের কর্ম-নীতি ছদ্মবেশে ভাবীকালকেও প্রেরণা জোগাবে। প্রমথনাথ বিশী সত্যই বলেছেন—বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাস্করশ্রেষ্ঠের বাটালীর অপেক্ষায় আছে, বিদ্যাসাগরচরিত্র প্লুটার্কের লেখনীর অপেক্ষায় আছে।

একজন বিপন্ন মহাকবি ও তাঁর বন্ধু

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল

১৮৬১ খৃস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনীসভার পক্ষ থেকে নিজ বাসভবনে যে প্রীতিসম্মিলনীর আয়োজন করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য এখন আর কারো অজ্ঞাত নয়। সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশ উপলক্ষে কবি মধুসূদনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনই এই সভার উদ্দেশ্য ছিলো। ঐতিহাসিক মূল্য যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এই সভার আরেকটি তাৎপর্য ছিলো—যদিও তা নেতিবাচক। সমকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের ভেতরে যাঁরা অগ্রগামী তাঁরা প্রায় সকলেই এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। 'প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমণ্ডলী,[১] কবি সংবর্ধনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই তালিকায় যাঁর অনুপস্থিতি বড়ো বেশি চোখে পড়ে, বলাই বাহুল্য, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ততদিনে বিদ্যাসাগর রচিত ও সঙ্কলিত ষোলখানা গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) থেকে সীতার বনবাস (১৮৬০) প্রকাশিত হয়েছে; অতএব সাহিত্যিক-সমাজে তিনি অপরিচিত ছিলেন, এ-কথা বলা যাবে না। আসলে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ছিলো অন্যত্র। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন

উপলক্ষে মধুসূদনের এই সংবর্ধনা, সেই ছন্দোরীতি সম্পর্কেই বিদ্যাসাগর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। তিলোত্তমাসম্ভব তাঁর মনে আদৌ উৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।* তবে আজন্ম প্রগতিশীল জীবনচর্চায় বিশ্বাসী বিদ্যাসাগর যে ক্রমশ অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে মত পরিবর্তন করছিলেন অন্যত্র তার প্রমাণ মেলে। তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট সোমপ্রকাশ পত্রিকায় তিলোত্তমাসম্ভবের প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয় এবং তিনি নিজেও অবশেষে 'condescended to see "Great merit" in it (তিলোত্তমা)।'[২] অমিত্রাক্ষরের বিজয়-উৎসবে উপস্থিত না থাকলেও বিদ্যাসাগর যে অচিরেই অমিত্রাক্ষর-ভক্তদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন, মধুসূদন স্বয়ং তা সহর্ষে রাজনারায়ণকে জানিয়েছেন, ১৮৬২ খৃস্টাব্দে, বীরাঙ্গনা রচনা-কালে:

> "You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection !"[৩]

এবং অমিত্রাক্ষর পাঠে অনভ্যস্ত হলেও বিদ্যাসাগর যে 'খাঁটি সামগ্রী' চিনতে ভুল করেন না পরবর্তী চরণেই সেই পরোক্ষ আত্মপ্রশস্তির আভাস লেগেছে,

> "...of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt."[৪]

কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মধুসূদনের উল্লসিত হবার নিগূঢ় কারণটি

বোধকরি অন্য কোথাও। এবং এই অনুমান যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ মধুসূদন নিজেই দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খোলামেলা ভাষায় :

> "He (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর) has taken great interest in my proposed vist to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject."[৫]

এবং শুধু তাই নয়,

> "He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property."[৬]

বিলেত যাওয়ার জন্যে যিনি কৈশোরে ধর্ম পরিবর্তন করেছেন[৭], পরিণত যৌবনে সেই অভিষ্টকে পাবেন ভেবেই তিনি উদ্বেল এবং এব্যাপারে যিনি তাঁকে সাহায্য করবেন তিনিই Great এবং বন্ধু তো বটেই। আর সেই বন্ধুত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই

> "I have dedicated the work (অর্থাৎ বীরাঙ্গনা কাব্য) to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man."[৮]

অথচ এই সব পণ্ডিতরা, যাঁরা মধুসূদনের কাব্যে শুধু 'উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে' বলেই দায় সেরেছিলেন, যে আদৌ কবিতা বোঝেন, এমন কথা মহাকবি উপরোক্ত চরণগুলি লেখার দুবছর আগেও স্বীকার করেন নি। এবং বিদ্যাসাগর যে ঐ সব পণ্ডিতপুঞ্জের বহির্ভূত, এমন

কথাও বলেন নি।* আসলে, অনুমান করি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আগে অর্থাৎ মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার-আগে মধুসূদনের পরিচয়ই হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। প্রথমত দুজন দুই সমাজে সংলগ্ন ছিলেন। যে-সময়টায় মধুসূদন পিতৃদত্ত আর্থিক নিরাপত্তার ভেতরে থেকে হিন্দু কলেজের বিপ্লবী আবহাওয়ায় বেড়ে উঠছেন, এবং হিন্দু কলেজ ছেড়ে খৃস্টান হয়ে বিশপস কলেজে চলে যাচ্ছেন, সে সময়ে বিদ্যাসাগর রীতিমতো জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত, সংস্কৃত কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের দায়িত্বে আসীন হয়েছেন। পারিবারিক স্নেহের নোঙর ছিঁড়ে মধুসূদন যখন মাদ্রাজের পথে পাড়ি জমিয়েছেন, বিদ্যাসাগর তখন দেশীয় সমাজেই প্রতিষ্ঠা সন্ধান করছেন। এবং মধুসূদন যখন মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে পুলিশ কোর্টে সামান্য কেরানির চাকুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছেন, বিদ্যাসাগর ততদিনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। কেবল গ্রন্থকার হিসেবেই তখন তাঁর মাসিক আয় দুই/তিন হাজার টাকা। সব মিলিয়ে দুইজন যেন দুই বলয়ে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার পরে বন্ধু ও উর্ধ্বতন কর্মচারী কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাড়িতে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য আসরগুলিতেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্য-প্রীতির দীক্ষা নিচ্ছিলেন, অনুমান করি।[৯] এবং এই সাহিত্যচর্চার সূত্র ধরেই খুব সম্ভব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক না, মধুসূদনের প্রতিভা সম্পর্কে যে তাঁর গভীর আস্থা ছিলো পরবর্তী ঘটনাবলীতে তারই সমর্থন মেলে। সুযোগ পেলে ব্যারিস্টারি

পরীক্ষায় মধুসূদন নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবেন জেনেই বিদ্যাসাগর তাঁকে যাবতীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত কর্মযোগী বিদ্যাসাগর মধুসূদনের একমাত্র বন্ধু ছিলেন না। কলকাতার অভিজাত সমাজের অনেকেই মধুসূদনের সঙ্গ কামনা করতেন, এবং তাঁর উপকারে আসতে চাইতেন। বস্তুত মধুসূদনের জীবনের এটাই চূড়ান্ত মহিমামণ্ডিত কাল। সুন্দরী বিদেশিনী স্ত্রী, দুটি সন্তান, পৈতৃক সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকার, সাহিত্য-সমাজে বিপুল খ্যাতি—মহাকবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত যাবতীয় ঐশ্বর্যকে যেন একযোগে করতলগত করেছিলেন। কিন্তু পরিতৃপ্তি ও প্রতিভার সহবাস বোধ করি প্রায় অসম্ভব। নইলে ঠিক এই সময়েই মধুসূদন কেন মনে করলেন যে তাঁর কবি-জীবন is drawing to a close[১০] এবং কাব্যদেবী (Muse)-কে বিদায় দিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যেতে হবে?

অবশেষে ১৮৬২ খৃস্টাব্দের ৯ই জুন মধুসূদন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজে সাগর পাড়ি দিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কলকাতায় থাকলো। ব্যবস্থাটা হলো এই রকম যে পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের স্ত্রীপুত্রকে মাসিক দেড়শত টাকা করে দিতে থাকবেন, মধুসূদনকে কিছু টাকা অগ্রিম দেবেন এবং পরে নিয়মিত য়ুরোপে একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা পাঠাবেন। এই ব্যবস্থা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার তত্ত্বাবধানের জন্যে মধুসূদনের প্রতিভূ নিযুক্ত হলেন দুইজন[১১]—রাজা দিগম্বর মিত্র এবং বৈদ্যনাথ মিত্র। লক্ষণীয় যে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সম্পত্তি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে দেবেন, এরকম কথাবার্তা আগে হয়ে থাকলেও কার্যত মধুসূদনের পুরনো বন্ধু এবং গুণগ্রাহী দিগম্বর মিত্রই এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। বিদ্যাসাগর আবার নেপথ্যে অন্তর্হিত

হয়েছেন। এতে অবাক হবার কিছু ছিলো না; কারণ দিগম্বর মিত্রের প্রতি মধুসূদনের যেমন গভীর শ্রদ্ধা ছিলো, মিত্র মহাশয়ও তেমনি শৈশব থেকেই মধুসূদনকে স্নেহের চোখে দেখতেন।[১২]

১৮৬১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকেই মধুসূদন ইংল্যাণ্ড গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু যে আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাসে তিনি এতো বড়ো ঝুঁকি নিলেন, অচিরেই তার ভিত্তি টলে উঠলো। পত্তনিদার শুধু যে তাঁকেই টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন তাই নয়, তাঁর স্ত্রী ও শিশু দুটির সঙ্গেও তিনি সদ্ব্যবহার করেননি। অতিষ্ঠ হয়ে দুটি শিশু সন্তানসহ হেনরিয়েটা কোনো রকমে কলকাতা ছেড়ে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ২রা মে ইংল্যাণ্ড গিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন। মধুসূদন সবচেয়ে স্তম্ভিত হয়েছেন দিগম্বর মিত্রের আচরণে। কেন না মিত্র মহাশয় যদি তাঁর প্রভাব বিস্তার করতেন তাহলে কখনোই এমন হতে পারতো না। এমন কি ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২রা জুন পর্যন্ত মধুসূদনকে পত্তনিদার কোনো অর্থ পাঠান নি, তবুও দিগম্বর মিত্র নীরব। সহায়-সঙ্গতিহীন প্রবাসী এই মহাকবি তখন যেন নিজের কাব্যেরই চরিত্র—ডানা-কাটা নির্যাতিত গরুড়। এবং দুঃসময়ে যিনি তাঁকে রক্ষা করতে পারেন, তিনি গৌরদাস বসাক নন,

রাজনারায়ণ বসু নন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নন—বিদ্যাসাগর। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় খুব বেশি হলে ছ'বছরের (১৮৫৬—৬২) এবং দুজনের সামাজিক বলয়ের ভিন্নতা হেতু সেই বন্ধুত্ব কতখানি দানা বেঁধেছিলো, তাও ভেবে দেখতে হবে। মধুসূদনের স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায় যে ১৮৬২ খৃস্টাব্দের অগস্ট থেকে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ১লা জুনের ভেতরে তিনি বিদ্যাসাগরকে কোনো চিঠি লেখেন নি। কিন্তু যখন প্রত্যাশার সমস্ত 'দেউটি' একে একে নিভে গেছে, তখন কোনো রকম ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াই সেই নেপথ্যবাসী আড়ম্বরহীন লোকটির কাছে আজীবন ঐশ্বর্যের চারণ মহাকবি আত্মসমর্পণ করেছেন :

> "If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you for so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends."[১৩]

সন্দেহ নেই, বিশেষণ ব্যবহারে মধুসূদনের স্বাভাবিক ও সহজাত পটুত্ব এই চরণগুলিতেও অটুট ; কিন্তু এই চিঠি লেখার সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থার কথা স্মরণ করলে এটা স্বীকার করতেই হবে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আনুষ্ঠানিকতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেও[১৪] স্বদেশের সুহৃৎ-সমাজে তিনিই যে একমাত্র 'অসাধারণ' ব্যক্তি, মধুসূদনের এই উপলব্ধি কৃত্রিম নয়। দেশে থাকতে দিগম্বর মিত্রকে তিনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসের মর্যাদা মিত্র মহাশয় রক্ষা করেন নি। দায়িত্বহীনতার ভেতর দিয়ে তিনি প্রমাণ

করেছেন যে তিনি ব্যক্তি হিসেবে একেবারেই সাধারণ এবং পরিণামে মধুসূদন যে অপরিমেয় দুর্দশার ভেতরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তা থেকে শুধু বিদ্যাসাগরই তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন। যে প্রবল কর্মশক্তি এবং সিংহ-হৃদয় নিয়ে বীরসিংহের সৈনিক একদা বিধবাবিবাহের মতো দুরূহ সমাজসংস্কার-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনে কৃতকার্য হয়েছিলেন, মধুসূদন অনুরোধ করেছেন যেন সেই উদ্যম ও দৃঢ়তা এ ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর প্রয়োগ করেন :

"You must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart."[১৫]

বিদ্যাসাগরের পৌরুষ ও প্রতিভার নিত্যসঙ্গী যে কর্ম শক্তি তাকে চিনতে মধুসূদনের বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

এবার এই সময়ে মধুসূদনের আর্থিক অবস্থার চেহারাটা একটু দেখা যাক। হেনরিয়েটা ইংল্যাণ্ডে পৌঁছনোর (২রা মে, ১৮৬৩) দিন থেকে ২রা জুন, ১৮৬৪ পর্যন্ত মধুসূদন ভারত থেকে একটি পয়সাও পত্তনিদারের কাছ থেকে পান নি। লণ্ডনে জীবন-যাপন ব্যয়-সাপেক্ষ বলে তিনি ফ্রান্সে চলে এসেছেন এবং সেখানেও আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গেছেন। আশঙ্কা করছেন অবিলম্বে তাঁকে দেনার দায়ে ফরাসি সরকারের জেলে যেতে হবে, এবং তেমন অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় খুঁজতে হবে কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। অথচ তখনো পত্তনিদারের কাছে তাঁর ৪০০০ টাকা পাওনা।[১৬] বিদ্যাসাগর যেন একটি দিনও নষ্ট না করে তাঁর (মধুসূদনের) যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি কলকাতা ল্যাণ্ড মর্টগেজ সোসাইটির কাছে বন্ধক রেখে কবিকে টাকা পাঠিয়ে দেন। অন্যথায়

"I must perish and I do not think you will suffer me to do ."[১৭]

২রা জুন, ১৮৬৪ থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬, এই দু'বছরে য়ুরোপ থেকে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে অন্তত পক্ষে ২১ খানা চিঠি লেখেন। ১৩ খানা চিঠি ফ্রান্স থেকে লেখা, ৭ খানা লণ্ডন থেকে।[৮] আলোচ্য সময়ে য়ুরোপ থেকে চিঠি লিখে উত্তরের জন্যে পত্রলেখককে কমপক্ষে দুমাস সময় অপেক্ষা করতে হতো। বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠি (২রা জুন, ১৮৬৪) লেখার পর মধুসূদন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। দারুণ অর্থাভাব ও সহজাত অস্থিরতাবশত তিনি একের পর এক ৭ খানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে। কোনো উত্তর না পেয়েও। এই চিঠিগুলির ৫টিতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে my dear sir বলে সম্বোধন করেছেন, দুটিতে my dear friend. এটি তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্যে যে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কোনো উত্তর না-পেয়ে মধুসূদন যে তাঁর বন্ধুত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অভিমানী হয়ে উঠেছিলেন (সন্দিগ্ধ না-হলেও), এমন ভাবার কারণ আছে। মধুসূদন সপ্তম চিঠিখানা লেখেন ১৮ই অগস্ট, ১৮৬৪ তারিখে। ২রা জুন থেকে ১৮ই অগস্টের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অন্তত একখানা চিঠি তিনি হয়তো আশা করেছিলেন। এই আশাভঙ্গজনিত কারণেই কি দুবার 'প্রিয় বন্ধু' (তৃতীয় ও ষষ্ঠ চিঠি) সম্বোধন করেও আবার 'প্রিয় মহাশয়ে' প্রত্যাবর্তন? এই অনুমান যে অসঙ্গত নয় তার প্রমাণ, অষ্টম চিঠি থেকে শেষ চিঠি পর্যন্ত মধুসূদন আর কখনো বিদ্যাসাগরকে my dear sir বলে সম্বোধন করেন নি। বরং my dear friend এর সঙ্গে যোগ করেছেন আরো অনেক বিশেষণ যার ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বে তাঁর (মধুসূদনের) গভীর আস্থা-ই প্রতিফলিত হয়েছে।[১৮] অষ্টম চিঠিটি তাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই

চিঠিতেই জানা গেলো, বিদ্যাসাগর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কোনো অগ্রিম শ্রুতিমধুর আশ্বাসবাণী না-পাঠিয়ে একবারে ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই অর্থ প্রাপ্তির এক ঘণ্টা আগে মধুসূদনের স্ত্রী যখন সাশ্রুনয়নে স্বামীকে বলছেন, 'ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চায়, কিন্তু আমার হাতে আছে মাত্র ৩ ফ্রাঁ। ভারতবর্ষের এই লোকগুলো আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছে, বলো ?' মধুসূদন তখন ভেঙে পড়েন নি, আশ্চর্য প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'আজকে ডাক-আসার দিন। আমি বলছি আজকে একটা খবর পাবোই ; কারণ আমি যাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁর ব্যক্তিত্বে আছে প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি আর বাঙালী মায়ের কোমলতা।'[১৯] সম্ভবত বিদ্যাসাগরচরিত্রের মূল্যায়নে পরবর্তীকালের আর কোন চরিতকার এতো নির্ভুল রায় দেন নি। ইতিপূর্বে এক চিঠিতে (তৃতীয় চিঠি)[২০] মধুসূদন লিখেছিলেন :

> "I hope...that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karunasagara also !"

অবশ্য তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের আগেই প্রকাশিত (১লা অগস্ট, ১৮৬৬ খৃঃ) 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটিতে মধুসূদন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্যকেই যেন কবিতার পরিভাষায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন—

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু।[২১]

চতুর্দশপদীর আঙ্গিককাঠিন্যকে অতিক্রম করে মধুসূদনের অভিজ্ঞতা যেন নির্মল দ্যুতির মতো বিচ্ছুরিত হয়েছে এইসব চরণে। ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টিধর্মিতা। এই কবিতায় মধুসূদন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অন্যান্য যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন (যথা, হিমালয়, নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী, দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল ইত্যাদি) তার সূত্রপাত যেন ঐ অষ্টম চিঠি থেকেই। যে গভীর আস্থার উপলব্ধি থেকে তিনি লিখেছিলেন

"I think I may now safely say that my troubles are at an end, for the future service I am in your hands"[২২]

যেন আলাদা আলাদা উপমায় সেই বিশেষ বোধেরই শরীরী রূপ ঐ কবিতায় গেঁথে উঠতে দেখি।

নবম (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪) চিঠিতেই জানা যাচ্ছে কবি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আরেকটি চিঠি পেয়েছেন। বিচক্ষণ বিদ্যাসাগর তাঁকে ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রাখতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে অন্য এক বন্ধু মধুসূদনকে টাকা ধার দিতে সম্মত হয়েছেন। দিগম্বর মিত্রের আচরণের স্মৃতি তখনো তাঁর মনে সজীব ক্ষত, অতএব আবার অন্য কোন বন্ধুর ওপরে নির্ভর করতে সাহস হয় না। তবুও

"I am quite content to give up the idea of mortgaging my property in the way I once thought of and to leave every thing in your hand for I look upon you as a tower of strength"[২৩] এবং

"The friend who has undertaken to advance money, is very kind indeed but why should a man be surprised to find friends when you are his friend ?"[২৪]

বিপন্ন মধুসূদনকে সাহায্য করতে বিদ্যাসাগর পরম বন্ধুর মতোই এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পত্তনিদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি মধুসূদন যে সব রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন বিদ্যাসাগর তার প্রতিবাদে কবিকে 'শালীন' ভাষায় ভর্ৎসনা করতে ভোলেননি।[২৫]

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা (দশম) চিঠিতে জানা গেলো মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আরো ২,৪৯০ ফ্রাঁ পেয়েছেন।[২৬] কিন্তু এই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে যে বড়ো রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছে সে-সম্পর্কে এই চিঠিরই অন্যত্র স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।[২৭] সেই সঙ্গে এ বিষয়েও উল্লেখ আছে যে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের পক্ষে সমস্ত দলিলপত্র সম্পাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে Power of Attorney চেয়েছিলেন আলোচ্য চিঠির সঙ্গেই মধুসূদন তা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার তো সামান্য ব্যাপার, সবচেয়ে প্রিয়জন এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত তিনি বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিতে সব সময় প্রস্তুত।[২৮] ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে লেখা (একাদশ) চিঠিতে দেখা যাচ্ছে মধুসূদন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে মার্চের শেষ ডাকে যদি অন্তত ৩০০০

টাকা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে না পান তাহলে তিনি লণ্ডনে ফিরে লেখাপড়া শুরু করতে পারবেন না।[২৯] ঠিক একই সময়ে (২৬.১.১৮৬৫) বন্ধু গৌরদাস্ বসাককে এক চিঠিতে কবি লিখেছেন :

> "my distinguised friend, Ishwar Chandra Vidyasagar, has taken me by the hand ; if you ask him he will tell you how shabbily I have been treated."[৩০]

একই সময়ে লেখা হলেও বিদ্যাসাগরের কাছে লিখিত চিঠিতে মধুসূদন মাত্র দুদিন পরে আসন্ন 'হিলারি' টার্ম-টি অর্থাভাবে হারানোর দুশ্চিন্তায় বিব্রত[৩১], আর গৌরদাসের কাছে লেখা চিঠি যেন সেই প্রাণচঞ্চল, রঙ্গপ্রিয় মহাকবির উদার আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি।[৩২] সেখানে ব্যক্তিগত সমস্যা সঙ্কটের স্পর্শমাত্র নেই। এ থেকে অন্তত এটুকু সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আবাল্যের বন্ধু গৌরদাসের প্রতি মধুসূদনের স্নেহ-মমত্ব-ভালোবাসা যতো গভীরই হোক না, সঙ্কটে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর ক্ষমতা, তাঁর মতে, একমাত্র বিদ্যাসাগরেরই আছে।

১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে আরেকটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে জানতে পারি মার্চের শেষে প্রার্থিত ৩০০০ টাকা তিনি পান নি। এবং এবার ৩০০০ টাকা নয়, অন্যান্য খরচের হিসেব দিয়ে মধুসূদন ৫০০০ টাকা চেয়েছেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর যে কবির দ্বারা নতুন করে অর্থ সংগ্রহ করতে অনুরুদ্ধ হয়েছেন তার প্রমাণ :

"As for my old debts, you must make the best arrangements you can think of, for I give all power over the little I have. Only save me from the horrid gulf before me."[৩৩]

সম্ভবত এ সময়েই ৮০০০ টাকা বিদ্যাসাগর মধুসূদনের জন্য নিজের দায়িত্বে (জাস্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: ৫০০০; শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ৩০০০) ধার করেছিলেন।[৩৪] কিন্তু এই অর্থ মধুসূদনের কাছে বারিধিতে বিন্দুপাতের মতোই। এই জন্যেই নতুন ঋণের প্রয়োজন এবং ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে বিদ্যাসাগরকে এজেন্ট নিযুক্ত করে মধুসূদন তাই ওকালতনামা বা Power of Attorney পাঠালেন।[৩৫] ইতিপূর্বে কবিকে ভূসম্পত্তি বন্ধক অথবা বিক্রির ব্যাপারে উৎসাহ না দিলেও[৩৬] পরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বিষয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বন্ধক রেখে ১২ হাজার টাকা নিয়ে য়ুরোপে পাঠিয়ে দিলেন।[৩৭] ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে মধুসূদনের অর্থসঙ্কট কেটে গেছে। তিনি ফ্রান্স থেকে লণ্ডনে চলে গেছেন এবং আইন অধ্যয়নে মনোযোগ দিয়েছেন।[৩৮] সম্ভবত একারণেই '৬৫ সালের অবশিষ্ট মাসগুলি

মধুসূদন নীরব। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে, দেখা যাচ্ছে, আবার তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখছেন। তবে এবারে লণ্ডন থেকে। এবং তা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনখানা চিঠি এবং সর্বশেষ চিঠির সঙ্গে ৬০ পাউণ্ডের একটি ব্যাঙ্ক-ড্রাফট পাওয়ার পর।[৩৯] মধুসূদন যে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে প্রবাসজীবনের বাকি সময়টা নিয়মিতভাবে টাকা পেয়েছেন পরবর্তী চিঠিগুলিতে তার উল্লেখ মেলে। কিন্তু কবির অর্থাভাব যেন শেষ হবার নয়। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে লেখা চিঠিতে আবার লক্ষ্য করি তিনি নিদারুণ অর্থসঙ্কটে পতিত। এবং আবার সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—

"I see nothing but ruin before me !"[৪০]

তৎসহ বিদ্যাসাগরের প্রতি কাতর অনুরোধ

"Remember, my dear and **only** friend, you rescued me from ruin once. Do not abandon me now."[৪১]

এই চিঠির শেষাংশে মধুসূদন পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together !"[৪২]

অবশেষে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর সেই বিশেষ দিনটি— কলকাতায় ফেরার দিন—দৃষ্টিগোচর হলো। ঐ দিন মধুসূদন গ্রে'জ্

ইন্‌ থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরের ৯ তারিখে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখলেন :

"I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you."[৪৩]

এই চিঠিতে মধুসূদন প্রস্তাব করলেন যে তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে ফ্রান্সে রেখে তিনি একাই কলকাতা ফিরবেন। কারণ আইনজীবী হিসাবে প্রথমদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠা যেহেতু সংশয়িত হতে বাধ্য। অতএব স্ত্রী-পুত্রকে সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সে রেখে আসাটাই ভালো—কেননা

"Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects."[৪৪]

কলকাতায় পৌঁছে মধুসূদন কোথায় উঠবেন ? বিদ্যাসাগরের বাসগৃহের একটি ছোট্ট কক্ষে ? না। ব্যারিস্টার মধুসূদন মনস্থ করেছেন :

"...to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *khitmutgar* till "briefs" begin to come in."[৪৫]

কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে কলকাতায় পৌঁছনোর আগে যদি জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয় ? তেমন পরিস্থিতিতে

"...my wife and children will have no one to look to but yourself"[৪৬]

এবং কবি মধুসূদন নিশ্চিত যে বিদ্যাসাগর

"...will take the same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother."[৪৭]

১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এলেন।[৪৮] বিদ্যাসাগরের নিষেধসত্ত্বেও স্ত্রী-পুত্রকে য়ুরোপে রেখে তিনি একাই ফিরে এলেন।[৪৯] একজন বিলেত-প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত লোক বাস করতে পারেন এমন একটি বাড়ি আগেই ভাড়া নিয়ে বিদ্যাসাগর য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলেন, তাঁর 'বড় সাধ, মধুসূদন আসিয়া সেই বাড়িতে বাস করিবেন'[৫০] কিন্তু সেই বাড়ি অমনি পড়ে থাকলো, মধুসূদন হোটেল স্পেন্সেস-এ গিয়ে উঠলেন।[৫১] বিদ্যাসাগর তাঁকে নিজের নির্বাচিত গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে হোটেলে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।[৫২] ব্যারিস্টার মধুসূদনের আচরণের এই নির্মমতার অন্তরালে বিদ্যাসাগর বোধ করি কবি মধুসূদনের শিশুসুলভ অসঙ্গতিই দেখেছিলেন। তাই পরবর্তী ছ' বছর[৫৩] মধুসূদন যতবার তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, বিদ্যাসাগর ততবার এগিয়ে এসেছেন একবার ছাড়া কোনোবারই তাঁকে বিমুখ করেন নি। হাইকোর্টে তাঁর প্রবেশ সহজসাধ্য হয়নি। নিন্দুকরা বিচারপতিদের মন আগেই বিষিয়ে দিয়েছিলেন, সে কারণে হাইকোর্ট যখন মধুসূদনকে তাঁর character and good repute সম্পর্কে আরো সুপারিশ পত্র পাঠাতে নির্দেশ দিলেন, তখন মধুসূদন আবার বিদ্যাসাগরকেই চিঠি লিখলেন এবং সেটা ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে। এই চিঠিতে মধুসূদনের কণ্ঠ করুণ, এমন ঘটনা ঘটতে পারে তিনি কখনো ভাবেন নি, এবং এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর যেন হয়

কলকাতায় নিজে চলে আসেন অথবা তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দেন।[৫৪] মাত্র দু'মাস আগে মধুসূদনের আচরণে বিদ্যাসাগর যে আহত অথবা রুষ্ট হয়েছিলেন তার কোনো প্রমাণ তাঁর ব্যবহারে ফুটে ওঠেনি। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে মিলিতভাবে ২০শে এপ্রিল তারিখেই এক জোরালো প্রশংসাপত্র তিনি মধুসূদনকে অর্পণ করেছেন।[৫৫] মধুসূদন ৩রা মে ১৮৬৭ তারিখে হাইকোর্টে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন[৫৬] এবং অভিজাত বন্ধু-বান্ধব, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠার হাত ধরে তাঁর কাছে আবার ফিরে এসেছে। এই জীবন-পরিমণ্ডলে বিদ্যাসাগরের কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। কিন্তু একদিকে মধুসূদনের অপরিমিত পান-ভোজন-উৎসব, য়ুরোপপ্রবাসী স্ত্রী-পুত্রের জন্যে নিয়মিত হারে অর্থপ্রেরণের দায়, তদুপরি যুক্ত হলো পুরনো ঋণের ভার। বস্তুত আবার বিদ্যাসাগরকেই তিনি (মধুসূদন) স্মরণ করলেন। কারণ ?

> "If you (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর) had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account."[৫৭]

কিন্তু বিদ্যাসাগর বাঙালী হতে পারেন, তাই বলে তিনি তো সাধারণ লোক নন, অতএব মধুসূদনের অসঙ্গত আচরণের কথা তিনি মনে রাখবেন কেন—? সাধারণ লোক হলে তিনি (বিদ্যাসাগর) হয় তো বলতেন :

> "Bah, he has been doing the aristocrat, let him suffer for his folly !"[৫৮]

কিন্তু বিদ্যাসাগর যে অসাধারণ ব্যক্তি, first man among us, অতএব সঙ্কটে কেন তিনি সহায় হবেন না? এদিকে ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরেই এক দুর্ঘটনার ফলে বিদ্যাসাগর যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়।[৫৯] মধুসূদনের জন্যে অনুকূল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্রের কাছে নিজ দায়িত্বে যে টাকা ধার করেছিলেন মধুসূদন দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তা শোধ দেওয়ার কথা ছিলো। উত্তমর্ণদের ভেতরে শ্রীশচন্দ্রই সম্ভবত বেশি অস্থির হয়ে পড়েন। সমকালীন বাঙালীসমাজে বিদ্যাসাগরের প্রতিশ্রুতির অন্যথা ঘটে না এমন সংস্কার ছিলো। কিন্তু বিদ্যাসাগর উত্তমর্ণদের আচরণে স্পষ্টতই আতঙ্কিত হয়েছেন এই ভেবে যে তিনি 'অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত'[৬০] হবেন। সম্ভবত এই একবার—এবং একবারই—সেই Tower of Strength-এ যেন ক্ষীণ আন্দোলন চোখে পড়েঃ "এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনাদের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরার পরিত্রাণ করেন।"[৬১] মধুসূদন যে বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে বিচলিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে এই চরণেঃ

> "You know that there is scarcely any thing in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden."[৬২]

কিন্তু মধুসূদন যাই বলুন না, বিদ্যাসাগর, জীবনীকারের কথা মেনে নিলে, এই সময় মধুসূদনের জন্যে কৃত ঋণ পরিশোধের জন্যে তাঁর আয়ের

অন্যতম উৎস সংস্কৃত প্রেসের ⅓ অংশ বিক্রি করে দেন।[৬৩] অবশ্যি ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধের জন্যে মধুসূদন তাঁর ভূসম্পত্তি, চক মুনকিয়া ও চক গদার ডাঙা মহাল দুটি ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন।[৬৪] অতঃপর ১৮৬৮ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে মধুসূদন, দেখা যাচ্ছে, আবার বিদ্যাসাগরকে লিখছেন। এবার সম্বোধন অন্তরঙ্গতায় ঘন হয়ে Vid., তিনি যেন লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের কাছে ছোট আদালতের বিচারপতির পদের জন্যে মধুসূদনের নাম সুপারিশ করেন। কেনই বা করবেন না, বিদ্যাসাগর তো দুর্বাসার বংশধর নন, আর মধুসূদনও নিশ্চয় এমন কোনো বোকামি করেননি যা

> "...could turn away that noble heart from your very loving but unfortunate..."

এ-চাকুরি মধুসূদনের হয়নি, কারণ ঐ পদে-আসীন ফেগ্যান সাহেব আরো ছ'বছর পর অবসর গ্রহণ করেন। প্রবাসে অর্থকষ্ট হওয়ায় ১৮৬৯ সালের মে মাসে মধুসূদনের স্ত্রী সন্তান দুটিসহ কলকাতা এসে পৌঁছলেন। এবার মহাকবিকে হোটেল ছেড়ে দিতে হলো। ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তখন তাঁর আয় মন্দ নয়। তবু ১৮৭০ সালের জুন মাসে মধুসূদন ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে হাইকোর্টে প্রিভিকাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদে যোগ দিলেন। এই পদে মাসিক বেতন ছিলো এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা।[৬৭] কিন্তু মধুসূদনের জীবনে সাচ্ছল্য তাই বলে আর ফিরে আসেনি। বরং তিনি আরো

ঋণজালে অচিরেই জড়িয়ে পড়লেন এবং আবার বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। সেটা ১৮৭২ সাল। তাঁর চিঠির উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন:

My dear Dutt,

I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one—No exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch works. I am very unwell and am therefore unable to write.

Yours sincerely,

30th Sept. 72. Iswara Chandra Sarma.

ঈশ্বরচন্দ্রের কণ্ঠে স্বয়ং ঈশ্বর যেন কথা বলেছিলেন। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মধুসূদন আর এক বছরও বাঁচেন নি। বিদ্যাসাগরের এই চিঠিতে মধুসূদন কি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন? জানা যায় না। তবে সম্ভবত এই একটিমাত্র চিঠিতেই দেখি বিদ্যাসাগর যেন আত্মসমর্পণ করেছেন, ভাগ্যের কাছে, প্রতিপক্ষের কাছে, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ, সহানুভূতি ও প্রশ্রয় কি শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় পরিণত হয়েছিলো? তাই বা কী করে বলি। মহাকবির মৃত্যুর পর তাঁর অস্থিপঞ্জর রক্ষণ ও 'তদুপরি কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন' প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তরা যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন। এই বলে ফিরিয়ে দিলেন 'প্রাণপণ চেষ্টা করে যার প্রাণ রাখতে পারিনি, তার হাড় রাখার জন্যে আমি ব্যস্ত নই।' জীবনীকার লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের চোখ তখন অশ্রুশূন্য ছিলো না।

বি দ্যা সা গ র ঃ এ ক টি ব্য ক্তি ত্ব

মযহারুল ইসলাম

অগস্ত্যযাত্রা বলে একটি কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মুনিবর অগস্ত্য এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে বিন্ধ্যাচল পর্বতকে তিনি আদেশ করলেন যে-পর্যন্ত তিনি ফিরে না আসেন সে পর্যন্ত পর্বত যেন মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্বত অবনত মস্তকে এই ব্যক্তি-পুরুষের আদেশ মান্য করেছে এবং এখনো অবনত মস্তকেই সেই ঋষি অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষায় কালযাপন করে চলেছে। তিনি আজো ফিরেন নি। বাংলা দেশে, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ছিলেন এমনি একটি ব্যক্তিত্ব। অগস্ত্যের ন্যায় বিদ্যাসাগরের আদেশে পর্বত মাথা নত করেনি ঠিক, কিন্তু অনেক অসম্ভব তাঁর অনমনীয় ও কারুণ্যমাখা ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সম্ভব হয়েছে।

বাংলা দেশে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের সবিশেষ অভাব—বড়ই দুর্ভিক্ষ। বাংলার পলিমাটিতে অজস্র তরুলতা গুল্ম ও ফসল যেমন উৎপন্ন হয়, মানুষও তেমনি সৃষ্টি হয় ঝাঁকে ঝাঁকে, যাদের অধিকাংশই আগাছা, গাছ নয়। তারই ফলে আজ দুহাজার বছর হলো বাঙালী শাসিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে, কিন্তু শাসনের মানদণ্ড হাতে নিয়ে অপর জাতি ও দেশকে শাসন করাতো দূরে থাক, নিজের দেশেও বাঙালী কোনদিন নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতে সমর্থ হয়নি। যুগে যুগে আমাদের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য আমাদের উর্বর মৃত্তিকা যেমন দায়ী, আমাদের ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষও তার চেয়ে কম দায়ী নয়। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে।

ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষপীড়িত এই দেশে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। বিস্ময়কর এই জন্য যে এমন ঘটনা আমাদের দেশে একটি যুগের সীমারেখার মধ্যে সচরাচর ঘটে না। হতাশাব্যঞ্জক এই জন্য যে তাঁর সমসময়ে অনেকেই সাধারণ মেধা, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তরল চেতনা নিয়ে রক্ষণশীলতার একটি প্রাচীর নির্মাণ করে সমাজে দিব্যি কিছু একটা করে খাচ্ছিলেন, জাঁকিয়ে বসে আগুন মূল্যে নিজের দর হাঁকছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে সে-ব্যাপারটা আর সহজসাধ্য রইল না —ব্যক্তিত্বের মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে কখন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল সবকিছু। মোল্লা-মৌলভী পুরুতঠাকুরের প্রতিপত্তিভিত্তিক সমাজে নির্বিচারে 'হাঁ', 'যথার্থ' প্রভৃতির ক্ষেত্রে 'কিন্তু', 'কেন' ইত্যাদি সর্বনাশা চেতনার বিকাশ হয়ে দুপয়সার বাজার বেমালুম মাটি হতে বসলো। সে কারণেই হতাশা, সে কারণেই বিরাগ-বিরক্তির চীৎকারে সমাজপতিরা মুখর হয়ে উঠলো। বিদ্যাসাগরের এদেশে জন্মলাভ তাই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার হলেও তাঁর নিজের পক্ষে কতটা সৌভাগ্যের ছিল, সে কথা বলতে পারি না। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, বৃদ্ধ বয়সেও এদেশে বলেই বিদ্যাসাগরকে তাঁর কলমকে লাঠিতে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল—এ দেশে জন্ম তাঁর সুখেরই হয়েছিল বটে।

বিদ্যাসাগরের কালে যেমন দেখা গেছে, অদ্যাবধিও তেমনি দেখা যায় যে সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় যাঁরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়, তাঁদের জ্ঞানের রাজ্যে প্রাচীর উত্থিত হয় এবং রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডূকতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি নানাবিধ উৎকট ব্যাধিতে তাঁরা নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অধ্যয়নকালে যেমন, অধ্যয়নসমাপ্তির পরে কর্মজীবনেও তেমনি এঁদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সমাজকে কিভাবে পেছন দিক থেকে টেনে ধরে বারো শত বছরের অথবা দু হাজার বছর পূর্বেকার জীবনব্যবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়। অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতের অধ্যাপক

ছিলেন, কিন্তু রক্ষণশীলতা বা কূপমণ্ডূকতার গ্লানি তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। জীবনে রক্ষণশীলতার জীর্ণ দুর্গকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই তিনি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এ যুগের একজন মনীষীর ন্যায় তিনিও গভীর প্রজ্ঞায় অনুধাবন করেছিলেন con-servatism is the grave of intelligence. জ্ঞানের রাজ্যে প্রাচীর উত্থিত না করে তিনি সাগরে অনুপ্রবেশ করেছিলেন—মনকে সংস্কারমুক্ত রেখেছিলেন, কেননা সত্যের আকর্ষণ, সুন্দরের সাধনা যদি মানসিক মুক্তি না প্রদান করে, যদি হৃদয়কে না প্রসারিত করে তবে তার সমস্ত আয়োজন ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য, এ কথা তিনি বিশেষভাবেই জানতেন। বিধবাদের বিবাহের কথা কেতাবে লেখা নেই বলেই তাদের প্রয়োজনবোধে বিবাহ দিলে আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়বে এমন কথা বিদ্যাসাগর যুক্তি দিয়ে জানতে পারেন নি। কেতাবী উক্তি যদি জীবনকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়, যদি যুক্তি দিয়ে কেতাবী উক্তিকে গ্রহণ করতে না পারি তবে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এবং জীবনকে মহানতম সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করবার খাতিরে যেন নিঃসঙ্কোচে সেই কেতাবী বিধান অস্বীকার করবার শক্তি অর্জন করতে পারি, এই শিক্ষাই বিদ্যাসাগর নিজেও লাভ করেছিলেন, আমাদের জন্যও দান করে গেছেন।

একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রবিন্দু থেকে যেমন ঝঞ্ঝা ও ঝড় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বও তেমনি প্রাথমিক বিন্দু থেকে তার পরিণতির দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। তিনি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের কঠোর সাধনা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার ফলে ধীরে ধীরে নিজেকে অসাধারণ হিসাবে নির্মাণ করেছিলেন। নিজেকে নিজ হাতেই তৈরি করেছিলেন। তিনি নিজেই নিজের প্রণেতা, অন্যের আবেদনে প্রণীত নন। বিদ্যা ও জ্ঞানের সাগরে তিনি উপনীত হয়েছিলেন বহু চড়াই-উৎরাই, নগর-জন-

পদ ও প্রতিকূল তরঙ্গ পেরিয়ে—কোন বাধাই, তাঁর যাত্রা পথে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। সাধনাই তাঁকে বিদ্যাসাগর করেছিল—আর বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে একজনই, এমন সাধনা বুঝি আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি একস্থানে বলেছি ঃ

> "রবীন্দ্রনাথের সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশাল এবং জনতার ভিড়ে আকীর্ণ হৃদয়, স্থির বিশ্বাস, চারিদিকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ইত্যাদি এবং আরো অনেক কিছু তাঁকে দিয়েছিল এমন এক শক্তি যা কালকেও শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করে গেছে। বলা বাহুল্য একালে আমরা আর কেউ বীর্যধর নই, আমরা পুতুলের মতো দুর্বল অথচ আত্মকথনে অভ্যস্ত, আমরা আমাদের সকল শক্তি দিয়েও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ ব্যাপার ছিল অনায়াসসাধ্য, তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার অকম্পিত আলোকরশ্মি বারংবার তাঁকে প্রথম সমুদ্র থেকে শুরু করে শেষ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তাঁর সুগ্রথিত আস্থার উত্তরাধিকারী আমরা নই—আর তাই নিঃসংশয়ে আমরা আমাদের হৃদয়কে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার এই কথাগুলো বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের বেলায়ও আমি আর একবার উচ্চারণ করতে চাই। বিদ্যাসাগর আমাদের ন্যায় স্পর্শকাতর শরীর ও সংক্ষিপ্ত পরিসর হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাই মায়ের জন্য দামোদর নদ অনায়াসে সাঁতরিয়ে পার হওয়া যেমন তাঁর পক্ষে সম্ভব, জাতিচ্যুত একজন প্রবাসী কবিকে সুদূর বিদেশে দীর্ঘ সময় সাহায্য করাও তাঁরই ন্যায় মহৎ পুরুষের উপযুক্ত কর্মই বটে। বাঙালী ভাবপ্রবণ, কিন্তু অপরের উপকারে তার অনীহা, অপরের জন্য কঠিন ত্যাগ স্বীকারে তার নিরুৎসাহ আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। আমরা নিজের জন্য বাঁচতে অভ্যস্ত, যার যার আখের গোছাতে আমরা সবাই সর্বদা গলদঘর্ম। এমন দেশে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব একটা ব্যতিক্রম তো বটেই। তাঁর চরিত্রের কার্যাবলীর এবং মানসিকতার বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনে এমন সব ঘটনা, এমন সব তথ্য এবং এমন সব নিদর্শন উদ্ভাসিত হয়, যা

পলিমাটির এই দেশে ঝাঁক ঝাঁক মানুষের মধ্যে তাঁকে একক মর্যাদায় চিহ্নিত করে। তিনি ছিলেন অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাব সম্পন্ন একজন মানুষ, সমাজের কুসংস্কার ও নীচতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী একজন পুরুষসিংহ, তিনি ছিলেন দুঃখীর দুঃখে এবং আর্তের সেবায় উৎসর্গিতপ্রাণ একজন বিনয়ী সেবক। এই সমস্ত এবং আরো বহুবিধ উচ্চ মানবীয় গুণসম্পন্ন চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্যই বিদ্যাসাগর এ দেশে সিংহপুরুষ, দয়ার সাগর, জ্ঞানের সাগর প্রভৃতি বিশেষণে খ্যাত হয়েছিলেন। এবং সুখের অথবা দুঃখের বিষয়, এ সব বিশেষণ ঐ একজনেই নিঃশেষিত। বাংলা দেশে পরবর্তীকালে দেশবন্ধু এসেছেন, বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে আমরা মুক্তির প্রেরণায় বর্তমানে উজ্জীবিত হয়েছি—কিন্তু বিদ্যাসাগর আর এলেন না। আসবেন বলেও ভরসা নেই।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের দিকে তাকালে তাদের দুর্বল চরিত্রের ছায়া আমাকে সর্বদাই অস্থির করে তোলে। যিনি সাহিত্যিক, যিনি শিল্পী, যিনি বুদ্ধিবৃত্তিকেই কাঁঠাল হিসেবে সমাজের মাথায় রেখে নিজের ভরণ-পোষণে লিপ্ত, তিনি মনে করেন সমাজের কল্যাণে, দেশের মঙ্গলে, সত্য কথা বলবার জন্য মুখ খুলবার ধৃষ্টতা কখনই যেন তাঁর না হয়। এই হলো আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের যথার্থ চারিত্র। সুখের বিষয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক হয়েও বুদ্ধিজীবীদের এই চরিত্রহীন স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদকে নিঃসংকোচে লাথি মেরে সমাজে ও দেশে সত্যভাষণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'তিনি যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে' বলে সেদিনের নিরাসক্ত বুদ্ধিজীবীদের কলম পেশা বৃত্তির জনৈক প্রতিনিধি বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করলেও সমাজসংস্কারে তাঁকে কেউ নিরস্ত করতে পারে নি। বিদ্যাসাগর জানতেন, জীবনধারণের জন্য যে তিনি গ্রহণ করুন না কেন, দেশের নাগরিক হিসাবে তাঁর সত্য

কথা প্রকাশের অধিকার কেউ কখনই কেড়ে নিতে পারে না। আমি অধ্যাপক হয়েছি বলে তো গোলামীর দাসখত লিখে দিই নি ; দেশের অকল্যাণ ও মৃত্যু চোখের সামনে দেখেও আমি উচ্চবাচ্য করবো না, এমন তো হতে পারে না। আমি সাহিত্যিক, আর সে কারণেই আমি সমাজের একজন অত্যন্ত সচেতন মানুষ—আমি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায়কে, শাসনকে, শোষণকে, নির্যাতনকে কি করে নির্বিচারে মেনে নিতে পারি ? মানবতার অপমান চোখের সামনে দেখে আমি চুপ করে থাকবো, তবু আমি বলবো এবং ভাববো যে আমি সাহিত্যিক ? সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর সাধনাই যদি সাহিত্যিকের সাধনা হয়, তবে যত বাধাই থাকুক, সত্যকে নিঃসংকোচে প্রকাশের দায়িত্ব কি আমার নয় ? অধ্যাপক বিদ্যাসাগর, সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর, শিল্পী ও স্রষ্টা বিদ্যাসাগর তাই অকুতোভয়ে সত্য কথা বলেছেন। আমাদের একালের চরিত্রহীন বুদ্ধিজীবীদের পীড়াদায়ক নিরাসক্তি ও নপুংসক নির্বিকারত্ব নিয়ে তাই আমরা হাত যত লম্বা করেই বিদ্যাসাগরের প্রোজ্জ্বল আলোক স্পর্শ করতে চাই না কেন আমরা ব্যর্থ হব, কেননা তিনি যে আমাদের নাগালের বাইরে অনেক উচ্চে দণ্ডায়মান একটি প্রভাময় সূর্য।

গ দ্য সা হি ত্যে বি দ্যা সা গ র

অজিতকুমার ঘোষ

এক

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই গদ্য তুলনামূলকভাবে নবীন। মানুষের আদিম ভাবপ্রকাশের ভাষা ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও সঙ্গীতের ভাষা। গদ্য এসেছে অনেক পরে—সমাজজীবনের অনেক উচ্চ ও জটিল স্তরে। এর একটা সহজ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। অধিকতর প্রাচীনকালে রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবভাগ্যের নিয়ন্তা হিসেবে মেনে নেয়া সহজ ছিল। তাৎক্ষণিক অস্তিত্বের দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন মানুষকে তখনও বিব্রত করেনি। প্রবহমান জীবনস্রোতে একক অস্তিত্বের ঘোষণা এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের স্থায়িত্বের অভিলাষই ছিল সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস। পদ্য এই সম্ভাবনাকেই নিশ্চিত করেছে, তাই সেটাই হয়েছে সাহিত্যের একমাত্র বাহন। কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি যখন মানুষকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে, তখনি সে তার নিজস্ব সমস্যাকে নিজের ভাষায় বিচারবিশ্লেষণের তাগিদ অনুভব করে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার নিয়ন্তা মানুষ স্বয়ং এবং তা কোনোভাবেই অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, তাই ছন্দোবদ্ধ ও কমনীয় পদমাধুর্যে তাদের ধরে রাখা সহজ হয় না। প্রয়োজন হয় অন্যতর বাক্যবিন্যাসের এবং তারই ফলশ্রুতি গদ্য।

এই জন্যেই গদ্যভাষার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়েছে আধুনিক যুগে; যখন জীবন হয়েছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুখর; বেড়েছে জীবনের জটিলতা ও সচলতা। সংঘাত, সংশয়, সন্দেহ, ভয় ও ঘৃণার এক জটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত আধুনিক মানুষ। সমাজ-সংঘাতের ফলে ভাবসংঘাত অনিবার্য আর এই ভাব-সংঘাতই সাহিত্যকে নতুন বাঁকে ঠেলে দেয়। সাহিত্য আধুনিক হয়ে

উঠতে থাকে এইভাবে। যেহেতু এই আধুনিকতা মানবনির্ভর এবং মানবভাগ্য এ অবস্থায় বহুলাংশে তার সামাজিক অস্তিত্বের সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী মানবসমাজ গদ্যকে করে নিয়েছে তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিশ্লেষণের প্রকৃষ্টতম বাহন।

এই সমাজতাত্ত্বিক কারণেই, মাত্র উনিশ শতকে এসে বাংলা গদ্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং সে কাজ করেছে ইংরেজ। বাংলা দেশে যখন ইংরেজের আগমন ঘটে, সেটা সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের যুগ। সমাজজীবন তখন ক্ষয়িষ্ণু, গতিশীলতার অভাবে পঙ্কিল। ইংরেজের আগমন এ দেশে সামন্ততন্ত্রের সেই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে। কেননা ইংরেজ এসেছে উন্নততর সামাজিক শক্তির বাহক হিসেবে, ধনিকবিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে। অথচ শোষণের স্বার্থে ইংরেজ এদেশে ধনিকবিপ্লব সঞ্চারিত করেনি, বরং গড়ে তুলেছে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা। ফলে সংঘটিত হয়নি নতুন যুগোপযোগী সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস। তবু এই প্রথম বাংলার স্থবির সমাজজীবন একটা প্রবল নাড়া খেলো, এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সূচনা হলো নবজাগৃতির। ইংরেজের বাহিত বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবে সমাজজীবনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো জঙ্গমতার লক্ষণ। জন্ম নিলো ইংরেজি-শিক্ষিত এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিপর্যয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে সমাজের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তি সচেতন হয়ে উঠলো। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পৌঁছে দেখি, বাঙালির প্রাণশক্তির বোধন ঘটেছে—সংস্কার আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, সামাজিক অনুষ্ঠানে তা স্ফূর্তিলাভে সচেষ্ট। এরই ফলে সাহিত্যের অঙ্গনে অনিবার্য হলো গদ্যের বিকাশ। এ যুগের মহানায়ক বিদ্যাসাগর হলেন এই গদ্য ভাষার কর্ণধার।

দুই

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে

সেই থেকেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসের শুরু। তার আগে গদ্য ছিল না এমন নয়। সে গদ্যের নমুনা আছে প্রাচীন চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে অথবা বৈষ্ণব কড়চায়। কিন্তু সে গদ্যকে আমরা কিছুতেই সাহিত্যিক গদ্যের মর্যাদা দিতে পারি না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী সিবিলিয়ানদের বাংলা পড়াতে গিয়ে পাঠোপযোগী বাংলা গদ্যগ্রন্থের অভাব অনুভব করেন। এ কারণেই তিনি তাঁর সহকারী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু প্রমুখ বাঙালি পণ্ডিতদের গদ্য রচনায় উৎসাহিত করেন। কেরী নিজেও বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনার চেয়ে মহত্তর তাঁর আয়োজন। এই আয়োজনের পেছনে কাজ করেছে তাঁর য়ুরোপীয় আধুনিক মানসিকতা। এদেশের সমাজদেহে বলসঞ্চারে তা পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে।

রামরাম বসু বাংলায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের লেখক। কিন্তু গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়, সে কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তাঁর রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, সেকালের পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য। এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কলমে ছিল প্রতিভার স্পর্শ। নানাদিক থেকে তিনি বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যরীতির পরীক্ষা করেছেন। তাঁর রচনার নিদর্শন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

"রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষ্ণার্ত হইয়াছি আমাকে জলপান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জলপান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন।"

(বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২)

"যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকারের রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারি বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকট অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল।" (রাজাবলি, ১৮০৮)

ওপরের উদ্ধৃতি দু'টি থেকে বোঝা যায় বাংলা গদ্য মৃত্যুঞ্জয়ের চেষ্টায় গদ্যসাহিত্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু তখনও তা সর্বজনীম রাজপথে পরিণত হয়নি। গদ্যসাহিত্যের এই প্রাথমিক পর্বে তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের পরিচয় মেলে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায়। তার গঠনরীতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভীরু প্রয়াসও লক্ষ্য করি তাঁর গদ্যসাধনায়। আমরা তাই আশ্চর্য হইনে যখন 'যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়বোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরা অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমন শালঙ্করা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্চৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেই পরাঙ্মুখ হন।' এই উক্তির প্রবক্তার রচনাতেই আবার 'মোরা চাষ করিব ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব ছেলেপেলেগুলি পুষিব।' এই চলতি রীতির নমুনা পাই। বুঝতে পারি, বাংলা গদ্যের প্রাণশক্তি তখনও অনাবিষ্কৃত। সুষম বাক্যবিন্যাস ও সঙ্গত শব্দসজ্জার মধ্য দিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ বাংলা গদ্য মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে জন্মলাভ করে নি—এ সত্য তাই থেকে যায়। একাজ তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কেননা তিনি প্রতিভাবান হলেও যুগধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন না! গদ্যের প্রকৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা হয়তো তাঁর ছিল, কিন্তু তা কোন স্পষ্টরূপ গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না। তাঁর রচনায় মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব ও তার দ্বন্দ্বের প্রকাশ মুখ্য ছিল না, যদিও এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসঞ্জাত মানসিকতার প্রকাশ ঘটানো ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের সহায়ক হওয়াই গদ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তারপর এলেন রামমোহন—আধুনিক বাংলার ধর্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের পুরোধা। তখন বাঙালির মানস জগতে বিপর্যয়ের স্রোত ঘূর্ণি; বাঙালিসমাজের দাবিতে বাংলা গদ্যের বিকাশ তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যুগনায়ক রামমোহন তাই বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর লেখনীতে যে গদ্য জন্মলাভ করলো সে গদ্য আগের তুলনায় অনেক বলিষ্ঠ ও গতিশীল, যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর।

প্রয়োজনের তাগিদেই রামমোহন লেখনী ধারণ করেছিলেন, আন্তরিক সৃজনধর্মের প্রেরণায় নয়। তাঁর গ্রন্থতালিকাই এর সাক্ষ্য দেয়। তবু বাংলা গদ্যের শরীর-গঠনে তিনি যত্নবান ছিলেন, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ই তার প্রমাণ। তাঁর লেখার এক-আধটি উদ্ধৃতি দিলে চলে না; বহু বিষয়ে বহু ধরনের লেখা। তবুও নিম্নোদ্ধৃত অংশ দু'টি কয়েকটি দিক স্পষ্ট করে তুলবে।

"প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্বসিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য হইবার সম্ভাবনা আছে।"

(ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, ১৮১৭)

"স্বামী বর্তমানে ও অবর্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূর দেশেই থাকুন স্ত্রী সর্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।"

(প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, ১৮২৯)

এ ভাষার গতি আছে। যা নেই তা হলো সরসতা। যথার্থ বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বাংলা গদ্যে তখনও অনুপস্থিত। যথেষ্ট সাবলীল

হবার সুযোগ তাই সে তখনও পায়নি। কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও রামমোহন ভাষাকে অনেকটা জড়তামুক্ত করে তার গতিকে কিছুটা স্বচ্ছন্দ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে বিতর্কমূলক রচনায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব বাংলা গদ্যে এক নতুন দিগন্তের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

এই দুই পূর্বসূরীর সাধনা পূর্ণতা পেলো বিদ্যাসাগরে। তাঁর রচনায় আমরা একদিকে যেমন পেলাম প্রাঞ্জলতা, অন্যদিকে তেমনি পেলাম সরসতা। একই সঙ্গে তিনি বাংলা গদ্যের শরীর-গঠন সম্পূর্ণ করে তাতে লাবণ্যসঞ্চার করলেন, অর্থাৎ তাকে পৌঁছে দিলেন বয়ঃসন্ধিক্ষণে। বাংলা গদ্য হয়ে উঠলো সর্বতোভাবে সাহিত্যিক গদ্য। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় প্রথম যথার্থশিল্পী", তাতে বিন্দুমাত্রও বাহুল্যভাষণ নেই।

এখানে আরেকজন প্রতিভাবান গদ্যলেখকের নামোল্লেখ প্রয়োজন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। বাংলা গদ্যের জয়যাত্রায় অক্ষয়কুমারের দান অনুল্লেখ্য নয়। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর সমবয়সী ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তাঁরা উভয়েই প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। হয়তো সাহিত্যপ্রতিভাও একজনের আরেকজনের তুলনায় কম ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ-সচেতনতার পরিধি অক্ষয়কুমারের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। তাঁর সাহিত্যিক সিদ্ধিও সেই কারণে অনেক ব্যাপক।

সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষের চিন্তার জগতের বন্ধনমুক্তি ঘটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গদ্যরচনায় তাই তাঁর আবির্ভাব প্রধানত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে। বিদ্যাজীবী হিউম্যানিস্ট হিসেবে তিনি রচনা করেছেন 'বর্ণপরিচয়', 'কথা-মালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি',

'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস'ও বহুদিন ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী, তাই তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক শুদ্ধসাহিত্যের আসরেও আর অপাংক্তেয় থাকে না। রামমোহনের সঙ্গে এইখানেই তাঁর মৌল পার্থক্য। রামমোহন মূলত তার্কিক, মননশীলতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। আর বিদ্যাসাগর ভাষার সচেতন শিল্পী, তাঁর রচনার প্রধান গুণ তাই সাহিত্যিক ঔৎকর্ষ্য। প্রেরণার উৎস এক হওয়া সত্ত্বেও এ দু'জনের সিদ্ধি তাই সমান নয়।

বিদ্যাসাগর যে কতবড় গদ্যশিল্পী তার নিদর্শন খুঁজি তাঁর রচনায়ঃ

"কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন বৎস! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে। শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চনীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।" (শকুন্তলা, ১৮৫৪)

"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া, প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" (সীতার বনবাস, ১৮৬০)

পড়ে মনে হয় না কি এ রচনারীতি আমাদের চেনা? বস্তুত 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'-এর ভাষা একেবারে আধুনিক বাংলা

সাধুভাষা। সংস্কৃত শব্দের সংহত যোজনায়, প্রসাদগুণে, অর্থবহতায় ও স্বাভাবিক ছন্দোমাধুর্যে এ রচনার সমসাময়িক তুলনা নেই। বাংলা গদ্যের এই স্বাভাবিক ছন্দ আবিষ্কার সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের প্রধানতম কীর্তি।

এই সঙ্গে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয়। 'শকুন্তলা'র লালিত্য 'সীতার বনবাস'-এ অনুপস্থিত ; তার পরিবর্তে সেখানে এসেছে গাম্ভীর্য। অর্থাৎ ভাষা বিষয়ানুগ। বিদ্যাসাগর যে সচেতন শিল্পী ছিলেন এখানেই তার প্রমাণ মেলে। বিষয়োপযোগী ভাষা গড়ে তোলা যে কোনো সাহিত্যিকের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। তাঁর আসল শক্তি পরীক্ষা এইখানেই। বিভিন্ন ভাবমুহূর্তগুলোকে লেখক যদি পূর্ণভাবে অনুভবের আয়ত্তে আনতে পারেন এবং ভাষা যদি ভাবের যথাযথ প্রকাশ ঘটাতে পারে, তবেই লেখকের সাহিত্যিক সিদ্ধি। পাঠ্যপুস্তক লিখতে গিয়েও বিদ্যাসাগর এই চ্যালেঞ্জকে এড়িয়ে যাননি। তাঁর স্বভাবজাত রসবোধ, অর্জিত প্রজ্ঞা ও দুর্লভ সমাজ-সচেতনতা তাই তাঁর লেখাতেও সাহিত্যিক সিদ্ধি এনে দিয়েছে।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থেও বিদ্যাসাগরের ভাষা তাঁর উদ্দেশ্যের অনুগামী। তিনি জনশিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন ; আর শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন। তাঁর সেই আদর্শই এইসব গ্রন্থে প্রতিফলিত। এখানে তিনি শুধু শিল্পী নন, বৈজ্ঞানিকও বটেন। 'বর্ণপরিচয়' একই সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। 'বোধোদয়' এর নিবন্ধ বা 'আখ্যানমঞ্জরী'র গল্পগুলোর বিষয়ের দিকে তাকালেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথাও ভগবদ্ভক্তির কথা নেই ; আছে জ্ঞানের কথা। শিশুপাঠ্য বলেই ভাষা এখানে সহজ, "অল্পবয়স্ক বালকদিগের বোধগম্য হয়"—এমন। তবু তাঁর স্বাভাবিক রসানুভূতি এখানেও উপস্থিত। সে-জন্যেই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই সামান্য কথা দুটি পড়ে বালক রবীন্দ্র-নাথের মনোজগতে ঘটে চিত্রকল্পের প্রথম উদ্ভাসন। তাঁর নিজের কথাতেই ঃ

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি

> বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটিই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" (রবীন্দ্রনাথ—জীবনস্মৃতি, পৃ ৩)

এই যে শিশুমনে প্রকৃতির ছবি আঁকা এবং শিশুর আপন পরিমণ্ডলের দৃশ্যাবলী ও বস্তু সামগ্রীকে তার মনের আয়নায় এঁকে দেওয়া—এটা মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে এই দুঃসাধ্য কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। অসাধারণ এই মানুষ অবলীলাক্রমে আপনার পরিণত বয়সের বৃত্ত ভেঙে শিশুর মনোভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। 'বর্ণপরিচয়' এই নিজের গণ্ডী ভাঙারই অন্যতম পরিণতি। রাখাল ও গোপাল শিশুসাহিত্যের দুই অমর চরিত্র। বিদ্যাসাগরের কলমে তারা জীবন্ত হয়ে 'বর্ণপরিচয়'-এর অনিচ্ছুক অথচ উৎসুক পাঠকের নিত্যসঙ্গী হয়ে ঘোরাফেরা করে। সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর যে মুক্ত মানুষ বিদ্যাসাগরেরই অন্যতম প্রকাশ তা 'বর্ণপরিচয়'-এ যতটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে এমনটি আর কোথাও নয়।

তিন

বিদ্যাসাগর ইতিহাসেরই পুরুষ। এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। সন্ধিলগ্নে বহু পরস্পরবিরোধী চিন্তা ও ঘটনার টানাপোড়েনে সমাজ তখন বিপুল আলোড়নে সংক্ষুব্ধ। সংশয় অতিক্রম করে প্রগতির পথ-রেখাকে নির্ভুল চিনতে পারাতেই প্রবহমান ইতিহাসের জীবনীশক্তির সন্ধান মেলে। সমকালীন সংশয় ও দ্বন্দ্বের আবর্তে বিদ্যাসাগর অযথা

ঘুরপাক খেয়ে মরেননি। যে শক্তি সব মানুষকে নিয়ে গোটা সমাজকে সম্মুখের দিকে চালিত করে, তিনি তারই অন্বেষণ করেছিলেন এবং তাকে আবিষ্কারও করেছিলেন। এই শক্তির প্রেরণা তাঁর জীবন ও কর্মকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে ও নিরাসক্ত মনে সব বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে প্রগতির পথ ধরে তিনি এগিয়ে চলেন, গোটা সমাজকেও সেই সঙ্গে টেনে নেন। ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নকে অতিক্রম করে তাই তিনি ইতিহাসের প্রবহমানতায় মিশে যান। প্রবহমান এই ইতিহাস ভবিষ্যতেও প্রসারিত। বিদ্যাসাগরও তাঁর সমস্তকে নিয়ে ভবিষ্যতের ঘাটগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেন।

তাঁর এই সমস্তের ভেতরে সাহিত্যকীর্তিও একটি অংশ। কিন্তু এই অংশের বিচ্ছিন্নভাবে বিচার অনেক সময় তাঁর গুরুত্বকে চিনিয়ে দিতে ভুল করে; সাহিত্যের উদ্দেশ্যের বিচারেও হয়তো বিভ্রান্তি ঘটায়। বিদ্যাসাগরের সকল কর্ম একে অন্যের পরিপূরক। মানবপ্রগতির মূল লক্ষ্যে তিনি সমাজকে পরিচালিত করতে চেয়েছেন এবং তারই প্রয়োজনে কখনও হয়েছেন নির্ভীক সমাজসংস্কারক, কখনও বা সাহিত্যদ্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যপ্রয়াস কখনোই তাঁর গণকল্যাণের আদর্শকে বিস্মৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সেইটেই এক ধ্রুবক উপাদানরূপে তাঁর সকল প্রচেষ্টায় নিশ্চলভাবে বর্তমান থেকেছে। সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদের ধারণা তাঁকে কখনোই মোহগ্রস্ত করেনি। তিনি যে সার্থক গদ্যলেখক হতে পেরেছিলেন, এটা তাঁর অন্যতম কারণ। সবরকমের ভাবনা-চিন্তাকে ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করা গদ্যরচনার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই ভাবনা-চিন্তা মানুষের সামাজিক অবস্থিতির অন্তর্গত প্রশ্ন মীমাংসায় রূপ পায়। বিদ্যাসাগর গদ্যকে এই রকম সব ভাবনা-চিন্তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথমে তাই তিনি গদ্যের কারিগর, তারপরে তার শিল্পী। কিন্তু যেহেতু তাঁর শৈল্পিক চেতনা তাঁর সম্পূর্ণতায় লীন, তাই তা আপাতদৃষ্টিতে বায়বীয় হলেও মানবকল্যাণের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত

হয় না। বিদ্যাসাগরের ধারণায় এই মানবসমাজের কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে আপন স্বার্থ-চিন্তায় সীমাবদ্ধ নয়। সে তার সমস্তকে নিয়ে প্রগতির প্রশস্ত পথের নির্ভুল অন্বেষণে ব্যাকুল। মানুষের সম্পূর্ণতাকে তার সামাজিক অস্তিত্বে তিনি ধরতে চান বলেই তাঁর গদ্যসাহিত্য এক দুর্লভ ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এই ব্যাপ্তি তাঁর শিল্পকে ক্ষুন্ন করেনি, বরং তাকে অনেক সমৃদ্ধই করেছে। জীবন-শিল্পী বিদ্যাসাগর পরিপূর্ণ মানবিক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যে প্রাণের স্পন্দন এনেছেন। এই প্রাণের স্পন্দন জাগানোই শিল্পের মূল কথা। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য তাঁকে ভাষার কারিগর থেকে মহৎ শিল্পীতে পরিণত করেছে।

ধরা যাক্ বেতালপঞ্চবিংশতির কথা। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে ভিন্ন ভাষায় রচিত কয়েকটি কাহিনীর অনুবাদসংগ্রহ বলে মনে হলেও বদ্ধ ও মুমূর্ষু সমাজে অকর্মণ্য ও আয়েসলোভী রাজপুরুষ ও তার অনুচরদের অপচয় ও অর্থহীন অবস্থানের প্রতি বিদ্রূপের সুরটিও এখানে অশ্রুত থাকে না। কিন্তু এই শ্রেণীর সামাজিক অস্তিত্ব তখন বিলীয়মান। রচনাটি তাই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে না, ব্যঙ্গ ও ঠাট্টার পর্যায়েই থেকে যায়। তার ভাষা হয়ে ওঠে পরিশীলিত রঙ্গরস ও কৌতুকবোধে উজ্জ্বল। অন্যদিকে তাঁর বিধবাবিবাহ বা বহুবিবাহ বিষয়ক নিবন্ধে ও আনুষঙ্গিক রচনায় ভাষা শাণিত ও নির্দয়। কেননা সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ সমকালীন সমাজের প্রগতিবিরুদ্ধ শক্তি, যা তখনও পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়। তাই আক্রমণে তিনি নির্মম হয়ে ওঠেন। তবু এই দুই ধরনের রচনাতেই যা সাধারণ সত্য, তা হল তাঁর মানবিকবোধ, যা মানবসমাজের সমস্তকে অবলম্বন করে লালিত ও পুষ্ট হয়। এই বোধেরই ভিন্নতর প্রকাশ ঘটেছে 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' গ্রন্থদ্বয়ে। 'সীতার বনবাস'-এ রামায়ণের কাহিনীর অবতারণা করে তিনি তাঁর বহুবিবাহ-বিরোধী মতামতের সমর্থন খুঁজেছেন—এমন অনুমান অসঙ্গত বলে মনে হয় না। 'শকুন্তলা'য় ফুটে উঠেছে নারীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও তার মর্যাদার প্রতি তাঁর পূর্ণ

শ্রদ্ধা। সেই সঙ্গে এড়ু'টি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিধৃত আছে তাঁর সংবেদনশীল মন, তাই তাদের ভাষা কাব্যলালিত্যে মধুর ও গভীরতায় অতলস্পর্শী।

'বোধোদয়'-এ বিদ্যাসাগর বালক-বালিকার বুদ্ধির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিতে চেয়েছেন। আবেদন এখানে হৃদয়ের কাছে নয়, বুদ্ধির কাছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে নির্লিপ্ত, আবেগশূন্য অথচ সহজ ও ঝরঝরে গদ্যে প্রকাশ করে তিনি একদিকে যেমন ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রের বিস্তার ঘটালেন, অন্যদিকে তেমনি মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উৎসাহ দিয়ে মানুষকেও স্বাধীন চিন্তার পথে টেনে আনতে চাইলেন। মানবিক দায়িত্ববোধ তাঁকে 'বোধোদয়' লেখার প্রেরণা জোগালো, আর 'বোধোদয়ে' শুরু হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় বাংলা গদ্যের পথপরিক্রমা।

আবার 'বোধোদয়ের' উল্টোদিকে আমরা পাই 'কথামালা', বোধ হয় একই বয়সের পাঠকপাঠিকাকে মনে রেখে রচিত। এগুলো নীতি-কাহিনী, 'ঈশপ্স্ ফেবল্স্'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কিন্তু নীতিকাহিনীও গল্প। বিদ্যাসাগরের ভাষা এখানে বিষয়েরই অনুসরণ করে। 'কথা-মালা'র প্রথম গল্পেই পড়ি, 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।' পাঠকের কাছে তার পরিণত বয়সেও এই বাক্যটি তার অন্তর্লীন ছন্দোমাধুর্য ও গল্পের জাদুকরী মায়া নিয়ে বারে বারে ফিরে আসে। বালক-বালিকার মনে মানুষের মূল্যবোধ জাগাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অজ্ঞাতেই এবং অনায়াসে শিল্পী হয়ে ওঠেন।

আগে যে কথা একবার বলা হয়েছে তাতেই আবার তাই ফিরে আসি। সমাজসচেতনতা বিদ্যাসাগরের অন্যান্য কর্মের মতো তাঁর সাহিত্য কর্মেরও উৎস। তাঁর উদ্দেশ্যের উপযোগী বলেই তিনি গদ্যকে ভাব-প্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানুষের সমগ্রকে তার ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় ধরতে চেয়েছেন তিনি তাঁর সকল চেষ্টায়। তাঁর গদ্য সাহিত্য হয়েছে এবং সাহিত্য শিল্পরূপ পেয়েছে এই কারণেই।

বি দ্যা সা গ র-মা ন স

গোলাম মুরশিদ

মধ্যযুগীয় চিন্তা ও জীবনধারার প্রতি দীর্ঘকাল পোষিত আস্থা ও মমত্ব বাংলা দেশে পরিবর্তিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। সে সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় বণিক ও বেনিয়ান ভাগ্যোন্নতি করেছিলেন। তা ছাড়া, নতুন ভূমিব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়ে একদল ভূস্বামী নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত আয়ের ভাগী হয়েছিলেন। এই বণিক, বেনিয়ান ও ভূস্বামীরা কলকাতা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁদের সঙ্গে, স্বাভাবিক-ভাবেই, যুক্ত হলেন শিক্ষক ও করণিক সম্প্রদায়। নগরকেন্দ্রিক এঁদের সম্মিলিত জীবনযাপনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও দ্রুতপরিবর্তনশীলতা আগমন করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দরুন নব্যশিক্ষিতদের ধ্যানধারণায় যে বিপ্লব সূচিত হয়, তা এ যাবৎ অভাবনীয় ছিলো। শতাব্দীর প্রথম পাদে ফোর্ট উইলিয়াম, হিন্দু-ও সংস্কৃত কলেজ, বহু সংখ্যক বিদ্যালয়, টেক্স্‌ট্‌ বুক সোসাইটি ও ইস্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন, কয়েকটি পত্র-পত্রিকার প্রচলন এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ফলস্বরূপ এতদিনের নিস্তরঙ্গ হিন্দু মনোজীবন আন্দোলিত হতে আরম্ভ করে। হিন্দু ধর্মের বড়ো রকমের সংস্কার হলো কিংবা জনগণ স্বধর্ম ত্যাগ করলো—তা নয়; কিন্তু যে ধর্ম, সংস্কার ও আচার এতোকাল ছিলো প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধার বিষয়, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলো। নানাজন নানাভাবে তার যথার্থ মূল্য যাচাই করে দেখতে চাইলো। ধর্মের তুলনামূলক বিচার ও মূল্যায়ন এবং প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে কৌতূহলী চিত্তে অস্থায়ী কিন্তু

অভ্রান্ত একটি নৈরাজ্যের সৃষ্টি হলো। এতদিনের বিশ্বাসে সংশয়, অচঞ্চল হৃদয়ে দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী ভাব ও মতামতের এক অদ্ভুত সম্মিলন এ যুগের প্রায় সব মানুষের চরিত্রে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষণীয়। অবশ্য তার কারণ সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। নতুন কাল যখন নতুন মূল্যবোধ নিয়ে প্রাচীন সমাজের দ্বারে উপনীত হয়, তখন তার অভিঘাতে যুগজীর্ণ সমাজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু পরিবর্তিত মূল্যবোধের সাথে আপোস করতে অধিকাংশ মানুষই যথেষ্ট সময় নেয়। বিধ্বস্ত প্রাচীন ও গঠনীয় নবমূল্যবোধহীন অন্তর্বর্তীকাল—সমাজতত্ত্বে যাকে বলে **anomy**, সে সময়টাই নানা বিপ্রতীপ ভাবে ঠাসা থাকে। এ যুগের সন্তান রাধাকান্ত দেব[১] অথবা রামমোহন রায়ের[২] মধ্যে এ কালের স্ববিরোধ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিকভাবেই যেন বিধৃত আছে।

রাধাকান্ত দেব—রক্ষণশীল দলের যিনি নেতা ছিলেন—তাঁর চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধ্যানধারণার সমাবেশ সম্ভাব্য না হলেও, নিশ্চিতভাবে দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত, ফারসি, আরবি ও ইংরেজিতে সুশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারে অত্যুৎসাহী, এই শক্তিধর পুরুষ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি আশ্চর্য আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। সতীদাহ তাঁর আপন পরিবারে অপ্রচলিত ছিলো যদিও, তবু সতীদাহ নিবারিত হলে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তিনিই। ইংরেজদের সাথে এঁর যোগাযোগ যেমন অন্তরঙ্গ ছিলো, এ দেশে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলনে তাঁর উৎসাহও ততোধিক ছিলো। হিন্দু কলেজ, টেক্স্‌ট বুক সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপনে তাঁর দান ও শ্রম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থায়ী ও অক্ষয় করার মানসে ধর্মের সংকীর্ণ, অনর্থক ও মিথ্যা আচারকে অবিচলিত আসনে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে তাঁর প্রাণপণ সংগ্রাম দেখে তাঁকে

স্ববিরোধের চরম বলে ঐতিহাসিক মনে করেন।[৩] অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আপাত সংস্কারমুক্তির কারণ অপ্রত্যক্ষ নয়। শাসকদের ভাষা শিখে বৈষয়িক উন্নতির আত্যন্তিক উৎকাঙ্ক্ষা থেকে এই ইংরেজি-প্রীতির জন্ম। মুসলিম শাসনকালেও গোঁড়া হিন্দুরা আরবি-ফারসি ভাষা শিখে উচ্চ সরকারি পদ লাভের চেষ্টা করতেন, এমন নজির প্রভূত পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভব।[৪] বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ধর্মীয় যে কোনো অনুশাসনের সঙ্গে আপোস করতে প্রাচীনপন্থীরা দ্বিধা করতেন না। প্রয়োজন অনুসারে ইংরেজি বিদ্যালয় অথবা অফিস থেকে ফিরে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, শুদ্ধমাত্র স্বার্থবুদ্ধি-পরিচালিত, এ শ্রেণীর লোকেরা।

ভিন্ন ধর্মের সার কথাটি জেনে এবং পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহন পূর্বপুরুষের ধর্মান্ধ কুসংস্কারের স্বরূপ পুরোপুরি না হলেও অনেকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হয়তো এ ব্যাপারে স্নেহশীলা আত্মীয়ার সহমরণ তাঁকে আরো একনিষ্ঠ করেছিলো। যথার্থ সনাতন ধর্ম কী, এবং ধর্মের নামে সংস্কার ও আচার সর্বস্বতা সমকালীন মানুষের দৃষ্টিকে কতখানি অস্বচ্ছ করেছিলো, রামমোহন তা বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চাইলেন। তিনি হয়তো দেখলেন, ধর্মের মূল বাণীটি মানবতা কিন্তু ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার নিমিত্তে গড়ে উঠেছে বর্ণাশ্রম। পরশ্রমজীবী উচ্চবর্ণের লোকেরা ধর্মকে নানাভাবে তাদের জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার বাহন হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। তার জন্যেই ধর্মশিক্ষাকে দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার বেড়াজালে জনগণের জীবন থেকে সুদূরে রাখা হয়েছে। বিবিধ আচার ও আনুষ্ঠানিকতার অচলায়তন গড়ে কায়েমি স্বার্থবাদী সমাজপতিরা আপন স্বার্থ সংরক্ষিত

রেখেছেন। সতীদাহের আবশ্যিকতা ও বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধকরণ যেমন পুরুষপ্রধান এ সমাজেরই স্বার্থরক্ষার একটি অপকীর্তি। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ যেমন কৌলীন্যসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের বিনা মূলধনে আয়ের একটি নিশ্চিত পথ বলে সমাজদেহে তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো। জনসাধারণকে ধর্মের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং ধর্মকে তার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রামমোহন তাই ধর্মের মূলে মানবতার বাণী সংযোজিত করেন। গুটিকতক ধর্মব্যবসায়ীর রহস্যময়তা এবং অজ্ঞানতা-জাত অকারণ ভীতি হতে বাঁচানোর জন্যে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি তিনি বাংলা অর্থসহ সাধারণ্যে প্রকাশ ও প্রচার করেন। তিনি যে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) অথবা 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮) স্থাপন করেন, জাতি অথবা ধর্মের বিভেদ সেখানে তত্ত্বগতভাবে অন্তত ছিলো না। সতীদাহ প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় নিবারিত হয় (১৮২৯)।

ইংরেজিশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ রাধাকান্ত দেবের চেয়ে সম্ভবত বেশিই ছিলো, কেননা রাধাকান্ত দেব এর বৈষয়িক দিকটাই দেখেছিলেন, রামমোহন সেটার প্রতি সজাগ তো ছিলেনই, তদুপরি ইংরেজি শিক্ষা এদেশের জনগণকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরকে মুক্তবুদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত করবে, এমন উচ্চাশা তিনি পোষণ করতেন।[৫] রামমোহন নিজে পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করে মোহ ও সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির আলোকে ধর্ম ও সমাজকে পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন। Bentham তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন:

> "Rammohan has cast off thirtyfive millions of gods and has learnt from us to embrace reason in the all important field of religion."[৬]

রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে মধ্যযুগীয় বর্বরতা নয়, বরং য়ুরোপীয় উদার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৭] কিন্তু তবু বলা যায়, লিবারেল্-ইজ্‌মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যতটা তাত্ত্বিক, বাস্তবে তিনি ততটা উদার নন।

অনেক সময় আপন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এতটা অস্বচ্ছ বলে বোধ হয় যে, তাকে প্রায় আত্মবিরোধী বলে গণ্য করা চলে। চরমপন্থী নব্যদল যাঁরা রামমোহনকে কেবল অর্ধ-লিবারেলরূপে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁদের চোখে রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের স্ববিরোধ সহজেই ধরা পড়েছে। ডিরোজিও এ সম্পর্কে The East India পত্রিকায় লিখেছেন :

> "What his (Rammohan's) opinions are, neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are ··· Rammahan, it is well known, appeals to the Veds, the Koran and the Bible, holding them all probably in equal estimation. He always lived like a Hindoo.... His followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden in the Shastras, as meat and drink, while at the sametime they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poohjas at home."[৮]

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যগণ রামমোহন রায়ের দলকে ভালো চোখে কখনই দেখেন নি, অন্তত যৌবনকালে তো

নয়ই। তাঁদের মতে এঁরা (রামমোহনের অনুসারীবৃন্দ) যথেচ্ছা ধন সঞ্চয় করার জন্যেই উদারনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বিবেকবর্জিত লোভীদের এই দল প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত সকল হীনতাকে বরণ করেছেন। গোঁড়াদের সামনে তাঁরা গোঁড়ার মতো আচরণ করেছেন, তথাকথিত উদারনৈতিকদের সামনে উদারতার ভান করেছেন।[৯]

রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে ইয়ংবেঙ্গলদের অভিযোগ সব সত্য না হলেও, আংশিকভাবে হয়তো স্বীকার্য। এঁদের সম্বন্ধে একটি কথা অন্তত বলা যায়, ধর্মের ছদ্মবেশ ও অর্থহীনতা এঁদের চোখে ধরা পড়েনি, এঁদের জীবনধারাও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমায়িত— কলকাতার তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনিক ও বণিকগণই রামমোহনের 'আত্মীয়'। সাধারণের প্রবেশ সেখানে দুর্লক্ষ্য।

রামমোহনের অন্য একটি স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তীব্র প্রতিকূলতা করে তিনি আমহার্স্টকে দীর্ঘ একটি ঐতিহাসিক পত্র লিখেছিলেন অথচ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের পথে সংস্কৃত শাস্ত্রকেই তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রামমোহন পাশ্চাত্যকে বরণ করে নিতে গিয়ে প্রাচ্যকে ত্যাগ করেন নি।[১০] বরং নবীন ও প্রাচীনে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে প্রাচ্যের দর্শন ও ধ্যানকে সংশ্লেষিত করে পুরাতনের সংস্কার সাধনের প্রয়াসী ছিলেন। এর ফলাফল এ দেশীয় সমাজ ও ধর্মজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর-প্রসারী হয়েছিলো। বহু শতাব্দীর ধর্মকে ভাঙা যত কঠিন, সংস্কার করা

ততো শক্ত নয়। এ কথা পুনর্বার সত্য বলে প্রমাণিত হয় ডিরোজিওর শিষ্যদের সমাজ-সংস্কারে ব্যর্থতা দৃষ্টে।

কোনো চরম পন্থায় যদিচ রামমোহন আস্থাবান নন, তথাপি তাঁর উদার চিন্তার সঙ্গে যুগপৎ রক্ষণশীলদের প্রচণ্ড প্রতিকূলতা লক্ষ্য করি। তাঁদের বাধা বিপুল, কেননা, এ যাবৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার দ্বারা তাঁরা উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন ; কেননা, এ কাঠামো ভেঙে গেলে তাঁদের নিশ্চিত আয়েশ ও তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা বিধ্বস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। অথচ এ দলের নেতারা শিক্ষিত, এমন কি, পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞানে। সহমরণের অমানুষিকতা তাঁদের উপলব্ধির বাইরে নয়, তথাপি প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করার সাহস তাঁদের নেই, পাছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয়।

সংস্কারবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দুই সমান্তরাল শক্তির সাথে আর একটি শক্তি যুক্ত হলো আলোচ্য শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও[১১] ১৮২৭ থেকে ১৮৩১[১২] মোট পাঁচ বছরের চেয়েও কিঞ্চিৎ কম সময় শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি ছাত্রকে আপন মতে দীক্ষিত ঠিক করেন নি, তাঁদের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ধর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যরা যে আন্দোলনের সূচনা করেন, প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে সংস্কার করা তার অভিপ্রায় ছিল না, বরং পুরাতনকে পুরোপুরি ভেঙে সেই ধ্বংসস্তূপের পর নবযুগের ভিত্তি স্থাপন করাই ছিলো তাঁর মূলমন্ত্র।

ডিরোজিও যে প্রতিবেশে জাত ও লালিত তার মধ্যে একটি গ্লানি ও হতাশা ছিলো। তাঁর পিতা সদাগরি অফিসের চাকুরে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের মতো ব্যবসা করে সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি। তদুপরি ফিরিঙ্গি ও ইংরেজদের মধ্যেও ব্যবধান কম ছিলো না।[১৩] ধর্মের ও বর্ণের সমতা বালক ডিরোজিওকে প্রতিষ্ঠা-অর্জনে কোনোরূপ সহায়তা করেনি। তাঁর ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে সমভাবে তুলিত না হলেও তাঁর শিষ্যদের সকলের ভিতর কোনো না কোনোরূপ ব্যর্থতা লক্ষণীয়। এঁদের অধিকাংশ অব্রাহ্মণ, সুতরাং সমাজে অপাংক্তেয়, আর প্রায় সকলেই নির্ধন। হতাশার একটি সমভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, ডিরোজিওর সঙ্গে এঁদের একাত্মতা সহজেই স্থাপিত হতে পেরেছিলো।

কিন্তু তবু ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের পার্থক্য অনেক। কেননা, ডিরোজিও ফিরিঙ্গি বলে একই সঙ্গে নেটিভদের তুলনায় যুগপৎ একটি সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং আপন মাতৃভাষায় যে শিক্ষাকে তিনি স্বীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন শিষ্যদের সে সুযোগ ছিলো না। তদুপরি ডিরোজিওর পারিবারিক পটভূমিকা, বিস্ময়কর প্রতিভা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব শক্তি শিষ্যদের মধ্যে একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিলো। সর্বোপরি ডিরোজিও এদেশে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভাসমান শৈবালের মতো। দেশ ও সমাজে তাঁর অনিকেত দশা যত সহজে তাঁকে ভারতবর্ষীয় কুসংস্কার, ধর্ম, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও ভাবপ্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করেছিলো, তাঁর শিষ্যরা পুরোপুরি এ দেশীয় সমাজের সদস্য বলে গুরুর মতো মুক্তবুদ্ধি লাভ করা তাঁদের পক্ষে ততো কঠিন হয়েছিলো। এই কারণে দেখতে পাই, ডিরোজিওর কাছে Becon, Hume, Paine. Reid

Stuart পড়ে তাঁরা যে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তা তাঁরা আপনাপন জীবনে তেমন করে প্রতিবিম্বিত করতে সক্ষম হননি। কেননা যদি বা যৌবনের প্রারম্ভে স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও উদ্‌বৃত্ত উৎসাহবশত সমাজকে অস্বীকার করার দুঃসাহস কথঞ্চিৎ থাকে, কর্মজীবনে অথবা দায়িত্বযুক্ত জীবনে প্রবেশ করে পূর্ব নীতির প্রতি সেরূপ অবিচল আস্থা ও প্রেরণা রাখা সম্ভব হয় না। তৎকালীন সমাজের মাঝে, ইয়ং বেঙ্গলদের চিন্তা এতো প্রাগ্রসর ছিলো যে, নীতির সাথে কিছু পরিমাণে আপোস না করলে তাঁদের জীবিকা উপার্জন অসম্ভব হতো। সামাজিক অবরোধ ও প্রতিকূলতা তাঁদের প্রতি বহুবার এসেছে, বহুবার তাঁরা তা থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। পরিশেষে হয় খ্রিস্টান ধর্মের ছায়ায়, নয় বিশ্বাসের বিনিময়ে হিন্দু সমাজে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইয়ংবেঙ্গলদের দলটি এজন্যে ডিরোজিওর মৃত্যুর এক দশকের ভিতর ভেঙে গিয়েছিলো,—পরিণতিতে সমাজে কোনো স্থায়ী আন্দোলন অথবা পরিবর্তন আনয়নের পূর্বেই।

> "Worldly occupations and private interests inevitably scattered in course of time the individual members of Derozian group, for Young Bengal could never develop into a movement comparable to the various trends in Europe to which the same adjective has been attached"[১৪]

অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা সত্ত্বেও, অনিবার্য ও দুর্নিবার কীটের মতো তাঁরা ডিরোজিওর অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিতার আলোকে আত্মবিসর্জন দিতে চেয়েছেন। নিজেদের বহু সীমাবদ্ধতা ও অসামর্থ্যের জন্যে, গুরু শিষ্যের প্রচুর আপাত ঐক্য দৃষ্ট হলেও, অমিলও কম জমে ওঠেনি। শিষ্যরা প্রায়শ গুরুর অভিপ্রেত পথে শেষ পর্যন্ত গমন করেন নি। ফলস্বরূপ ইয়ংবেঙ্গলদের

ভেতর স্ববিরোধের টানাপোড়েন স্পষ্টভাবে একটি বৃহৎ ভূমিকা রচনা করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র[১৫] ইয়ংবেঙ্গলদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের কিছু সদ্‌গুণ তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন, কিন্তু জীবনের পরিণত প্রহরে বারবার তিনি শিক্ষায় ও কর্মে, ধ্যানধারণায় ও সাহিত্যে স্ববিরোধিতার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অপর পক্ষে ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বহু দূরে, জীবনধারা ও শিক্ষার দিক দিয়ে প্রায় বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[১৬] ডিরোজিওর মুক্তবুদ্ধিকে যে কেবল আশ্চর্যজনকভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন তা-ই নয় বরং বহু ব্যাপারে ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারীদের কর্ম ও চিন্তার তুলনায় প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা থেকে এর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

প্যারীচাঁদ ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক, তদুপরি লেখাপড়া শিখেছেন এবং কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন একই নগরীতে। স্থান, কাল ও সমাজের এ সমতা সত্ত্বেও, ধ্যানধারণায় প্যারীচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যবধান দুস্তর, এমন কি, বলা চলে, তাঁরা প্রায় বিপরীত। অন্যান্য বিষয়গুলো যখন কমবেশি অভিন্ন, তখন তাঁদের ব্যক্তিমানস গঠনে পরিবার ও প্রতিবেশ নিশ্চয় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পরিচয় এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে পারে।

বনেদী পরিবারের সন্তান না হলেও, প্যারীচাঁদের জন্মকালে তাঁদের পরিবার কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর পিতামহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইংরেজদের

সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে যথেষ্ট বিত্ত অর্জন করেন তিনি। আপন পুত্র, প্যারীচাঁদের পিতাকে, সযত্নে দিয়েছিলেন ইংরেজিশিক্ষা। তার গুণে পুত্র মনে মনে রীতিমতো পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। অপর পক্ষে, 'কোম্পানির কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছিলেন।'[১৭] ইংরেজিবিদ্যা এবং বিত্তের বলে রামনারায়ণ তৎকালীন কলকাতার অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আভিজাত্যের মাপকাঠিই তো ছিলো বিত্ত এবং বিদ্যা।

বাল্যকালে বাংলা ও ফারসি শেখেন প্যারীচাঁদ। অতঃপর ইংরেজি শিক্ষার জন্যে তিনি হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৮২৭ সালে। ডিরোজিও তখন এ কলেজের শিক্ষক। তাঁর আকর্ষণ ছিলো চুম্বকের মতো অমোঘ।[১৮] অতএব তাঁর ব্যক্তিতার দ্বারা প্যারীচাঁদও স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, হিন্দু কলেজের এই সমস্ত প্রতিভাবান ছাত্রদের সঙ্গে প্যারীচাঁদও যেতেন ডিরোজিওর বৈঠকখানার আলোচনা সভায় যোগ দিতে। ডিরোজিওর সাথে প্যারীচাঁদের যোগাযোগ যে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠ ছিলো তার আর একটি প্রমাণ, প্যারীচাঁদের ইংরেজি পাঠশালার পরিদর্শকদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন অন্যতম।[১৯] ইয়ংবেঙ্গলদের সহিত অন্তরঙ্গতার ফলশ্রুতিস্বরূপ প্যারীচাঁদের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়া সম্ভব, ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যধারা আলোচনা করলেই তা বোধগম্য হতে পারে।

ধর্ম সম্বন্ধে ডিরোজিওর অনাসক্তি সুবিদিত ছিলো। মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে The Indian Register পত্রিকা লিখেছিলেন:

> "That he did not view Christianity as a communication from the divinity to fallen man is well-known."[২০]

মৃত্যুর পূর্বে পাদ্রি হিল ধর্মবিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন, 'ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চূড়ান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানি না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয় নি।'[২১] জীবদ্দশায় ছাত্রদের তিনি নাস্তিক্যের শিক্ষা দেন নি বটে, কিন্তু মুক্তমন নিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষণ করার প্রেরণা দিয়েছেন। চাকুরি চলে গেলে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগের উত্তরে এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'ভেবেছিলাম, তাঁদের (ছাত্রদের) একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরি না করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করব!...তরুণদের মনে কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনদিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার।'[২২] দৃষ্টির আচ্ছন্নতা অন্তে, ডিরোজিওর শিষ্যরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠানের নিরর্থক অন্ধতা ও নিষ্ঠুর প্রাণহীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত করেন। The Parthenon[২৩], The Enquirer[২৪], জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তরুণরা চিন্তা ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে থাকেন।

ডিরোজিও পরিচালিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য আরো সাতটি সভা ডিরোজিও যেগুলোর সদস্য ছিলেন, এবং উল্লিখিত পত্রিকাসমূহে বারংবার হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, আচারের সঙ্কীর্ণতা এবং সমাজের অত্যাচারের কথা আলোচিত হয়েছে। সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্যে পুনঃপুন বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাঁদের সভায়ঃ

> "The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects ; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised. Reason was now promoted to be a God, and custom voted to be the idol of fools...The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates ; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people."[২৫]

এঁদের পত্রিকায় লেখা হতোঃ

> "Persecution is high for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the call of superstition... We have attacked Hinduism and will persevere in attacking it, until we finally seal our triumph."[২৬]

প্যারীচাঁদের ভাষায়, 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না, অনেকে উপবীত ত্যাগ করতে চাহিত, অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া

দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশসকল আবৃত্তি করিত।'[২৭]

ডিরোজিওর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত, এই অনাচারী ইয়ংবেঙ্গলদের সাথে প্যারীচাঁদ নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণমোহন প্রমুখের মতো তিনি যে একপালকের পাখি ছিলেন তা-ই নয়, তাঁদের প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার সম্পাদকীয় পরিষদেরও নিয়মিত লেখকবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তী-কালে স্থাপিত The Society for the Acquisition of General Knowledge, The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals, The Bengal Science Association. The Agri-horticultural Society, The District Charitable Society প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে তিনি ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। মাসিক পত্রিকা নামে যে সাহিত্য সাময়িকীটি তিনি প্রকাশ করেন তা-ও ইয়ংবেঙ্গলদের একজন—রাধানাথ শিকদারের সহযোগে।

প্যারীচাঁদের মানসগঠনে সামগ্রিকভাবে হিন্দু কলেজের প্রভাবও সম্ভবত কম ছিলো না। তৎকালে হিন্দু কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা দূরে থাক, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যও পড়ানো হতো না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দেশীয়দের মধ্যে বিতরণ করাই ছিলো এ কলেজ স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য।[২৮] ডিরোজিও যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন ১৮২৭-৩১ সালের মধ্যে, তার ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের এই ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। কিন্তু প্যারীচাঁদ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত শিক্ষা হিন্দু কলেজে লাভ করেছিলেন। বাল্য-কালেও তিনি সংস্কৃতের বদলে পড়েছিলেন বাংলা ও ফারসি।

কিন্তু প্রগতিশীল শিক্ষা এবং ডিরোজিও ও বন্ধুদের প্রাগ্রসর চিন্তা প্যারীচাঁদের মনে স্থায়ী ও গভীর কোনো ছাপ অঙ্কিত করেছিলো, এরূপ বোধ হয় না। কেননা ইয়ংবেঙ্গলদের অনেকের প্রথম জীবনের গুণগুলো —সততা, সত্যবাদিতা, সৎসাহস, সমাজসেবার আদর্শ—তিনি লাভ করেছিলেন বটে, তথাপি তাঁদের সংস্কারবিমুক্ত মন তাঁর ছিলো না। এ কারণে, কর্মজীবনে প্রবেশ করেই, দেখতে পাই, তিনি অন্যান্য অনেক বন্ধুর মতোই আপনাকে, স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে, সমাজের অঙ্গীভূত করেছেন। এর কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রচলিত ধর্মের জঘন্য সংস্কার ও আচারের প্রতি অবিচল আস্থা, এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ও কাঠামোকে বিধাতার অভিপ্রেত অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ্য করি। প্যারীচাঁদ বাস্তবিকপক্ষে বিষয়ীলোক ছিলেন। আমদানিরপ্তানি কাজের জন্যে কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোং নামে একটি সংস্থার প্রথমে তিনি অংশীদার ও পরে পুরোপুরি মালিক ছিলেন। এ ছাড়া গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল কোং, হাওড়া ডকিং কোং, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং, বেঙ্গল টী কোং প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন।[২৯] কিন্তু বিষয়ের প্রতি এতৎ পরিমাণ অনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও, তাঁর রচিত সাহিত্যের মূলসুর আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরচিন্তা ও নীতিধর্মের প্রচার। প্যারীচাঁদের মধ্যে অভ্রান্ত একটি স্ববিরোধ, অন্যান্য ইয়ংবেঙ্গলদের মতোই, অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হয়।

আবাল্য যিনি ইংরেজি শিক্ষায় মনোযোগী, ডিরোজিওর মতো মুক্তবুদ্ধি প্রগতিবাদীর যিনি অনুসারী, যে ইয়ংবেঙ্গলরা বলতেন,

> "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."[৩০]

তাঁদের যিনি বন্ধু, ব্যবহারিক জীবনে, পোষাকে, রুচিতে যিনি পাশ্চাত্য প্রভাবিত, ধর্ম সম্বন্ধে যিনি প্রভূত অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কী করে সহমরণের সমর্থক অথবা বিধবাবিবাহের বিরোধী হলেন তা একান্ত বিস্ময়ের কারণ। সহমরণের প্রতি তাঁর উৎসাহ প্রকাশ পায় 'অভেদী' উপন্যাসের একটি স্থানে। সহমরণের একটি দৃশ্য বর্ণনায় তাঁর উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করবার মতো।

"পরে অনেকে নিকটে আসিয়া ওই স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই উত্তর না দিয়া করজোড়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টে থাকিলেন। নিকটস্থ লোকেদের বোধ হইল যেন তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাববলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্মাতে বাহ্যভাব কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্পকাল পরে শব স্নাত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনামের ধ্বনি করতঃ মৃত ভর্তার চিতায় আরূঢ় হইয়া যেন স্বর্গ লাভ করিলেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামীর শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্ত সংযুক্ত বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত্ত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল, তদবধি তাঁহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়াছিল।"[৩১]

সহমরণের সমর্থনের মতো বিধবাবিবাহের প্রবল প্রতিকূলতা প্যারীচাঁদের সাহিত্যকর্মে লক্ষ্যযোগ্য।[৩২] তাঁর আধ্যাত্মিকা উপন্যাসে বিধবাবিবাহের সম্বন্ধে পাত্রপাত্রীরা বলেছে :

"এই ভারতভূমিতে পাতিব্রত্য ধর্ম যেরূপ বদ্ধমূল, এমন আর কোন দেশে নাই। এ দেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৮৭) এবং আর এক বার The Bengal Hurkura-র সম্পাদকের কাছে লিখিত চিঠিতে। সেখানে ভাষাও ভিন্ন। (If there be anything under Heaven that either I or my friends look upon with most abhorrance, it is Hindooism.) Salahuddin Ahmed—পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৪৯

ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে এই পতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা ও নিরাকার রাজ্য ও নিরাকার রাজ্যেশ্বরকে ধ্যান করাই ব্রহ্মচর্য্য।"[৩৩]

অপর পক্ষে, মুসলমানদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণ :

"মুসলমানদিগের ইন্দ্রিয়সুখ অধিক, তাহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ভিন্ন প্রকার, পারলৌকিক ভাব অল্প। উহারা রোজাতে উপবাস করে, কিন্তু উহাদিগের স্বর্গ ইন্দ্রিয় সুখ সংযুক্ত। আমাদিগের স্বর্গ বিমল আনন্দে ব্যাপক।"[৩৪]

কর্ম ও চিন্তায়, শিক্ষা ও ভাবনায় অনৈক্য প্যারীচাঁদে অন্যত্রও দেখা যায়। তিনি ছাত্রজীবনেই সাধারণ্যে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপ্ত করার উদ্দেশ্যে আপন গৃহে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, অথচ পরিণত জীবনে বিদ্যাকে গণমুখিন করার সদিচ্ছা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত বলে মনে হয়। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বটে, তথাপি শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর উৎসাহ ছিলো এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যে সংসদগুলোর সদস্য ছিলেন, পশুর ক্লেশ নিবারণ থেকে শুরু করে কল্পিত আত্মার উন্নতিবিধান তাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটাই সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের অথবা শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্যে নিয়োজিত নয়। গণবিমুখতা, দেশের নাড়ি ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সকলের ভেতর, সমভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া, যে অর্থনীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী, তা স্মিথীয় (Adam Smith) ধনতন্ত্রের পর প্রতিষ্ঠিত। অবাধ বাণিজ্য করে অমিত বিত্ত ব্যক্তির হস্তে সঞ্চিত হোক, তৎকালীন ইংরেজ ও এদেশীয় ব্যবসায়ী, বেনিয়ান ও জমিদারদের সঙ্গে তাঁরাও এ মতের পোষক ছিলেন।[৩৫] যে সমাজের গভীরে তাঁদের মনের শিকড়

প্রোথিত, তার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আত্মহননের দুঃসাহস তাঁদের সচেতন অথবা অবচেতন মননে ছিলো না। কিন্তু ধর্মকে আঘাত দিয়ে, কৌলীন্যকে মূল্যহীন প্রতীয়মান করে বিদ্যা ও বিত্তের সহায়তায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাংক্ষা তাঁদের মনে প্রবল ছিলো। কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ভারতবর্ষ পুরোপুরি ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হোক, সমকালীন অন্যান্য শিক্ষিত ও বিত্তবানদের মতো তাঁদের এই কামনা, এ দলের স্ববিরোধের আর একটি নমুনা। সমূহ লাভের কথা ভাবলেন, অথচ ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর দৃষ্টি তাঁদের ছিলো আচ্ছন্ন। সুশোভন সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

"Many of Young Bengal's true limitations were not peculiarly its own but shared by our entire Renaissance. The educated community of the 19th century failed to understand the exploiting character of the alien British rule in India. Looking mainly at its immediate benefits, the protagonists of our 'awekening' had little contact with or understanding of the toiling masses who lived in a world apart, the obsession of the Hindu traditions and life kept at a distance the community of our fellow citizens."[৩৬]

এ দলেরই অন্যতম, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৌতুকজনক নিশ্চয়, সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্যে—বিশেষত আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্যে—অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে তিনি 'রামারঞ্জিকা', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা' ও 'বামাতোষিণী' নামক তিনখানা পুস্তক রচনা করেন। এও তাঁর পূর্বোক্ত বিপ্রতীপ ভাবের স্বাক্ষর, কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর জনবিমুখ কার্যকলাপের সঙ্গে।

সামগ্রিকভাবে ইয়ংবেঙ্গলদের এবং বিশেষভাবে প্যারীচাঁদের স্ববিরোধসমূহের অন্তর্নিহিত কারণগুলো রহস্যময় বলে বোধ হলেও,

খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ইয়ংবেঙ্গলরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে কঠিন হস্তে আঘাত করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা যে পরিমণ্ডলে জাত ও লালিত, তা তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান করে নি। Ralph Linton-এর একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে:

"New social invensions are made by those who suffer from the current condition not by those who profit from them."[৩৭]

প্যারীচাঁদ ও তাঁর বন্ধুদের পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের কারণ লুকিয়ে আছে প্রধানত এই একটি সূত্রে।

ইয়ংবেঙ্গলদের পারিবারিক, কৌলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁরা অধিকাংশ অকুলীন। অকুলীন বলেই ধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য যথেষ্ট নয়, কেননা ধর্ম তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করেনি। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী ও রাধানাথ শিকদার ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, তাঁদের আর্থিক অবস্থা আবার যথেষ্ট খারাপ ছিলো। ব্রাহ্মণ্যের মূল্যহীনতা এবং বিত্তের যথার্থ মূল্য দৃষ্টে, এঁরাও আপন ধর্ম সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন।

ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রোহের প্রধান হেতু অবশ্য তাঁদের অর্থনৈতিক দৈন্য। এই মেধাবী ছাত্রবৃন্দ প্রকৃত পক্ষে পরিবারের দারিদ্র্য ও তার দরুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব দেখেই ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হতে পেরেছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষা এ বিষয়ে হয়তো তাঁদের যথার্থ পথ দেখিয়েছে। অন্যথায় তাঁরা বোধহয় পূর্বপুরুষদের মতোই দারিদ্র্য ও সামাজিক বিধানকেই নিয়তি বলে মেনে নিয়ে 'সর্বশক্তিমান' 'পরম করুণাময়' অদৃশ্য শক্তির প্রতি সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল ও

অনুগত হতেন। এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় একটি বিষয় থেকে, পরিণত জীবনে ইয়ংবেঙ্গলগণ ডেপুটিগিরি অথবা পাদ্রিগিরি, অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করে আর্থিক দৈন্য ঘুচিয়ে পুনরায় বৃহৎ সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছেন, একান্ত নিঃশব্দতায়।

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের সাথে প্যারীচাঁদের যোগাযোগ অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ রকমের ছিলো, আগেই তা বলা হয়েছে। তথাপি ইয়ংবেঙ্গলদের নাম উল্লিখিত হলে সাধারণত প্যারীচাঁদের কথা দেরিতে ওঠে। এমনকি ইয়ংবেঙ্গলদের অন্তর্ভুক্ত তাঁকে সাধারণভাবে করা হয় না। তার কারণ, প্যারীচাঁদ এঁদের সাথে বাহ্যিক যোগ যতটা ঘটিয়েছিলেন, আত্মিক যোগ ততটা অনুভব করেন নি। না করারই কথা। কেননা, বিত্তবান পরিবারের তিনি প্রতিনিধি, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিলো তাঁদের। অর্থকরী বলেই তিনি প্রথমে শিখেছিলেন ফারসি, কিন্তু যুগের হাওয়া পরিবর্তিত হওয়ায় হিন্দু কলেজে এসেছিলেন ইংরেজি অধ্যয়ন করতে, সেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধের কথা চিন্তা করে। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা ছেলেদের ইংরেজি শেখাতেন এই দিকে লক্ষ্য রেখে, সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ডিরোজিওর শিক্ষা সেহেতু তাঁকে আকৃষ্ট ও কৌতূহলী করলেও, চিরাচরিত সংস্কার ও আচারের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

একথা মনে রাখা আবশ্যক, আমরা যা কিছু অধ্যয়ন করি, তার সব-কিছু আমাদের আত্মাকে উদ্‌বোধিত অথবা আলোকিত করে না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ উক্তির যাথার্থ্য স্বীকৃত হবে। আমরা ডিগ্রি পাই, কিন্তু জ্ঞানার্জন করি না, আমরা শিক্ষিত হই কিন্তু পরিশীলিত রুচির অধিকারী হই না। প্যারীচাঁদ যদি Becon, Hume, Paine, Locke পড়েও মুক্তিবুদ্ধি লাভ না করে থাকেন, প্রচলিত সংস্কারের প্রতি তাঁর আস্থা বিচলিত না হয়ে থাকে, বিস্মিত হলেও, তাকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই।

ছাত্রজীবনে, এমন কি, তার অব্যবহিত পরেও প্যারীচাঁদের সঙ্গে প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্বান হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে, চিন্তাশীল হিসেবে, সমাজনায়ক হিসেবে এবং সর্বোপরি বিত্তবান হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাঁর অতীতমুখী মানসিকতা আর চাপা থাকেনি। 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' গ্রন্থ দুটির উপজীব্য যদিচ নিরঙ্কুশ ভাবেই নীতিকথা ও স্বাজাত্যভিমান, তথাপি তার মধ্যে যেটুকু ছদ্ম প্রগতিবাদ আছে, তা-ও নিঃশেষিত পরবর্তী রচনা-সমূহে। সেখানে তাঁর সঙ্গে রাধাকান্ত দেবের কোনো বিরোধিতা নেই। তখন সতীদাহের সমর্থন কিংবা বিধবাবিবাহের নিন্দায় তিনি সোচ্চার। আধ্যাত্মিকতা ও প্রেততত্ত্বের চর্চায় তিনি ঐকান্তিক, কেননা বৈষয়িক উন্নতির চরমে উঠে, বিষয়চিন্তা থেকে তিনি বিমুক্ত। ভাবতে অবাক লাগে; যিনি ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত লিখেছেন, তিনিই আবার একান্ত রক্ষণশীল রামকমল সেনের জীবনী রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রক্ষণশীলতা পারিবারিক সূত্রেই তিনি লাভ করেছিলেন ; ডিরোজিওর মুক্তবুদ্ধি আর উদারব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যদিবা ক্ষণিকের জন্যে তাঁর নয়নযুগল উদ্ভাসিত হয়েছিলো, তথাপি অন্তরের সযত্ন লালিত অন্ধকার বিদূরিত হয়নি কখনো। এক ভণ্ড প্রগতিশীলতা এই কারণে তাঁর পাঠকদের তাৎক্ষণিকভাবে মুগ্ধ করলেও, তাঁর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে মেকিত্ব ধরা পড়তে দেরি হয় না। রক্ষণশীলতাকে ছদ্মপ্রগতি-শীলতার আবরণ পরিয়ে চোখ ভোলানোয় পরবর্তীকালে যিনি ওস্তাদি লাভ করেছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত প্যারীচাঁদকে আপন পূর্বসূরীরূপে প্রত্যক্ষ করে নিন্দনীয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। নিন্দনীয়, কেননা, একের প্রশংসা করতে গিয়ে যথার্থ প্রশংসনীয় অন্যজনের নিন্দায় তিনি মুখর।

বিদ্যাসাগর কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেছেন ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্য, যে সমাজে তিনি লালিত তা ধর্মীয় আচারে সম্পৃক্ত—ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে বিত্তহীনতা ব্যতীত তাঁর অন্য কোন সাদৃশ্য নেই, অবশ্য এ ব্যাপারেও তিনি পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি দরিদ্র। ইয়ংবেঙ্গলগণ ডিরোজিওর মতো বিমুক্তমনের অধিকারী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিতাবিশিষ্ট একজন শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সামাজিক ও শিক্ষাগত status-এর অভাবে বিদ্যাসাগরের পক্ষে না অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন না ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়া সম্ভব ছিলো। এমন কি, তাঁদের মতো ইংরেজি শিখে পাশ্চাত্যের মনীষীদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও তিনি ছাত্রজীবনে পাননি। একান্তভাবে সনাতন সমাজব্যবস্থাকে মেনে, কৌলীন্যের আস্ফালন করে আর ধর্মীয় বিধান দিয়ে দিনযাপনই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হতো। কিন্তু এর বদলে দেখতে পাই, সামাজিক অচলায়তনকে রূঢ় আঘাতে ধূলিসাৎ করতে তিনি প্রয়াসী। দ্বিতীয়ত, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি এত অনীহ যে, তাঁকে প্রায় নিরীশ্বর বলে মনে করা সঙ্গত। তৃতীয়ত, আবাল্য যে প্রাণহীন ও অর্থহীন শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন, তাকে আমূল পরিবর্তিত করার চেষ্টায় তিনি একনিষ্ঠ। চতুর্থত, তথাকথিত প্রগতিবাদী ইয়ংবেঙ্গলদের উল্টো, তিনি শিক্ষাকে সার্বজনিক করতে প্রযত্নবান। সর্বোপরি, তাঁর চিন্তা মানবমুখিন এবং তাঁর কার্য গণকেন্দ্রিক।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য রূপায়ণের কারণ আপাত বিচারে দুর্লক্ষ্য হলেও, সে রহস্য অনাবিষ্কৃত থাকে না। পূর্বে লিণ্টনের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, সে কথা স্মরণ করে পুনরায় বলা যায়, যে-প্রতিবেশে তিনি লালিত তা থেকে লাভবান হননি বলেই, তিনি তার মূল্যহীনতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তার সংস্কার করে নতুন পরিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আর্থিক দৈন্য তাদের প্রায় পুরুষানুক্রমিক। তাঁর পিতামহী তাঁর পিতাকে খাওয়াতেন সুতো কেটে। আর তাঁর পিতা বয়ঃসন্ধিকালে কলকাতার রাস্তায় অভুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, ফলার করেছেন এক দরিদ্র বিধবা পসারিণীর দয়ায়। অর্ধাশনে দীর্ঘকাল কাটিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত দুটাকা বেতনের চাকুরি পান তখন তিনি বিলক্ষণ আহ্লাদিত হন।[৩৮] বালক বিদ্যাসাগর নিজেও কলকাতার বাসায় আপন হাতে রেঁধে খেতেন, নানারূপ অর্থকৃচ্ছ্রতায় তখনো তাঁর পিতা ছিলেন বিপর্যস্ত। পুত্রের 'বৃত্তি' পরিবারের আর্থিক সহায়তার কারণ হয়েছিলো। কিন্তু দরিদ্র হলেও একটি বিষয়ে তাঁর পরিবার অমিত বিত্তের অধিকারী ছিলেন, তা-ই উত্তরাধিকার সূত্রে রিক্‌থ হিসেবে অর্সে ছিলো ঈশ্বরচন্দ্রের পর। তাঁর পিতামহের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও পৌরষ এবং মাতার ঔদার্য, করুণা ও মানবিকতা প্রভূত পরিমাণে তাঁর চরিত্রে লক্ষণীয়। দয়া, উদারতা, সহানুভূতি বিদ্যাসাগরের সহজাত ছিলো। তদুপরি এ গুণাবলীর সঙ্গে সীমাহীন তেজ, কিছুতেই হার-না-মানার অপরাজেয় শক্তি যুক্ত হয়েছিলো।[৩৯]

আপন পরিবারে ও প্রতিবেশে বিদ্যাসাগর দারিদ্র্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ করেছিলেন ধর্মের সহস্র বিকার।

> "বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কৌলিক সংকীর্ণতার গভীর অন্ধকারের মধ্যে। তাঁর বাল্য পরিবেশে আলোর ক্ষীণ রশ্মিও ছিল না কোথাও। যজন যাজন, গুরুতা অধ্যাপনার সনাতন কুলবৃত্তির শোচনীয় অর্থনৈতিক ও মর্মান্তিক সামাজিক পরিণতি তিনি নিজের পারিবারিক জীবনেই দেখেছিলেন।"[৪০]

উৎপাদনকার্যে ব্রাহ্মণদের ঐকান্তিক নিষ্ক্রিয়তা ও সম্পূর্ণরূপে পরশ্রমজীবিতার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণরা আর্থিক দুর্গতির চরমে পৌঁছে-

ছিলেন। ধর্ম ও অত্যাচারের দোহাই দিয়ে, পৌরহিত্য ও গুরুতা করে অন্নসংস্থান করা ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, বিশেষত পরিবর্তিত যুগের প্রেক্ষিতে, আর সম্ভব হলো না।

"তিনি দেখেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যের বা কৌলীন্যের মর্যাদা ফাঁপা হয়ে গেছে, কারণ তার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই।...যে মর্যাদার আর্থিক ভিত্তি নেই; অতীতে তার কোন অর্থ থাকলেও, বর্তমানে তা অর্থহীন। তার জন্যই প্রধানত কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার উদ্‌ভাবন প্রয়োজন হয়েছে, অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে। কঠোর জীবন সংগ্রামের সমাধান করেছেন ব্রাহ্মণরা কৌলীন্য ও অন্যান্য প্রথার আশ্রয়ে। তার অর্থনৈতিক বাস্তবটাই রূঢ় ও বড় সত্য, ধর্ম ও শাস্ত্র অর্ধ-সত্য মাত্র।"[৪১]

পীড়ন ও শোষণ যত নির্মম হবে, তার প্রতিক্রিয়াজাত বিদ্রোহও তত প্রচণ্ড হতে বাধ্য। আপন পরিবার ও পরিবেশে ধর্মের অমানুষিক সংকীর্ণতা ও বিপুল বিকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই, এর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ ও সংস্কারপ্রয়াস এমন প্রবল।

ঈশ্বরচন্দ্র যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিলো নিতান্তই চিরাচরিত। যে-সংস্কৃত কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে, তা একপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই সৃষ্টি। ইংরেজেরা চেয়েছিলেন প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কায়েমী করে যুগপৎ শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের দানশীলতা ও উৎসাহ সপ্রমাণ করতে এবং অতীতমুখী শিক্ষা বিকীর্ণ করে উপনিবেশকে চিরদিন মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে। অপর পক্ষে, দেশীয় নব্যশিক্ষিত ও বিত্তবানরা চেয়েছিলেন শাস্ত্রীয় ও দেবভাষার শিক্ষাকে পাকা করে সমাজে আপনাপন প্রতিষ্ঠাকে চিরস্থায়ী করতে। যেহেতু তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে এবং ইংরেজিতে শিক্ষিত হয়ে সমাজজীবনে অপরিহার্য গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন, তার জন্যেই ইংরেজি শিক্ষার আর বেশি সম্প্রসারণ না হলে, তাঁদের নেতৃত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্ব

থাকে এবং তার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটলে সংস্কারাচ্ছন্ন জনগণকে শাসন করা সহজসাধ্য হয়। অতীতমুখী শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় এবং যুগের পক্ষে অনুপযোগী, রামমোহন তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে এ কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবিষয়বস্তু একান্তভাবে পৌরাণিক, একমাত্র প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত, উপযোগিতার মাপে, অন্য কিছু পাঠ্য ছিল না। প্রাচীন দর্শন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অ্যাকাডেমিক মূল্য ছাড়া তার গৌরবের আর কিছু ছিলো না। সমকালীন য়ুরোপ চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তুলনায় এত অগ্রসর ছিলো যে, আপেক্ষিক-ভাবে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন অথবা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন, হাস্যকর রকমের কালাসঙ্গতি। মনে রাখা আবশ্যক, আলোচ্য কালের পূর্বেই ফরাসি বিপ্লব অথবা শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ দেশেও য়ুরোপীয় লিবারেলিজ্‌মের হাওয়া লেগেছিলো। রামমোহন তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন :

> "The enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."[৪২]

ডিরোজিওর অধ্যাপনায় কলেজ স্কোয়ারের অন্য কয়েকটি উৎসাহী বালক সমকালে লিবারেলিজমের দর্শনে দীক্ষিত হচ্ছিলেন। তারপর :

> "ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর পরে ইয়ংবেঙ্গলদের তরী যখন ঘূর্ণিবাত্যায় সমাজবক্ষে টলটলায়মান কৃষ্ণমোহন ও তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধু যখন তার কাণ্ডারী, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র। বাংলার নব্য ইংরেজী শিক্ষিত তরুণরা যখন বেকন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, টমপেইন পড়ছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রিয় অধ্যাপকের কাছে রঘুবংশ কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা ইত্যাদি সাহিত্য রসভাণ্ডার আস্বাদন করছেন।"[৪৩]

বিদ্যাসাগরের অধীত বিষয় এবং অধ্যাপক উভয়ই পূর্ববর্তীদের তুলনায় সেকেলে। যে প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক বালক ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজ গঠনে তার গুরুত্ব ও নব্য য়ুরোপীয় দর্শনের ভূমিকা দুস্তর ব্যবধান রচনা করে। আবার ডিরোজিও সমসাময়িককালের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহী, পোষক ও প্রচারক নবতম মতাদর্শের ; অন্যদিকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ধর্মসভার সদস্য, প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্রবল ও যুক্তিবর্জিত। ধর্মসভা পত্তনের ইতিহাস প্রসঙ্গত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে, রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতারা পরের জানুয়ারি মাসে এ সভা স্থাপন করেন। রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যপন্থী সংস্কারপ্রচেষ্টা এবং ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে ভাঙার প্রচণ্ড আঘাত, উভয়ের সম্মুখীন হওয়ার জন্যেই এ সভার সৃষ্টি। গগনভেদী চীৎকার আর দর্পভরা আস্ফালনের জন্যেই এ সভা সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিলো 'গুড়ুম সভা' রূপে।[৪৪] বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ শিক্ষকই এ সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিতদের শিষ্য ও অতীতমুখী বিষয়বস্তুর পাঠক হিসেবে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে সঙ্কীর্ণ, সংস্কারাচ্ছন্ন ও অনুদার এক টোলো পণ্ডিতে পরিণত হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আশ্চর্য এক ব্যতিক্রমরূপে গণ্য হয়েছেন। তাই দেখতে পাই পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম ও কলেজের অন্যান্য নিয়মকে তিনি দুঃসাহস ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে সংস্কৃত করতে পেরেছিলেন। শিক্ষাদর্শের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ; তার কারণ বাল্য ও যৌবনকালে একপেশে একটি শিক্ষাযন্ত্রের নিচে তাঁর প্রাণোচ্ছল মন নিষ্পেষিত হয়েছিলো। যে দর্শন মানুষের হৃদয়কে অপ্রাকৃতে আস্থাশীল করে অথবা অতীতের মায়াজালে বন্দী করে,

ভারতীয় কিংবা য়ুরোপীয় যা-ই হোক না কেন, তাকে তিনি ছাত্রদের পাঠের অনুপযোগী বলে বিবেচনা করেছেন। বার্কলের 'Inquiry' গ্রন্থ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইনের বাদপ্রতিবাদ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।[৪৫] সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে, তিনি তাকে আগাগোড়া সংশোধন করেছিলেন।

পাঠ্যপুস্তক রচনা করার ব্যাপারে তাঁর যে আগ্রহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য করি, তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য দৃষ্টে এ প্রেরণা তিনি লাভ করেন। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর রচনার সূত্রপাত হয় পাঠ্যপুস্তক লেখার মধ্য দিয়ে। প্রমথনাথ বিশী যে বলেছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন সত্যিকার-ভাবে কর্মজীবনের প্রক্ষেপ মাত্র,[৪৬] সে কথা অত্যন্ত খাঁটি। দেশের অন্ধ জনগণকে শিক্ষার আলোকে আনবার মহান প্রয়াস নিয়ে তিনি কর্মজীবনে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা তারই অঙ্গমাত্র। তাঁর প্রথম রচনা বলে খ্যাত 'বাসুদেবচরিত' অথবা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' তিনি লেখেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষের আদেশে, সে কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে। নীরস হিতোপদেশের কাঠিন্য বিদূরিত হয়ে বেতালের লালিত্য ও সাবলীলতা শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের সহায়তা করেছিলো। এমনি Calcutta School Book Society-এর 'বর্ণমালা', ক্ষেত্রমোহন দত্তের 'শিশুসেবধি' ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রচলিত থাকলেও, ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর যে 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ করেন, সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় তা যুগান্তরের শিক্ষা।[৪৭] এ গ্রন্থ রচনার পেছনে তাঁর যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে গণশিক্ষার প্রসার। 'মুগ্ধবোধ'-এর পরিবর্তে 'উপক্রমণিকা' অথবা 'ব্যাকরণ কৌমুদী'

রচনা করার পেছনেও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্যাকে সহজে সাধারণের মধ্যে পরিকীর্ণ করে দেওয়া।

বিদ্যাসাগরের চিন্তা কতখানি আধুনিক ছিলো, বিশেষত তাঁর শিক্ষা-চিন্তা থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে 'শিক্ষা' বিষয়ক অত্যাধুনিক য়ুরোপীয় গ্রন্থাদি অনেকগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে। সমসাময়িককালে যে সকল য়ুরোপীয় মনীষিগণ 'শিক্ষা' সম্বন্ধে রীতিমতো ভাবতেন তাঁদের সকলের রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন।[৪৮]

দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সমাজে বড়ো হয়ে এবং প্রাণহীন উপযোগিতাহীন অতীতমুখী শিক্ষালাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র দেশীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও শিক্ষাব্যবস্থার অবাস্তব নিরর্থকতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন। তদুপরি, যদিও তিনি ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসতে পারেননি অথবা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি, তথাপি নাতিদূরত্ব থেকে সমাজে যে পরিবর্তনের ঝড় উঠেছিলো তার গতি ও প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ একই ভবনে অবস্থিত ছিলো, সুতরাং সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের ছাত্র হলেও, বিদ্যাসাগর ডিরোজিও ও তাঁর বিপ্লবী শিষ্যদের দেখে থাকবেন, তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁদের যুক্তিশাণিত বক্তব্য তিনি অবশ্যই শুনে থাকবেন। যে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি আপনি হয়তো মনের গভীরে অথবা অবচেতনায় ক্ষুব্ধ ছিলেন, ইয়ংবেঙ্গলদের আন্দোলন কিশোর ঈশ্বরচন্দ্রের সেই ক্ষোভ ও অসন্তোষকে হয়তো আলোড়িত করে থাকবে। সমকালে না হলেও এ আন্দোলন তাঁকে আর একটু পরিণত বয়সে নিঃসন্দেহে ভাবিত করেছিলো, সেই সঙ্গে তাঁদের ব্যর্থতা তাঁকে পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করেছিলো সংস্কারের পথ ধরে অগ্রসর হতে। এ ব্যাপারে, সমাজের ভেতরে অবস্থান করেই সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতিকে সংশোধনের যে প্রযত্ন ছিলো রামমোহনের,

বিদ্যাসাগর যৌবনকালে তা-ও নিশ্চয় বিশেষ কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করেছিলেন। রামমোহনের এই সংস্কারের চেষ্টা ও ইয়ংবেঙ্গলদের ভাঙ্গার আঘাত উভয়ের তুলনামূলক বিচার করে, সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বহু শতাব্দীর বিস্তীর্ণ সময়ের পটভূমিকায় রচিত যে সমাজ, তার জীর্ণতাকে এক চরম আঘাতে আকস্মিকভাবে ধরাশায়ী করা অসম্ভব, প্রতিক্রিয়া তখন অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে, প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আচারের সংকীর্ণ গণ্ডিকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন অপসৃত করা অনেক সহজ। রামমোহন সমকালীন সমাজকে সংস্কৃত করার চেষ্টা করেন প্রাচীন ধর্ম ও শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত ও মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করে। এই জন্যে, তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়া হোক এর প্রস্তাব করে যে পুস্তিকা লিখেন, তাতে সতীদাহ কতটা শাস্ত্রসম্মত তারই বিচার করেছেন। যেহেতু তিনি জানতেন যদি প্রমাণ করা যায় সতীদাহ শাস্ত্রবিরোধী তাহলে সেটা যত সহজেই প্রাচীন সমাজকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবে, মানবিকতা অথবা র‍্যাশনালিজম্ ততটা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে সতীদাহের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখান, তাতে শাস্ত্রের চেয়ে মানবিকতা, যৌক্তিকতা, অথবা সতীদাহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। কেবল সতীদাহ নয় সমাজের অন্যান্য বহু সংস্কারের বন্ধন থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার মানসে তিনি অমানুষিক আচারের পরিবর্তে সনাতন ধর্মের মানবতার বাণীকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় প্রচার করে, ধর্ম সম্বন্ধে সকল মিথ্যার অবসান ঘটাতে তিনি উৎসুক হয়েছিলেন।

চরম পন্থা দিয়ে হোক অথবা সংস্কারের বিলম্বিত লয়ে হোক, মিথ্যা আচারসর্বস্ব জীর্ণসমাজের আমূল পরিবর্তন যে আবশ্যক, ডিরোজিয়ান ও রামমোহনীয় শিক্ষিতরা সকলেই তা অনুভব করেছিলেন, উভয় দলের প্রভেদ প্রধানত প্রতিকারের পথ নিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র এঁদের মুক্তবুদ্ধির

যারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তদুপরি ছাত্রজীবন সমাপন করে রীতিমতো ইংরেজি শিখে (তাঁর ইংরেজি দেখে মনে হয় ভাষাটি তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন) তিনি পাশ্চাত্যের মনীষীদের দর্শন অধ্যয়ন করেন। বেন্থামের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন যদি 'সাড়ে তিন কোটি' দেবদেবীর বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেন, পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য এবং নিঃসন্দেহে মহত্তর প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র কেন বেকন, হিউম, বেন্থাম ও মিলের রচনাপাঠে নিরীশ্বর হতে পারবেন না, বিশেষত অর্থকৃচ্ছ্র তার মুখে ধর্মের অর্থহীনতা ও ভণ্ডামি আত্যন্তিকভাবে যিনি আবাল্য অনুভব করেছেন।

প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করে তার নতুন মানবীয় ব্যাখ্যা দান এবং মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা এ দেশে নতুন হলেও প্রকৃতপক্ষে কিছু অভিনব নয়। রেনেসাঁর যুগে চার পাঁচশ বছর আগে থেকেই এই প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় মোহাচ্ছন্ন পরিবেশে এই পণ্ডিতগণ অতীতের শাস্ত্র ও সাহিত্যকে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনঃপ্রচার করেছিলেন, সেহেতু হিউম্যানিস্ট বলে পরিচিত এই পণ্ডিতগণ। রামমোহন এবং ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ই প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের সম্পাদনা, নব ব্যাখ্যাদান, গদ্য ভাষাকে সমর্থ এবং প্রকাশক্ষম করে তোলার প্রয়াসে, পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের সঙ্গে অনায়াসে তুলিত হতে পারেন। সে কারণে, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়ই, বিশেষত বিদ্যাসাগর, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরূপে সুপরিচিত। কিন্তু চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতাব্দীর আইডিআ ও কর্মপন্থাকে উনবিংশ শতাব্দীতে অনুকরণ করার মধ্যে আধুনিকতা ও কালোপযোগিতা কোথায়? বিদ্যাসাগর যদি রেনেসাঁ যুগের কর্মযোগীদের শুদ্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন তা হলে সত্যি তাঁকে অনাধুনিক বলতে হতো। কিন্তু সুখের বিষয়, এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কালচেতনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন; এমন কি, তিনি স্বকালের চেয়ে অনেক প্রাগ্রসর একথাও বোধহয় বলা চলে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রেনেসাঁর কর্মিগণ মানবতার যে বাণী শুনিয়েছিলেন, তা ঈশ্বর ও ধর্মকে বর্জন করে নয়, যদিও তাঁদের focus ছিলো মানবীয়তা। অপর পক্ষে, বিদ্যাসাগর যখন শাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্যকে পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রচার করলেন তখন তা একান্তভাবেই স্বকালের মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে করলেন। তিনি আশা করেছিলেন এর ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মসম্পর্কে যাবতীয় কুসংস্কার ও রহস্যময়তা, পুরোহিতকুলসম্পর্কে সকল রকমের অলৌকিক ভক্তি এবং আচার-সম্পর্কে মিথ্যা মোহ থেকে মুক্ত হবে। সেই সঙ্গে তাদের গড়ে উঠবে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আদর্শ এবং রুচি। ধর্মের জঞ্জাল মুক্ত হয়ে মানবীয় বাণী নিয়ে সাহিত্য প্রবল ধারায় বয়ে চলবে। রেনেসাঁ যুগের পণ্ডিতগণ যেখানে ধর্ম ও মানবিকতাকে পরিপূরক বলে গণ্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর সেখানে সযত্নে ধর্মকে এড়িয়ে চলেছেন। বিদ্যাসাগরের মানবিক আদর্শ ধর্মের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, নিদেনপক্ষে মানবিকতা ও ধর্ম পরিপূরক নয়। বিদ্যাসাগরের মানবিকতা সমকালীন য়ুরোপীয় দর্শনের তুলনায় পশ্চাৎপদ তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রাগ্রসর। কেননা তাঁর মানবিকতা বিশুদ্ধ মানবিকতা, সে আদর্শ মোটেই ঈশ্বরনির্ভর নয়।

ধর্মসম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস যতই প্রবল হোক না কেন, সংস্কার বিষয়ে তিনি মূলত রামমোহনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি রামমোহনের চেয়ে অধিকতর সৎসাহস, একাগ্রতা, অবিচলতা ও প্রত্যক্ষতা দেখিয়েছেন। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করলেন বই লিখে কিন্তু ইংরেজ সরকারকে প্রভাবিত করে আইন পাশ করান যুক্তি দেখিয়ে। তারপর তিনি এখানেই থেমে যাননি, আর্থিক সাহায্য ও লোকবল দিয়ে তিনি বাস্তবেও বিধবাবিবাহ দিলেন, এমন কি তাঁর পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এক বিধবা বালিকার। বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত, মানবিক বিবেচনাই তার যৌক্তিকতা প্রমাণে যথেষ্ট, তার জন্যে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রের দ্বারে ধর্ণা দেওয়ার

প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু সংস্কারে মোহাচ্ছন্ন জনমনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই তিনি বিচলিত করতে চেয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বৈধব্যের সাথে সমানুপাতিক, এই জন্যে তার উচ্ছেদে অতঃপর বিদ্যাসাগর তৎপর হন। প্রসঙ্গত বিষয়টি স্ফটিকস্বচ্ছ করা আবশ্যক যে, কর্মপদ্ধতির আপাত সাদৃশ্য থাকলেও, বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো সংস্কারবাদী ছিলেন না, তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিলো রীতিমতো বৈপ্লবিক। তবে সমাজকে ভাঙ্গার আঘাত তিনি দেননি, কেননা তিনি জানতেন সে চেষ্টা কালোপযোগী অথবা বাস্তব হবে না। অকাল ও অবাস্তব প্রয়াস ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যর্থতা অনিবার্য করে তুলেছিলো, আপনি তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই, বিদ্যাসাগর সংস্কারের ধীরপন্থার দ্বারা তাঁর বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রাগ্রসর চিন্তার জন্য যেখানে তিনি একান্তই বৈপ্লবিক, সেখানে ব্যর্থতাই তাঁর সর্বমোট প্রাপ্তি। তাঁর ব্যর্থ প্রয়াসগুলোই যথার্থ আধুনিক। বিধবাবিবাহের প্রবর্তন এবং বাল্য- ও বহুবিবাহের নিবর্তনের চেয়েও ঈশ্বরচন্দ্রের গণসচেতন মনের বড়ো পরিচয় বিধৃত তাঁর শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায়। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, ধর্মের পসরা ফেরি করে দিনযাপনের কাল শেষ হয়ে এসেছে, মানুষকে অধিকতর শোচনীয়তা থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ শিক্ষার বিকিরণ। অধ্যক্ষ হয়ে এই কারণে, প্রথমেই তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্যে, এ যাবৎ রুদ্ধ, সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলেছেন। এবং নবীকরণের মাধ্যমে অতীতমুখী শিক্ষাকে আধুনিক যুগোপযোগী করার প্রয়াস পান। কিন্তু কলকাতার মুষ্টিমেয় ধনিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু সংখ্যক ছাত্রদের ভেতর শিক্ষাকে সীমিত করে রাখলে, অসাড় জনচিত্তকে জাগানো সম্ভব হবে না, এ তিনি ভালো করেই জানতেন। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ১৮৫৭ সালের নবেম্বর মাস থেকে পরের বছর মে মাসের ভেতর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ১৩০০ ছাত্রী ভর্তি হয়।

এ ছাড়া ১৮৫৫-এর অগস্ট থেকে শুরু করে ছ মাসের ভেতর বিভিন্ন জেলায় তিনি ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতার মেট্রোপোলিটান কলেজে তৎকালে সবচেয়ে কম ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারতো।[৪৯] এখানে উল্লেখযোগ্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বাংলা স্কুল নামেও পরিচিত ; কেননা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে সাময়িক পরিকল্পনা সরকার সেকালে নিয়েছিলেন, এ বিদ্যালয়গুলি তারই অঙ্গ। দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকরূপে তিনি একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। একান্ত বাস্তববাদী অক্ষয়কুমার দত্তকে তিনি এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে বীরসিংহ স্কুলের কথা উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য। এ বিদ্যালয় দেখে পরিদর্শক ১৮৫৯ সালের ২০শে মে লেখেন যে, ছাত্রদের বইপত্র, এবং দরিদ্র ছাত্রদের আহার, বস্ত্র, ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র।[৫০]

শিক্ষাকে সার্বজনিক করার চেষ্টা কেবল বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়াসের মধ্যে সীমিত ছিলো না, বরং বিজ্ঞানসম্মত টেক্স্ট বুক রচনা করে সহজে এবং অল্প সময়ে শিক্ষাসম্প্রসারণ তাঁর অন্যতম প্রচেষ্টা ছিলো, আগেই তা বলা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রশংসা করা সম্ভব হয়নি, কেননা এর পেছনে বিদ্যাসাগরের আসল যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা-ই তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। সহজে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্ররা যাতে সংস্কারমুক্ত একটি বাস্তব মানসের অধিকারী হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের লক্ষ্য সেদিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিলো। তাই দেখতে পাই, ঈশ্বরের কথা তিনি প্রথমে আদৌ বলেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এ গ্রন্থ মার্জিত করেন, তখনও ঈশ্বর এলেন

বস্তুর পরে।[৫১] বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে টেক্স্টবুকের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা উপলব্ধি করেন বলেই বিদ্যার সাগর হলেও তিনি নিম্ন-শ্রেণীর জন্যে বই লিখতেন। অনুমান যদি অমার্জনীয় অপরাধ না হয়, তা হলে বলা চলে, বিদ্যাসাগর যদি শতবর্ষ পরে আজকের দিনে লিখতেন তা হলে শিক্ষাকে আজো সমাজের উপরতলায় গণ্ডিবদ্ধ দেখে নিশ্চয় বই লিখতেন বয়স্কদের শিক্ষার উপযোগী করে। সে গ্রন্থ অত্যন্ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক হতো, আর তাতে মানুষের ইতিহাস যে প্রকৃতপক্ষে শোষণের ইতিহাস তা-ই হয়তো যুক্তাক্ষরবর্জিত একান্ত সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা থাকতো। আর এযুগে জন্মালে তিনি শিক্ষকতা না করে বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা হতেন সম্ভবত।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি আপাত অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাষা প্রাচীনপন্থী বলে ভ্রম হতে পারে। সত্যিকার বিচারে বোধ হয় এ পর্যবেক্ষণ টেঁকে না। কেননা, তাঁর বিষয়বস্তু প্রাচীন হলেও, দেখা যাবে, যে রস তাতে পরিবেশিত তার মধ্যে ধর্ম ও সংস্কারের কোন ভেজাল নেই। বরঞ্চ, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও মানবতাবোধ তার কেন্দ্রীয় ভাববস্তু ; একান্তভাবে সাহিত্যরুচি গঠনের নিমিত্ত, তিনি প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে তাঁর অনুবাদ ও বহু জীবনীরচনার কারণও একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাজাত। আর বিদ্যাসাগরের ভাষাসম্পর্কে বক্তব্য পূর্বেকার ভাষার তুলনায় তাঁর ভাষা অনেকটা গণমুখী। প্রসঙ্গত সুপরিচিত সেই জনপ্রিয় গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি পণ্ডিতসভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, লিখিত হলে তার ভাষাদৃষ্টে অধিকাংশ পণ্ডিতের মন্তব্য : অ্যাঁ, এ কী হয়েছে ? এ যে বিদ্যাসাগরের ভাষার মতো—সবই বোঝা যায়। বস্তুত, বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দান করেন।

"বিদ্যাসাগরের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা[৫২] এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযোগ্য গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাহিত্যযোগ্য লালিত্যময় সুডৌল গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা সাহিত্যের ও সংসারের প্রায় সব রকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।"[৫৩]

তদুপরি বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে বিশেষ করে একটি বলিষ্ঠ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর রচনাশৈলি বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সকল বিষয় প্রকাশের সুপ্ত ক্ষমতা ধারণ করতো। ম্রিয়মাণ জাতির অসাড় চিত্তকে জাগ্রত করার নিমিত্ত, জ্ঞানের বাহন বলে গণ্য হতে পারে, এরূপ একটি গদ্যরীতির আবশ্যিকতাই আত্যন্তিক। জনগণের সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্যকে প্রস্তুত করেছিলেন। বুদ্ধি ও কৌতুকদীপ্ত তাঁর রচনাভঙ্গিতে তৎসম শব্দের কিঞ্চিৎ বাহুল্য অবশ্য স্বীকার্য। তাছাড়া 'বেতালে' অথবা 'সীতার বনবাসে' তিনি অবরুদ্ধ থাকেন নি; বরং নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্ণপরিচয়ে অথবা আত্মজীবনীতে কিংবা প্রভাবতীসম্ভাষণে; ভ্রান্তিবিলাস, অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল বা ব্রজবিলাসে তাঁর ভাষা নিয়ত প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে।

"উপযুক্ত ভাইপো খুড়র সঙ্গে বিচার করিতে পিছ পাও হইবেন, যদি কেহ ভুল-ভ্রান্তিতেও, সেরূপ ভাবেন, তিনি যত বড় ধনী, যত বড় মানী, যত বড় বিদ্বান, যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় হাকিম, যত বড় আমলা, যত বড় তেঁদড়া, যত বড় বেদড়া হউন না কেন, তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো, টুকটুকে হউক, আর রামছাগলের মতো চাপ দাড়িতে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হউক, ঠাস ঠাস করিয়া, দশ বারো জোড়া চড় মারিয়া সেই বে-আদবকে,

চিরকালের জন্য, দুরস্ত করিয়া দিব।...এ যাত্রায় খুড়র কাছে দুই চারিটি প্রশ্ন করিব। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলে, রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইব। যদি উপেক্ষা করিয়া, অথবা ভয় পাইয়া, অথবা কোন নিগূঢ় কারণের বশবর্তী হইয়া, খুড় মহাশয় উত্তর দানে বিমুখ হন, দুও দুও বলিয়া, হাত তালি দিয়া, ইয়ারবর্গ লইয়া, কিয়ৎক্ষণ আনন্দে নৃত্য করিব, পরে রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড়মড় করিয়া খুড়র ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" [৫৪]

এ ভাষা আজকের বিচারেও সংস্কৃতানুসারী বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু প্যারীচাঁদের ভাষা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে, তাঁকে মোটামুটি বিদ্যাসাগরের বিপরীত বলে মনে হবে। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতানুগ ভাষার অনুশীলনে লিপ্ত, তখন অন্তত 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' এই দুটি গ্রন্থে আমরা প্যারীচাঁদকে কথ্যভাষার শিল্পী বলে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর অপর কীর্তি, সমকালীন সমাজজীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা। কিন্তু উভয় ব্যাপারেই প্যারীচাঁদ, আমাদের মতে, তাঁর দাবির অধিক প্রশংসা পেয়েছেন। সত্য বটে, সাময়িকতা তাঁর রচনায় যত সাবলীল ও বলিষ্ঠতার সাথে চিত্রিত, সমসাময়িক অন্য কোনো লেখকে তেমন নয়, অথবা তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে যত বেগবান ও ইডিওমেটিক, অন্যান্যের রচনা তুলনামূলক বিচারে অনেক পিছিয়ে পড়বে, তথাপি কথ্য ভাষার ব্যবহার অথবা তৎকালীন জীবনচিত্রণ বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের পূর্বেও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন[৫৫] এ উভয় কৃতিত্বের আংশিক দাবিদার। তাছাড়া কথ্য বাংলার ব্যবহার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগ থেকেই প্রচলিত, কট্টর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়েও তার নিদর্শন অনুপস্থিত নয়। আর একটি কথাও স্মর্তব্য, 'আলালে' অথবা 'মদ

খাওয়া বড় দায়ে'—হাস্যকর রকমের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্যের নমুনা—এমন কি সংলাপে—অপ্রত্যক্ষ নয়।

"এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না। যদ্যপি ইহার উল্টো কোন শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্রমতে চলা কখনও উচিত নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদ্যপি এমন শাস্ত্রমতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকে না ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চলবিচল হয়। এইরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারে না, এজন্যে শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য।" [৫৬]

—বিদ্যাসাগরের নয়, বর্তমান ভাষা 'আলালে'র অন্যতম চরিত্র বেণীবাবুর। সাধুভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি মাত্র পার্থক্য আছে। বিদ্যাসাগরের ভাষাটি অত্যন্ত ভারসাম্যবিশিষ্ট, ঋজু, প্রাঞ্জল ও সাবলীল, প্যারীচাঁদের ভাষা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত, গতিহীন, শব্দব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে মিষ্টত্ববর্জিত।

প্যারীচাঁদ যত পরিণত হয়েছেন, তাঁর ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য ও আড়ষ্টতা ততোই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সাধুচালের বীজ প্রথম গ্রন্থেই উপ্ত ছিলো। অপর পক্ষে, বিদ্যাসাগর পরিণতির সাথে সাথে ভাষাকে ক্রমশ সহজ হতে সহজতর করেছেন, এমন কি, প্রতি সংস্করণে প্রথম দিকের গ্রন্থগুলির ভাষাও মার্জিত ও সরল করেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। প্রথমদিকে প্যারীচাঁদে সাময়িকতা যদিও বেশ প্রবল ছিলো, কিন্তু শীঘ্র তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য হলো প্রাচীনতা—চিন্তার ক্ষেত্রে, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে, বক্তব্যের ক্ষেত্রে। তাঁর প্রকৃতি তখন অগ্রগতির পরিপন্থী। উল্টোদিকে, বিদ্যাসাগর ছিলেন চলতি হাওয়ার পন্থী।

"যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।......যাঁরা অতীতের জড় বাধা লংঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন,..."[৫৭]

সে কারণে, প্রতিনিয়ত তিনি যুগের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁর রচনাবলীর বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকেও এ কথা প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, দূর ভবিষ্যৎকেও তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, এই জন্যেই ভাষা ও বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তাঁর সংস্কারমুক্ত প্রাগ্রসরতা অনায়াসে লক্ষ্যগোচর হয়।

তবে বিদ্যাসাগর সর্বত্র এই আধুনিকতা প্রদর্শন করেছেন একথা বোধ হয় বলা যায় না অথবা বললে তাঁর সম্পর্কে সম্ভবত অতিশয়োক্তি করা হয়। কেননা সমকালীন সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ে তাঁর আধুনিক মনোভাব যদিচ পরিলক্ষিত হয়; তথাপি তাকে কিছুটা একপেশে না বললে তা অনৃত ভাষণ বলে গণ্য হবে। বিদ্যাসাগর এত আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ ও সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের অসচেতন ছিলেন। এ তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো অসঙ্গতি। তিনি সমাজ ও মানুষের কল্যাণচিন্তায় বিভোর; কিন্তু এ কল্যাণ একান্তভাবে যুক্ত রাজনীতির সঙ্গে, এ ধারণা তাঁর হৃদয়ে একপ্রকার অনুপস্থিত। তদুপরি সমকালীন রাজনীতির গণবিমুখতা এবং বিদেশী সরকারের ব্যাপক শোষণ দেশের অগণিত জনের আর্থিক ও আত্মিক অবস্থাকে প্রতিদিন অবনত করছিলো, এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেছেন, এমন প্রমাণ আমরা পাইনি। এই জন্যেই, তিনি যতই জোড়াতালি

দিয়ে সাধারণ মানুষকে জাগাতে চেষ্টা করুন না কেন, একেবারে তলা ধসে যাওয়া জাহাজকে কিছুতেই ভাসাতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর যখন মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে নৈরাশ্যবাদী হয়ে সমাজের এককোণে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই সময়ে ইংরেজ ও ভারতবাসীর তীব্র জাতিবৈরী সমাজের শান্তিকে বিচলিত করেছে; সংবাদপত্রে স্বাদেশিকতার প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে; সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও জাতীয়তার বলিষ্ঠ বাণী উত্থিত হয়েছে; একে একে হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস স্থাপিত হয়েছে; ইলবার্ট বিলের মতো আলোড়নকারী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর এ সব ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া তিনি মানুষের ও আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত ও মর্মাহত হয়ে তাঁর চিরকালীন সংগ্রামী ভূমিকা বর্জন করে পলায়ন করলেন জীবন থেকে—এগুলো সঠিক প্রগতির স্বাক্ষর নয়। যুদ্ধ শেষে জয় অথবা পরাজয় একটা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু পরাজয়কে মেনে নেওয়া যথার্থ সংগ্রামীর লক্ষণ নয়। দীর্ঘকাল প্রগতিশীল একটি ভূমিকা বিপুল শৌর্যবীর্য নিয়ে পালন করার পর, আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, অনুসারী ও সঙ্গী না পেয়ে, তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় সাঁওতালদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর এ পলায়নী ও মানুষের উপর আস্থাহীন দীন মনোভাব দেখে, তাঁর প্রতি করুণা বোধ করি। এমনকি, এ মানুষী দুর্বলতা দেখে, হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতকে কালের আদালতে ক্ষমা করাও বোধ হয় সম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি সমাজকে ছাড়িয়ে আর একটু প্রসারিত হয়ে দেশ এবং শাসন ও শোষণের দিকে অগ্রসর হলে তাঁকে অতুলনীয় প্রগতিবাদী বলে আখ্যায়িত করা যেতো। দৃষ্টির সেই প্রশস্ততার অভাবে, তিনি শুধু মানবপ্রেমিক ও মানববাদী হয়েই রইলেন, মানুষের মুক্তির সন্ধান দিতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগরের রচনায় রঙ্গব্যঙ্গ

গোলাম মুরশিদ

বড়ো জোর ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী, তৎকালীন বাংলা গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান করার একক কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের, একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। তারপর এখনো পর্যন্ত একশ পঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়নি; কিন্তু সেকালের সঙ্গে আজকার ভাষার যথেষ্ট ব্যবধান রচিত হয়েছে। সে ব্যবধান এমন দুস্তর যে বিদ্যাসাগরকে প্রায় অপরিচিত মানুষ বলেই ভ্রম হয়। তার ভাষার আপাত দৃঢ়তা, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, কমাসেমিকোলন-কণ্টকিত দীর্ঘ বাক্য—সবকিছু সাধারণ কিন্তু অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব রচনা করে, তা শুষ্ককঠিন পাণ্ডিত্যের। বিদ্যার সাগর ছিলেন তিনি এ কথাটাই আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করে এমনকি দয়ার অসংখ্য লিজেণ্ড তাঁর যে করুণাসাগর মূর্তি রচনা করে, সেও যেন কেমন নৈর্ব্যক্তিক; তাঁকে আত্মীয় এবং স্তুতি-নিন্দায়-সর্বদা-কম্পিত রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে করতে কল্পনা শক্তি বাধা পায়। অথচ অত্যন্ত সংবেদনশীল, সকল মানবিক গুণের অধিকারী, এই প্রবল পুরুষের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিজীবন ছিলো। সমকালীন লেখকগণের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি প্রাত্যহিক জীবনে নানা মানুষী দুর্বলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর মুখে অকৃপণ হাস্য এবং নয়নে আন্তরিক অশ্রু বিরল ছিলো না। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর রচিত সাহিত্যেও এই কৌতুক এবং ক্রন্দন প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশেষত বঙ্গদর্শন পরিচালনাকালে, তীব্র

অভাব লক্ষ্য করেছিলেন বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের। লোকরহস্য অথবা কমলাকান্তের দপ্তর এই অভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়। তার আগে, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ভাঁড়ামির কোনো অভাব ছিলো না; কিন্তু বিমল রসিকতা কি কাব্য কি গদ্য কোথাও তেমন প্রকাশ পায়নি। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ যে কৃতিত্ব এককভাবে বঙ্কিমচন্দ্রে আরোপ করেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য। বিদ্যাসাগর উইট-হিউমার ও স্যাটায়ারের যে মান নির্ধারিত করে দেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতা বিশেষভাবে হাস্যরসাত্মক সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ; বিদ্যাসাগরের সকল রচনাই কৌতুক আলোকে উদ্ভাসিত। বিদ্যাসাগর যেখানে মুনিঋষিদের জীবনকাহিনী বর্ণনারত, সেখানেও প্রাচীনকালের সকল অসঙ্গতি তির্যক ব্যঙ্গে অথবা অতিশয়োক্তির মাধ্যমে প্রকটিত। তাঁর রচনা পাঠকালে প্রতিমুহূর্তে পাঠকের অন্তর লঘুরসে সিক্ত হয়ে গুরুভার বিষয় গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র দরদী শিল্পী বটেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ অথবা উপন্যাস কোথাও ভাষার প্রতিপদে কৌতুকের এই সহজ দীপ্তি ও প্রাচুর্য নেই; তিনি প্রায় সর্বত্রই সিআরিআস। অপর পক্ষে যুগের তুলনায় প্রাগ্রসর বিদ্যাসাগর প্রাচীন জীবনধারার রূপায়ণ করেছেন অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার নিমিত্তে নয়, বরং অতীতের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির দিককে বর্তমান পাঠকের সামনে হাজির করে, বর্তমানের অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্যে। উপহাস এবং ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে অতীতকে উপস্থাপনার প্রয়াস বিদ্যাসাগরের ভাষাকে একটা সামগ্রিক কৌতুকদীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এদিক দিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় আধুনিক ও প্রগতিশীল। উইট এবং হিউমার ব্যতীত স্যাটায়ারের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। স্যাটায়ারের ব্যবহারে তিনি যে নৈপুণ্য ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার কোনো তুলনা চলতে পারে না; কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কদাচিৎ এর

ব্যবহার করেছেন, কোথাও সে চেষ্টা থাকলে বিদ্যাসাগরের তুলনায় তা পানসে।

রেনেসাঁর যুগে য়ুরোপে এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যে মানবমুখিন চিন্তার সূত্রপাত হয় তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যাসাগরে প্রোজ্জ্বলরূপে অঙ্গীকৃত, সমালোচকগণ নানাভাবে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের যে স্বাক্ষর বিধৃত, তাতে প্রায়শ গোষ্ঠী অথবা জাতির প্রচলিত ভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাসের প্রকাশ ঘটে, ব্যক্তির নিজস্ব দেখবার চোখ ও বলবার ভাষা সেখানে বহুলাংশে অনুপস্থিত। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিনির্ভর শ্লেষবিদ্রূপ ও কৌতুকহাস্যের প্রাচুর্য। বিদ্যাসাগরের রঙ্গব্যঙ্গে আধুনিকতার এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। যিনি প্রতিপদে আপন বিপ্রতীপ প্রতিবেশের অসঙ্গতিদৃষ্টে সোচ্চার এবং বিরোধিতায় উচ্চকিত, তিনি পদে পদে তাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর সে সমাজের সংস্কার ও শিক্ষার জন্যে যে-প্রাচীন যুগ ও জীবনকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত করার প্রয়াসী, তার অসঙ্গতি তিনি পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করবেন, তা বলা বাহুল্য।

হারুন্নুর রশিদের মতো রাজা বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে বহু লিজেণ্ড প্রচলিত আছে। বেতালপঞ্চবিংশতি এমনি একগুচ্ছ সরেস গল্প। এ গল্পের পশ্চাতে ধর্মীয় কোনো মহৎ প্রেরণা নেই, একান্ত মানবিক রস এদের উপজীব্য। বিদ্যাসাগর, সুতরাং, এটিকে পছন্দ করলেন। তিনি অনুবাদ বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিতেন, প্রায়শ তা অনুবাদ কর্মটিকে মৌলিক সৃষ্টির তীরে উত্তীর্ণ করতো। বেতালপঞ্চবিংশতিতে বিদ্যাসাগর এমন জীবনধারা চিত্রিত করলেন যা অপূর্ব নির্ভেজাল মানবিকরসে পরিপূর্ণ। যা পাঠে সমসাময়িক পাঠকের সাহিত্যরুচি বিকশিত হয়ে উঠবে, অতীতের জীবনধারাসম্পর্কে সকল মোহ ও মিথ্যা ধারণাকে যে ধূলিসাৎ করে দেবে। এমনকি, মুনিঋষিদের এবং রাজরাজড়ার মানবিক

দুর্বলতা, প্রাচীন প্রেমের হাস্যকরতা এবং প্রাচীন সমাজের অত্যন্ত সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধ পরিস্ফুট করে মুক্তচিন্তার জন্ম দিতে চাইলেন বিদ্যাসাগর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 'বেতালের' কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে উইট, হিউমার ও স্যাটায়ারের অপর্যাপ্ত মিশ্রণ দিয়েছেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে। ভোগবতী নগরের রাজা চন্দ্রভানু বৃক্ষে লম্বমান, অধঃশিরাঃ, ধূমপানরত এক তপস্বীকে দেখে কৌতুক বোধ করলেন। তার ধ্যান ভাঙাতে পাঠালেন এক বারবণিতাকে। বারবণিতা মোহনভোগ প্রস্তুত করে তপস্বীর আস্যে অর্পণ করে ধীরে ধীরে তাকে সবল ও সুস্থ করে তুললো। সম্মুখে সুন্দরী রমণীকে দেখে তপস্বী বললেন, 'তোমার মধুর মূর্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি।' চরিতার্থ আত্মা ক্রমে রূপজীবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, গৃহী হয়ে ফিরলেন নগরে। বিদ্যাসাগরের বর্ণনার অতিশয়োক্তি ও 'আত্মা চরিতার্থ' হওয়ার মতো তির্যক ব্যঙ্গ অট্টহাস্যের উদ্রেক করে না বটে, কিন্তু স্মিতহাস্যে পাঠকের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

ভারী সুন্দর এক অরণ্যের মধ্যে এক রাজপুত্র এবং এক রাজকন্যার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই উভয়ের অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত হলো। একান্ত রূপমুগ্ধ রাজপুত্র বন্ধুকে তার সংকল্প জানালো : 'প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব।' তার প্রতিটি আচরণে যে 'আদিখ্যেতা' প্রকাশ পেয়েছে তা-ই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে কৌতুকপ্রদ করে তুলেছে। উভয়ের যখন পরিশেষে মিলন হলো, সে দৃশ্যটিও কৌতুক-রসমণ্ডিত : 'নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে, উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। ···রাজকুমার কহিলেন, তোমার বদনসুধাকর সন্দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশ স্বীকারে প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ, তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্ত ধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও;

আমি তোমার সেবাদ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। ...কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী, সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্যবিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর, উভয়ের সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব দেখিয়া, সহচরীগণ কার্যান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে, কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনী যাপন করিলেন।' এ বর্ণনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌতুকহাস্যে উদ্ভাসিত।

দুর্বৃত্ত স্বামী কর্তৃক সুশীলা স্ত্রী কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার ক্রন্দন শুনে এক পথিক কূপের ভেতর এই সুন্দরী রমণীকে দেখতে পায়। 'পথিক দর্শন মাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরম যত্নে, সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিল'। পথিকের ব্যাকুলতা এবং 'পরম যত্ন' ও 'স্ত্রীরত্ন' শব্দদ্বয়ের অনুপ্রাস নিঃসন্দেহে কৌতুককর এবং ইঙ্গিতাবহ।

অথবা জয়শ্রী নামক সেই স্বৈরিণীর প্রেম ও তার পরিণতি সমান কৌতুকের। প্রোষিতভর্তৃকা একদা গবাক্ষপথ দিয়ে রাজপথ নিরীক্ষণ করছিল। 'দৈবযোগে, ঐ সময়ে, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ অতি-মনোহর বেশে, ঐ পথে গমন করিতেছিল।, ঘটনাক্রমে, তাহার ও জয়শ্রীয় চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে, উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ আপন সখীকে কহিল, দেখ যেরূপে পার, ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও'। 'হৃদয়চোর' শব্দটি এবং বর্ণনার ভঙ্গিটি ছোটো হলেও, এক নির্মল হাস্যে পাঠকের অন্তর আলোকিত না হয়ে পারে না। যাহোক, উভয়ের নিয়মিত সংগম হতে থাকলো। একদিন প্রেমিকটি শয্যার পর সর্পদষ্ট হয়ে মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। জয়শ্রী স্বামীর আগমনহেতু বিলম্বে এসে প্রেমিকের মান ভাঙাতে সাধ্যসাধনায় ব্যস্ত। 'চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সহাস্য আস্যে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল।' বর্ণনার বিষয়, ভঙ্গি এবং শব্দসমূহের অনুপ্রাস সবকিছু মিলে বিদ্যাসাগরের অপূর্ব হিউমারের পরিচয় দান করে।

বেতালের মতো 'শকুন্তলা'য়ও বাকবৈদগ্ধ্য ও কৌতুকহাস্যের শৈল্পিক প্রয়োগ লক্ষগোচর হয়। রূপ-ও কামমুগ্ধ নরনারীর আচরণ ও আলাপন অস্বাভাবিক বলেই প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে তা বোধহয় কৌতুকের সৃষ্টি না করে পারে না। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম দিকের পরিচয় তাই সঙ্গতভাবেই কৌতুকরসাচ্ছন্ন। এমনকি, তার পূর্বে সুন্দরী শকুন্তলার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাও কৌতুকদীপ্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভ্রমরাক্রান্ত শকুন্তলার চিত্রটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"এক মধুকর মাধবীলতায় অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেচ করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিতকুসুমভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করসঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর কোনওমতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ্! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে! সখি! পরিত্রাণ কর।"

এই দৃশ্যে দুর্বৃত্ত মধুকরকে নিবৃত্ত হতে না দেখে যে অকারণ বিহ্বলতা ও উৎকণ্ঠা এবং সেই সঙ্গে একটি অপূর্ব সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠকদের সহজেই স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত করে।

'ভ্রান্তিবিলাস' সম্বন্ধে বক্তব্য বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, শেক্স-পীয়রের বহু প্রসিদ্ধ নাটক অপেক্ষা এটি নিকৃষ্ট, তথাপি তিনি এ নাটকটি নির্বাচন করেছিলেন এর অতুলনীয় কৌতুকহাস্যের দ্বারা বাঙালি পাঠক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করতে। এই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে এবং অনুবাদ-কর্মে মৌলিকত্বের ছাপ রেখে তিনি তাঁর রসিক অন্তরের পরিচয়কেই আরো দৃঢ় করেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই হাস্যরসসম্পৃক্ত, সুতরাং অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা বাহুল্যমাত্র। তবে উল্লেখ করা আবশ্যক, বর্জন ও

গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটিকে বিদ্যাসাগর ঐকান্তিকভাবে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে তুলেছিলেন।

সমালোচকের মতে যে ব্যঙ্গকৌতুক লেখক আপনাকে লক্ষ্য করে বর্ষণ করেন, তা-ই নাকি শ্রেষ্ঠতম। এই দিক দিয়ে বিদ্যাসাগরকে যথার্থ উচ্চস্থান দিতে হয়। আত্মজীবনী এবং বেনামি রচনাগুলোয় তিনি যেভাবে আপনাকে নিয়ে রসিকতা করেছেন তার সূক্ষ্মতা ও ঔদার্য পাঠককে অবশ্যই চমৎকৃত করে। আপন জন্মকাহিনী বিবৃত করে বিদ্যাসাগর আপনাকে এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে যেরূপ তুলনা করেছিলেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তা উল্লেখযোগ্য রঙ্গ বলে সুপরিচিত। আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখেছেন,

> "আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, ওদিক নয়, এদিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।"

বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ যেমন রসিক ছিলেন তেমনি স্পষ্টবাদী বলেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। তীব্র শ্লেষবিদ্রূপের মাধ্যমে তাঁর এই স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পেতো। দরিদ্র ও সহায়হীন এই ব্রাহ্মণ একদিন একস্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যেতে নিষেধ করলেন। তর্কভূষণ প্রশ্ন করলেন, "দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐস্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ

করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না ; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই সে গ্রামে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।" উত্তরাধিকারসূত্রে বিদ্যাসাগর এই রসিকতা ও শ্লেষবিদ্রূপ করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। 'কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে তাঁর রচিত বেনামি বিতর্কমূলক রচনাগুলোয় তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে প্রতিপক্ষ প্রতিপদে বিদ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়েছে। শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করে তিনি বিরুদ্ধ দলকে কাবু করেছেন সে কৃতিত্ব পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ; কিন্তু ছোটো ছোটো গল্প ফেঁদে, রঙ্গব্যঙ্গের বাত্যাঘাতে তিনি যেভাবে বাচস্পতি ও বিদ্যারত্নদের ধূলিসাৎ করেছেন তাতে পরাজিত পক্ষের জন্যে দরদী পাঠকের সমবেদনা উদ্রিক্ত না হয়ে পারে না। ব্যঙ্গবিদ্রূপের যে চাবুক ঈশ্বরচন্দ্র ব্যবহার করেছেন, তরবারির মতো তা রক্তপাত ঘটিয়েছে। কখনো ভাষার ভুল দেখিয়ে, কখনো শাস্ত্রবাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে, কখনো প্রতিপক্ষের অসচ্চরিত্রের উল্লেখ করে, কখনো তাদের আচরণের অসঙ্গতির উদ্ধার করে সহজ, প্রকাশক্ষম স্পষ্টভাষায় তিনি ক্ষণে ক্ষণে বিধবাবিবাহবিরোধী এবং বাল্য- ও বহুবিবাহ সমর্থক পণ্ডিতদের নাজেহাল করেছেন। আপন পরিচয়কে গোপন রাখার জন্যে পুনরায় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তিনি বিমল কৌতুকে মত্ত হয়েছেন।

> "ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাগাগরের লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা এক কথায়, সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি। একগণ্ডা একমাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি, ভুতি বিদ্‌কুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায়, তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় কত, তাহা সকলে, স্ব স্ব প্রতিভাবলে, অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।··· এবার আমি চতুর, চালাক, বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দ্বারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা

করাইব।...যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি, 'না বিইয়া কানাইয়ার মা' হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জন্তু নহেন।"

নিজের প্রতি কৌতুকের চেয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি যে নির্দয় ব্যঙ্গ করেছেন তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক।

'বেহুদা পণ্ডিত' ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণে উদ্‌যোগী হলে বিদ্যাসাগর এ জাতীয় পণ্ডিতদের চরিত্রবিষয়ে সম্যক বোঝানোর উদ্দেশ্যে এক শিরোমণির গল্প ফেঁদেছেন। স্ত্রীজাতির ব্যভিচার সম্বন্ধে একদিন শিরোমণি বলেন, যেমন পৃথিবীতে উপপতিকে গাঢ় আলিঙ্গনে ধারণ করতো এই স্বৈরিণীরা তেমনি পরলোকে এক লৌহময় শাল্মলিবৃক্ষকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হবে! সেদিন রাতে শিরোমণির এক সেবাদাসী আর পূর্বেকার মতো সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে শয্যাগ্রহণে এলো না। তখন শিরোমণি, 'বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য হইয়া তাহার নামগ্রহণপূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।' উত্তরে সেবাদাসী জানালো, শিমুলগাছের উপাখ্যান শুনে আর অধিক সেবা করার সাহস তার নেই, বরং অতীতের পাপের মোচন কিসে হবে সেই দুশ্চিন্তায় সে ব্যাকুল। "সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্ত ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি! তুমি সেই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ পূর্বে যেরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে ; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন আলিঙ্গন করিলে সর্বশরীর শীতল ও পুলকিত হয়।' এই বলিয়া অভয় প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাহাকে, পূর্ববত চরণ সেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।"

আলোচ্য ব্রজনাথকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের আরো একটি বিদ্রূপ

বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আপনাকে বামুন রূপে এবং ব্রজনাথকে নদিয়ার চাঁদরূপে তুলনা করে অতঃপর বিদ্যাসাগরের মন্তব্য, ইতিপূর্বে শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ উপাধি দিয়েছে। "কিন্তু এ পর্যন্ত, এক সময়ে, দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই দুজনের নদীয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে, একজন একেবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভালো দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে, দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভালো দেখায় না। এজন্য, আমার বিবেচনায়, সমাংশ করিয়া, দুজনকেই, এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত।"

এবারে শ্লেষবিদ্রূপের যে দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত হচ্ছে, পাঠমাত্র তার তীব্রতা, প্রত্যক্ষতা, হাস্যোৎপাদনক্ষমতা ও নির্দয়তা সহজেই বোধগম্য হবে।

> "তিনি (খুড়) যে 'ভাইপোস্য' এই অশুদ্ধ প্রয়োগ দর্শাইয়া, প্রয়োগকর্তাকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তদীয় অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির সবিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল !!! এই পৃথিবীতে, অনেকের বুদ্ধি আছে: কিন্তু, খুড়র মতো খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদবালাই লইয়া, এই দণ্ডে মরিয়া যাই; খুড় আমার অজর, অমর হইয়া, চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম, টোকো ও পোকাখেকো।"

খুড়র কলম করার যে প্রস্তাব বিদ্যাসাগর করেছেন অর্থ ও ভঙ্গি উভয় দিক দিয়েই তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

প্রতিপক্ষকে অট্টহাস্যের সঙ্গে এরূপ সরাসরি প্রবল আঘাতে ধরাশায়ী করার নজির বেনামি রচনাগুলোয় এতো বেশি যে দু-একটি উদ্ধৃতি

অথবা উল্লেখের দ্বারা তা বোঝানো অসম্ভব। কেবল বলা চলে বিদ্যাসাগর দুহাতে নয় বরং যেন দশ হাতে নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দয়ভাবে একই সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর মতে তাঁর এ আক্রমণের ভাষাও টাট্টু ঘোড়ার মতো হাল্কা চালে ছুটে চলেছে। একান্ত প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী ভাষা এই আক্রমণকে প্রচণ্ড করে তুলেছে। পণ্ডিতদের দল স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কেবলমাত্র যোদ্ধার নয়; উপরন্তু অপরকে পরাজিত করার কালে সাধারণ পাঠকের প্রচুর হাসির খোরাক জোগাড় করেছেন তিনি। পাঠকের প্রবল হাস্যের মধ্যে শোচনীয় ও মর্মান্তিক মৃত্যু নিঃসন্দেহে কিছু হৃদয়হীন; কিন্তু স্যাটায়ারের ধর্মই তাই। রামজয় তর্কভূষণের যে শ্লেষভাষণ আমরা শুনতে পাইনি, তাঁর পৌত্রের হাত দিয়ে তা-ই আরো বিদগ্ধ ও পরিশীলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। আর বিদ্যাসাগরের উইট-হিউমারের সূক্ষ্মতা ও প্রাচুর্য তুলিত হতে পারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাথে।

ছো ট দে র জ ন্যে

সনৎকুমার সাহা

শিশুদের পাঠ্যবই যে ঠিক কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশে দ্বিধা জাগে, উদ্দেশ্য কি শুধুই ভাষা শেখানো, না কি আরো কিছু ? কেবলমাত্র শব্দপরিচয়, বাক্যের ব্যাকরণ শুদ্ধি ও প্রকাশ লালিত্য যদি শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে পাঠক্রম হয়ে পড়ে মূলত বিষয়-অনপেক্ষ ; অপরদিকে ভাষাকে অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ জগতের বস্তু প্রপঞ্চে আগ্রহ জাগানো যদি পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্যসীমায় ধরা পড়ে, তবে শুধু মনোহারিত্বেই আর তার সার্থকতার পরাকাষ্ঠা মেলে না। পরিপার্শ্ববিষয়ে শিশুর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলার অথবা সহজাত অনুসন্ধিৎসাকে সযত্নে লালন করার দায়িত্ব তখন তার ওপর অনিবার্যভাবে বর্তায়। এই পরিপার্শ্ব স্থান, কাল ও অবস্থা নির্ভর। বিষয়ের রূপান্তর বিষয়ীর মানসভূমিকে বিচলিত করে। তাকে অবিকল রাখবার বাসনা অবশ্যই এক অনুচিত নির্বুদ্ধিতা। অতীতের ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বস্তুজগতের রূপ ও আনুষঙ্গিক মূল্যবোধ আমাদের ঐতিহ্যে নিশ্চিতভাবে উপস্থিত ; কিন্তু অনিশ্চিত বর্তমানে তাদের তুমুল অবস্থান অনেক সময়ে অহেতুক বিভ্রান্তিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় লেখক এইসব সমস্যায় ভাবিত হবেন কি না, তা এক বিতর্কের বিষয়। আর বিতর্কের বিষয় বলেই তাকে সহজে এড়ানো যায় না।

'বর্ণপরিচয়ে' আমরা কি পাই ? অ-তে অজগর, আ-তে আনারস··· চিত্রসহযোগে এইভাবে সব স্বরবর্ণের ও ক-এ কুকুর, খ-এ খরগোশ, এইভাবে সব ব্যঞ্জনবর্ণের আকৃতির পরিচয় দিয়ে প্রথম ভাগের শুরু।

তারপরে বর্ণযোজনা : অজ, আম, ইট, ঈশ, উট, ঋণ, এক, ওল···কর, খল, ঝড়, তল, নয়, পথ, রস, শঠ···অচল, অধম, আলয়, আসন···ধবল, নয়ন, লবণ, বসন ইত্যাদি ; আকার যোগ, যেমন, যাই, ভাই, চাই, পাই, ঝাউ, লাউ, খাও, দাও···মমতা, গণনা, অথবা, ভরসা, বাগান, বাদাম, রাখাল, বাতাস···, এই ভাবে অসংযুক্ত বর্ণে পর পর সব ক'টি স্বরবর্ণের সংযোগে শব্দ গঠনের নমুনা : চিল, ডিম,···অতিথি, নিয়তি,···কীট, গীত,···ভগিনী, রজনী···, দুই, কুল, পুতুল, মুকুল ; কূপ, চূণ,···নূতন, অদূর ;···কৃশ, গৃহ,···বৃহৎ, আবৃত ;···কেশ, তেজ,···কয়েক, আবেগ ; জৈন, তৈল···জনৈক, অবৈধ ; কোণ, গোপ,···আমোদ, আলোক ; গৌর, তৌল, কৌশল, যৌবন ইত্যাদি। মিশ্র উদাহরণ : যেমন, একাকী, পৃথিবী, অনুপায়, আলোচনা, পরিবেশন, নিরভিমান। অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগে গঠিত শব্দ : অংশ, বংশ,···সংসার, সংহার,···দুঃখ, দুঃসহ, দুঃশীল, নিঃশেষ, চাঁদ, ফাঁদ, চাঁপা, সিঁদুর ইত্যাদি। গু, রু, শু, হু, রূ ও হৃ, এই আকৃতিগুলির পরিচয় মেলে অতঃপর। যেমন, আগুন, অরুণ, করুণা, কিংশুক, বাহু, রূপ, হৃদয়···। এর পরেই বর্ণপরিচয়ের বিখ্যাত পাঠগুলির অবতারণা : বড় গাছ। ভাল জল। পথ ছাড়। জল খাও।···জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।··· নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী। কাল পাথর। সাদা কাপড়।···জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।···আমি যাইব। সে আসিবে। তিনি গিয়াছেন।···মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে। যাদব এখনও শুইয়া আছে। রাখাল সারাদিন খেলা করে, ইত্যাদি। সব শেষে বিদ্যাসাগরের দুই অমর সৃষ্টি গোপাল ও রাখালের কাহিনী। (বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিপরীতধর্মী দুই প্রবণতার কাহিনী কি ?)

"গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায়, তাই পরে···গোপাল যখন পড়িতে

যায় পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়। পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরুমহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে। খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে।···সে একদিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।···"

অপরদিকে, রাখাল "বাপ মা'র কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে; সারাদিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে।··· সে পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, একবারও পড়ে না।··· খেলিবার ছুটি হইলে রাখাল বড় খুসী, খেলিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে;···ছুটি হইলে বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না; কোনও দিন, পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন, পথে হারাইয়া আইসে;···রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না।"

স্পষ্টই লক্ষণীয়, বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতও পাঠকের সামনে উপস্থিত। এই উপস্থিতিতে এতটুকু আতিশয্য নেই। বস্তুসমূহের লেখচিত্র অপরিসীম তন্নিষ্ঠায় রচিত। ব্যক্তি অনুভূতির অনর্গল প্রকাশ প্রশ্রয় পায় না এতটুকু। অবশ্য বর্ণপরিচয়ের মূল লক্ষ্য থেকে লেখক বিচ্যুত নন। বাঙলা শব্দের বর্ণসংযোগ ও উচ্চারণে প্রায়শই One-one correspondence বর্তমান, এবং উচ্চারণ অর্থবেধী। তাই বর্ণসংযোগের পথ ধরে পাঠক্রম সাজানো মোটেই

অযৌক্তিক মনে হয় না। লেখকের সচেতন, বৈজ্ঞানিক মন এর পশ্চাতে অবশ্যই ক্রিয়াশীল।

এখন প্রশ্ন হলো, মনোহারিত্ব যদি শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের সর্বপ্রধান গুণ হয়, তবে এই মানদণ্ডে বর্ণপরিচয় কতটা সার্থক? যে গুণটি এই বই-এর ক্ষেত্রে সহজেই চোখে পড়ে, তা হলো রচনায় সর্বত্র একটি ঋজু ভাব। এই সঙ্গে রয়েছে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ও পরিচ্ছন্নতা। প্রতিটি পদ ও প্রতিটি বাক্য যেন গণিতের এক একটি প্রতিজ্ঞা। খণ্ড খণ্ড বাস্তবচিত্রকে তারা নিরাবেগে তুলে ধরে। তাদের অস্তিত্ব সর্বস্বতায় বাড়তি অলংকরণের ভেজাল মেশে না। একথা হয়ত বলা চলে, বর্ণপরিচয় পাঠককে মুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত নয়। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের কানে ধরা পড়তে পারে প্রথম কবিতার ছন্দোময় পদধ্বনি। অনুরূপভাবে আইনস্টাইনের সমীকরণও কোন পাঠকের মনে জাগাতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক চেতনা। উভয় ক্ষেত্রেই আধার আধেয়তে গুণারোপ করে, যদিও আধেয় অনন্যনির্ভর অবস্থায় শুধু নির্গুণ অস্তিত্বে বর্তমান। বর্ণপরিচয়ের পাঠক্রমের বিচারে তাই ভাবের আতিশয্য না দেখাই ভাল। তাতে সৌন্দর্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা ভাবগত নয়, বুদ্ধিগত। মনভোলানোর চেষ্টা সেখানে নেহাতই অবান্তর। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ অনেক বেশি পেলব। বর্ণপরিচয়ের সুশৃংখল বর্ণবিন্যাস এখানে প্রায় অনুপস্থিত। চিত্রসহযোগে অক্ষর পরিচয় এ বইতে উদ্দেশ্যমূলক মনে হয় না। 'ছোট খোকা বলে অ আ/শেখেনি সে কথা কওয়া'—মিল ও ধ্বনির ব্যঞ্জনায় হয়ত এ জাতীয় প্রয়াসে পাঠক সহজেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির আকৃতি ও উচ্চারণ শেখাবার মনোভাবটা এতে সঠিকভাবে ধরা পড়ে না। সহজপাঠে ছড়ার আকর্ষণ অক্ষর পরিচয়ের মূল লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। বর্ণসংযোগের ব্যাপারেও সহজপাঠ প্রথম ভাগ বড় এলোমেলো। আ-কার, ই-কার ইত্যাদি সব

স্বরসংযোগ একত্রে প্রথম পাঠে এসে হাজির। এ জাতীয় সব ক'টি পাঠেরই অপূর্ব চিত্রময়তা নিঃসন্দেহে এ বইয়ের এক বিরল সম্পদ! ক্ষুদে পাঠকদের আকর্ষণ করায় তারা হয়ত অনেক বেশি সফল। কিন্তু শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে যাদুকরী মায়া কি নিরঞ্জন তন্নিষ্ঠার চেয়ে অধিক বেশি কাম্য? ভাষা মনোমোহিনী হতে চাইলে অনেক সময়েই ভাবের মিশ্রণ, রূপান্তর ও অস্পষ্টতা এড়াতে পারে না। শিশুদের মনোগঠনে ভাবের এ জাতীয় এ্যালকেমি যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর কি না, তা নিরূপণ করা প্রয়োজন। কল্পনাবিলাসে প্রশ্রয় দিলে শিশুমন যদি উধাও হতে চায়, তবে সেটা তার বুদ্ধির চর্চায় নিবিষ্ট হবার শিক্ষাকে অনেক সময়ে বিপর্যস্ত করে। পাঠ্যপুস্তক কি শিশুদের শুধু ভাষাশিল্পী করেই গড়ে তুলতে চাইবে? না কি তাদের ভেতরে বস্তুজগতে সত্যের অন্বেষণের প্রবণতা জাগানোও তার দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে?

ক্ষুদে পাঠকের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করা ও তার কোন স্পৃহাকে জাগ্রত করা হয়ত বর্ণপরিচয়ের লক্ষ্যসীমায় অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছুনো কি পুরোপুরি তার সাধ্যে কুলোয়? বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগে যে অভিজ্ঞতার জগৎ বারংবার রচিত, তা বড় সংকীর্ণ। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে মানুষের আহার, বিহার ও অভিলাষের বৃত্ত যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। জীবনের পদক্ষেপ সেখানে নিশ্চিন্ত ও ধীর; অস্থিরতা ও উত্তেজনা বাস্তব পরিস্থিতিতে যেন অহেতুক ও বেমানান। এই সমাজনির্ভর বস্তুরাশিই বর্ণপরিচয়ের পাতায় পাতায় স্থান করে নেয়। বৃত্ত ছাড়ানোর কোন প্রচণ্ড তাগিদ তেমন করে ধরা পড়ে না। দূরে, কাছে, নীচে, ওপরে, সামনে, পেছনে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে শিশুর দৃষ্টিকে প্রসারিত ও তীক্ষ্ণ করবার কোন সচেতন প্রয়াসও সেখানে চোখে পড়ে না। হয়ত তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশে ওইটেই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ যুগের কোন পাঠককে তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলায় তার অবদান নিতান্তই ক্ষীণ।

উড়োজাহাজ, বেতার, স্টীমার, টেলিফোন, দূরবীণ, মোটরকার, ক্রেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শব্দ আজকের মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বারে বারে হানা দেয়। জীবনে গতি ও অস্থিরতার ধারণাকে তারা স্পষ্টতর করে তোলে। পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ সম্পর্কে শিশুপাঠকের কৌতূহল জাগানো যদি অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তবে এ জাতীয় শব্দের অনুপস্থিতি আজ যে কোন পাঠ্যপুস্তককে অসম্পূর্ণ ও প্রায় অকেজো করে রাখবে। বর্ণপরিচয়ও হয়ত এ কারণে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। দোষ অবশ্য বর্ণপরিচয়ের নয়। তার রচনাকালে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহারের গতানুগতিক ব্যবস্থায় তার অন্যরকম হওয়া বোধহয় সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় যদি তা যথেষ্ট খাপ না খায়, তবে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের পটভূমিও প্রধানত প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ। মনোহারিত্ব একমাত্র উদ্দেশ্য না হলে সহজপাঠের দিনও যে বিগত, তা মেনে নিতে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য গ্রন্থে প্রচলিত ছড়া বা ছড়াজাতীয় রচনা একেবারেই নেই। এটা ভাল, না মন্দ? খেয়ালখুশি অসম্ভবের যে বর্ণাঢ্য জগৎ ছড়ায় ছড়ায় তুমুল আনন্দ জাগায়, শিশুপাঠক অথবা শিশু শ্রোতার কাছে তা হয়ত প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। ছড়ার পরাবস্তুবাদী যাদুকরী মায়া শিশুমনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে; তার মানস-প্রবণতার সঙ্গেও বোধহয় ঠিক ঠিক খাপ খায়। কিন্তু শুধু এই কারণেই কি তাদের শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই পাওয়া উচিত? শিশুমনে অদ্ভুত ও অবাস্তবের মোহ জাগিয়ে রাখাই কি পাঠ্যপুস্তকের দায়িত্ব? না কি সে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের রূপের সঙ্গে ঠিক ঠিক পরিচিত করে দেবে? সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়টিকেই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বলে মেনেছিলেন। এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর বোধোদয় বইটি। কল্পনাবিলাস ও অতিকথনকে এতটুকু প্রশ্রয় না দিয়ে পদার্থ, ধাতু,

সমাজ, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠককে অবহিত করতে চাওয়া হয়েছে এ বইতে। ওই সব বস্তু ও কর্মের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে মানুষের যোগাযোগ অনিবার্য। তাদের সঙ্গে পরিচিত করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই মনে হয়, 'বোধোদয়' রচিত। আপন যুগের মানুষের কাজের সীমায় অবস্থান করে বিদ্যাসাগরের এ বই লেখা নিঃসন্দেহে সার্থক। এ কালের কাজের সঙ্গে মিল রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর এ জাতীয় বই আজকের পাঠককেও যথেষ্ট শিক্ষিত করে তুলবে।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সকল কর্মেই প্রেরণা জোগায় তাঁর সমাজ-সচেতনতা। তাঁর সমাজ-সংস্কারে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর অন্য দুই পুস্তক 'কথামালা' ও 'আখ্যানমঞ্জরী'তেও এই সমাজসচেতনতার ছাপ নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সবের ভেতরে একটা হেঁয়ালির মত মনে হয় 'বর্ণপরিচয়'—দ্বিতীয় ভাগ। বই-এর বিজ্ঞাপনে তিনি লিখছেন, "সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষকমহাশয়রা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।…" বস্তুজগতকে উপেক্ষা করে এ বইতে শব্দের শুধু শব্দময়তাকেই যেন মূল্যবান মনে করা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, এ ধরনের প্রস্তাব করছেন, আর কেউ নন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর। হয়ত সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সমাজসচেতন বিদ্যাসাগরকে কিছুক্ষণের জন্যেও মোহাচ্ছন্ন করে থাকবে। তারই ফল 'বর্ণপরিচয়'—দ্বিতীয় ভাগ। অর্থহীনভাবে বর্ণবিভাগ শিখে ও তার ধ্বনিঝংকারে মুগ্ধ থেকে কোন্ জিজ্ঞাসু পাঠক কী পরমার্থ লাভ করবে, তা বুঝে ওঠা শক্ত। তবে শব্দব্রহ্মে আস্থাবান দেহাত্মবাদী যে কবিকুল ইদানীং শব্দশরীরে সার্থকতা খোঁজেন তাঁরা দ্বিতীয় ভাগের বিদ্যাসাগরকে গুরু মানতে পারেন অবশ্যই।

দ্বিতীয় ভাগের কতিপয় পাঠের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও মনে প্রশ্ন জাগে। একটি বিষয়ের বারংবার উল্লেখ ঘটেছে। তা হলো, লেখা-পড়া শেখার উপকারিতা। "অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়। লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চিরকাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।"—এ জাতীয় বাক্য বা বাক্যসমূহ এ বইতে একাধিকবার ঘুরে ঘুরে আসে। 'যাহারা মন দিয়া লেখাপড়া শিখে তাহারা চিরকাল সুখে থাকে'—বলে বিদ্যাসাগর ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন? সুখে থাকবার কারণ কি ভাবমার্গে আত্মিক উন্নতি, না ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য? ভাবমার্গে প্রস্থান বিদ্যাসাগরের কাছে যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় ছিল, এমন কথা মেনে নিতে কুণ্ঠা জাগে। ব্যবহারিক জীবনে সাফল্যকেই বোধহয় তিনি সুখের চাবিকাঠি বলে মনে করেছেন। বিদ্যাকে বাণিজ্যের উপকরণ করে ধনোপার্জনের সম্ভাবনার কথা ভাবাও অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে সাফল্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ত বিদ্যাসাগর নিজেই।

বিদ্যাসাগরের অনুসরণে এ দেশে বিদ্যার বেসাতি করতে নেমেছেন অনেকেই। তবে এক অক্ষম, অপদার্থ ও বিকলাঙ্গ ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এ প্রয়াসের ফল শুভ হতে পারে না। অন্য বিষয় ছেড়ে দিলেও শিক্ষা ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বই "ধরিয়ে দেবার" নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা বিদ্যাসাগরের প্রকাশন ব্যবসায়ে উৎসাহকে যেন বিদ্রূপ করে। 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র পথ ধরে অসংখ্য সহায়কগ্রন্থ আজ শিক্ষার মূল আদর্শকেই ভেংচি কাটে। বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্যাসাগর ছোটদের জন্যে পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তাঁর আদর্শনিষ্ঠায় কোন ফাঁকি ছিলো না। আজ বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরীদের হাতে শিশুপাঠ্য বই এক রুগ্‌ণ বাজারে অস্বাস্থ্যকর পণ্যে পরিণত হয়েছে।

বি দ্যা সা গ র-ব র্ষ প ঞ্জী

১৮২০ খৃস্টাব্দ :

মেদিনীপুর জিলার (তৎকালে হুগলী) বীরসিংহ গ্রামে ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার (১২ই আশ্বিন, ১২২৭ বঙ্গাব্দ) দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বৃষ রাশিতে বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২৫ :

বালক ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামস্থ পাঠশালায় প্রেরিত হন।

১৮২৬ :

ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮২৮ :

রামমোহন কর্তৃক 'আত্মীয়সভা' স্থাপন।

১৮২৯ :

সতীদাহপ্রথা লোপ।

বিদ্যাসাগর কলকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন।

১৮৩০ :

রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা 'ধর্মসভা' স্থাপন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষকদের অনেকেই 'গুড়ুম সভা' বলে পরিচিত এই সভার সদস্য ছিলেন। রামমোহন রায় বিলেত যাত্রা করেন।

১৮৩১ :

ডিরোজিও রক্ষণশীল হিন্দু সদস্যদের চক্রান্তে হিন্দু কলেজ থেকে অপসৃত। কিন্তু তার পূর্বেই ইয়ংবেঙ্গল দল রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু করেন।

ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র 'এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রকাশ লাভ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ পত্রিকাদ্বয়ে কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা। আট থেকে ৬২ বার বিবাহ করেছেন এমন একদল কুলীনের তালিকা এতে প্রকাশিত হয়। বিধবাবিবাহের পক্ষে এ পত্রিকাদ্বয়ে আলোচনা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৩৩ :

রামমোহন রায়ের মৃত্যু।

১৮৩৪ :

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীতে উন্নীত।

১৮৩৫ :

ঈশ্বরচন্দ্রের দিনময়ী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।

ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

১৮৩৬ :

ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তশ্রেণীতে উন্নীত হন।

১৮৩৭ :

ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৩৮ :

ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিশ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৮৩৯ :

বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ৮০ টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। এতদ্‌ব্যতীত সংস্কৃত গদ্য রচনার জন্যে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। এই প্রশংসাপত্রে তাঁর নামের শেষে বিদ্যাসাগর উপাধি লক্ষ্যযোগ্য। তার অর্থ এ সময় বা এর পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

এ বছর তিনি ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

খগোল ও ভূগোল বিষয়ে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৪১

ন্যায়শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১০০ টাকা ও পদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে মোট বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি কলেজের ও অধ্যাপকগণের প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

২৯শে ডিসেম্বর তিনি ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

এ সময় থেকে বিদ্যাসাগর রীতিমতো ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৮৪৬ঃ

মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত।

সংস্কৃত কলেজের গঠন-প্রণালীর সংস্কারের জন্যে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন ও বিবেচনার জন্যে সেক্রেটারির কাছে দাখিল করেন।

১৮৪৭ঃ

পূর্বোক্ত রিপোর্ট সেক্রেটারির নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ।

সংস্কৃত প্রেস ডিপোসিটরি প্রতিষ্ঠা।

বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত।

১৮৪৮ঃ

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত।

১৮৪৯ঃ

৮০ টাকা মাসিক বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত।

১৮৫০ঃ

হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রদের মুখপত্র 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন।

বীটন নারী বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত।

১৮৫১ঃ

জানুয়ারি মাসে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় এ যাবৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের জন্য উন্মুক্ত সংস্কৃত কলেজ, কায়স্থদের জন্যেও মুক্ত হয়। অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে রোববার কলেজের সাপ্তাহিক ছুটি রূপে নির্দিষ্ট হয়।

ডিসেম্বর মাসে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানের জন্যে সংস্কৃত কলেজ উন্মুক্ত করা হয়।

'বোধোদয়' প্রকাশ।

১৮৫৩ :

বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। সকল ছাত্রদের বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ এবং প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৫৪ :

উডের শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপাচ; দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে ১৮৪৩ সালে স্থাপিত 'বাংলা স্কুল'গুলির বিষয়ে সরকার কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সুপারিশ গ্রহণ। 'শকুন্তলা' প্রকাশ।

১৮৫৫ :

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত মাসিক ২০০ টাকা বেতনে দক্ষিণবঙ্গের স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর পদ লাভ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যে নর্মাল-স্কুল স্থাপন।

অগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নদীয়ায় পাঁচটি, হুগলীতে পাঁচটি এবং মেদিনীপুরে চারটি মডেল স্কুল স্থাপন।

অক্টোবর মাসে বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের নিকট প্রায় এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন পত্র পেশ।

ডিসেম্বর মাসে বহুবিবাহ নিরোধের জন্যে সরকারের নিকট আবেদন পত্র দাখিল।

বিধবাবিবাহ প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ।

'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ।

১৮৫৬ :

মডেল স্কুল স্থাপনের কার্য অব্যাহত।

১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন গৃহীত হয়।

৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্‌যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত। এই উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়।

৮ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।

১৮৫৭ :

সিপাহী বিদ্রোহ।

হুগলী জিলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮ :

হুগলী জিলায় আরো তিনটি, বর্ধমানে দশটি ও নদীয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক নিযুক্ত।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সহায়তায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৫৯ :

যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জিলায় নীলবিদ্রোহ।

মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে ইংরেজি-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।

'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক পদ ত্যাগ।

১৮৬০ :

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশ।

'সীতার বনবাস' প্রকাশ।

১৮৬১ :

নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ এবং মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ।

পাদ্রী লং-এর জরিমানা ও কারাদণ্ড।

কলিকাতা ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারি।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ।

১৮৬২ :

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশ।

১৮৬৩ :

ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত।

১৮৬৪ :

কলিকাতা ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট নামের পরিবর্তে মেট্রোপোলিটান ইন্‌স্টিটিউট নামকরণ।

লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বর নির্বাচিত।

১৮৬৬ :

বহুবিবাহ রহিতকরণের জন্তে দ্বিতীয়বার সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। দশ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু। প্যারীচরণ সরকার ও বিদ্যাসাগরের সেবাকার্য।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা।

এক দুর্ঘটনায় যকৃতের অপূরণীয় ক্ষতি। এই ভগ্নস্বাস্থ্য আর কখনো উদ্ধার হয় নি।

১৮৬৮ :

শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ।

১৮৬৯ :

চিরদিনের মতো বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ। প্রধান কারণ নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে মনোমালিন্য।

'ভ্রান্তিবিলাস' প্রকাশ।

১৮৭০ :

সাঁওতালদের বিদ্রোহ।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভায়' এক সহস্র মুদ্রা দান।

পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিধবাবিবাহ।

১৮৭১ :

'বহুবিবাহ' প্রথম পুস্তকের প্রকাশ।

কাশীতে মাতার মৃত্যু।

১৮৭২ :

আন্দামানে লর্ড মেয়োর আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ।

'বহুবিবাহ' দ্বিতীয় পুস্তকের প্রকাশ।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফাণ্ডের ট্রাস্টি নিযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ।

১৮৭৩ :

'বহুবিবাহ' দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ।

মেট্রোপোলিটান কলেজ স্থাপন।

'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' প্রকাশ।

১৮৭৪ :

সিভিল সার্বিস থেকে সুরেন্দ্রনাথের অপসারণ।

১৮৭৫ :

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পত্তির উইল করণ।

১৮৭৬ :

সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে 'বিজ্ঞান সভা' স্থাপন।

'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফ্যাণ্ডে'র ট্রাস্টিপদ ত্যাগ।

পিতা ঠাকুরদাসের পরলোক গমন।

১৮৭৭ :

লর্ড লীটনের দরবার অনুষ্ঠিত।

দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষাধিক ব্যক্তির মৃত্যু। এ বিষয়ে সরকারি ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতা।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানলিপি লাভ।

১৮৭৮ :

দেশীয় সংবাদপত্রের সরকারি কার্যের কঠোর সমালোচন

এই জন্যে ভারনাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রচলন।

১৮৮০ :

সি. আই. ই. খেতাব লাভ।

১৮৮১ :

প্রেস অ্যাক্ট প্রত্যাহার।

১৮৮২ :

ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে য়ুরোপীয় সমাজে প্রবল আন্দোল[illegible]
ইংরেজ ও দেশীয়দের বিদ্বেষের চরমরূপ লাভ।

১৮৮৩ :

ইলবার্ট বিলের মূল উদ্দেশ্য পরাস্ত।

আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স আহুত।

বিদ্যাসাগর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত।

১৮৮৪ :

'ব্রজবিলাস' এবং 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' প্রকাশ।

১৮৮৫ :

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস প্রতিষ্ঠিত।

১৮৮৬ :

কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত।

১৮৮৭ :

স্ত্রী দিনময়ীর মৃত্যু।

১৮৯০ :

বীরসিংহের ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৯১ :

৩০শে জুলাই রাত (সকাল) আড়াইটায় প্রাণত্যাগ
'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রকাশ।

লেখক পরিচিতি

আহমদ শরীফ

জন্ম. চট্টগ্রাম। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা)। কর্ম. রীডার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্ব বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক বলে খ্যাত। প্রধানত মধ্যযুগ নিয়ে গবেষণা করেছেন। বাংলা অ্যাকাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত অনেকগুলি গ্রন্থে এই গবেষণার ফলাফল বিধৃত আছে।

'বিচিত চিন্তা' ও 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ সংকলনদ্বয়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেছেন। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

বদরুদ্দীন উমর

জন্ম. বর্ধমান। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা), ট্রাইপজ (ক্যাম্বরিজ)। কর্ম. প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ববিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে সম্পাদক, 'গণশক্তি'।

নির্ভীক প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতিসেবী।

'সাম্প্রদায়িকতা', 'সংস্কৃতির সংকট', 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' ও 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'—গ্রন্থগুলি খ্যাতি অর্জন করেছে।

আলী আনোয়ার

জন্ম. কুমিল্লা। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা)। কর্ম. অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

সুপরিচিত প্রাবন্ধিক। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

জন্ম. যশোর। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা); বি. এ. (অক্স্ফোর্ড)। কর্ম. প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

'পূর্বমেঘ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত।

সনৎকুমার সাহা

জন্ম. রাজশাহি, ১৯৩৯। শিক্ষা. এম. এ. (রাজশাহি); এম. এস-সি. (লণ্ডন)। কর্ম. অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। সমাজসচেতন প্রাবন্ধিক ও ছোটো-গল্পলেখক হিসেবে সুপরিচিত।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম. ঢাকা। শিক্ষা. এম. এ (ঢাকা)। কর্ম. অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত। 'জসীম উদ্দীন' গ্রন্থের জন্যে দাউদ পুরস্কারপ্রাপ্ত। অন্য প্রকাশনা: 'ফররুখ আহমদ' ও 'মোজাম্মেল হক'।

মুখলেসুর রহমান

শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)। কর্ম. কিউরেটর, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম এবং রীডার, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগদ্বয়, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রপত্রিকায় প্রধানত ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ

জন্ম. খুলনা, ১৯৩৯। শিক্ষা. এম. এ. (রাজশাহি)। কর্ম. অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রপত্রিকায় প্রায়ই প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

জন্ম. পাবনা, ১৯৩৬। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)। কর্ম. রীডার, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধানত কবি ও গীতিকার হিসেবে পরিচিত। পত্রপত্রিকায় কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও লিখেছেন।

মযহারুল ইসলাম

জন্ম. পাবনা। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (রাজশাহি),

পি-এইচ. ডি. (ইণ্ডিয়ানা)। কর্ম. প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

কবি, প্রাবন্ধিক ও ছোটোগল্প লেখক বলে সুপরিচিত। 'উত্তর অন্বেষা' পত্রিকার সম্পাদক। দাউদ পুরস্কারপ্রাপ্ত।

প্রকাশনা : 'মাটির ফসল', 'বিপন্ন বিস্ময়' ও 'আর্তনাদে বিবর্ণ' (কাব্য); 'সাহিত্য পথে', 'হায়াত মামুদ', 'History of Folktales Collection in India Pakistan and Ceylon' প্রভৃতি (প্রবন্ধ)

অজিতকুমার ঘোষ

জন্ম. রংপুর, ১৯৪৭। শিক্ষা. এম. এ. (রাজশাহি)। কর্ম. অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

কবি ও প্রবন্ধলেখক।

গোলাম মুরশিদ

জন্ম. বরিশাল, ১৯৩৯। শিক্ষা. এম. এ. (ঢাকা)। কর্ম. অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : 'মাইকেলের প্রহসন' ও 'বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক'।

নির্ঘণ্ট